

সুধাংশু পাত্র

বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত



[illegible]

বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

সুধাংশু পাত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশঃ
অগ্রহায়ণ, ১৩৯৩
নভেম্বর, ১৯৮৬

প্রকাশক ঃ
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ
গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম ঃ ~~২৫~~ টাকা 30/-

ACC NO - 15330

অরূপরতন ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই :

- বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ
- বিজ্ঞানী চরিতকথা
- বিজ্ঞানের অমর প্রতিভা
- মনের মতো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গপ্পো
- ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযান
- ছোটদের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
- পদার্থ বিজ্ঞানের সহস্র জিজ্ঞাসা
- মহাকাশ বিদ্যা ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা
- বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ
- জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ
- জীব জগতের বিস্ময়

ভূমিকা

বিজ্ঞান শব্দের অর্থ হল "বিশেষ" জ্ঞান। এই "বিশেষ" শব্দটিকে আবার ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, বিজ্ঞান এমন এক শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান—যার মধ্যে কল্পনা ও ভাবালুতার স্থান আদৌ নেই। পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন, তৎপরে প্রশ্নের মাধ্যমে প্রাথমিক একটি ধারণা, অতঃপর বাস্তব পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং সর্বশেষে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানই যথার্থ বিজ্ঞান। উক্ত কারণে বিজ্ঞান হচ্ছে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান। যদিও শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান তথা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রদান করেছেন পৃথিবীর দার্শনিকমণ্ডলী।

সত্য বলতে কি, উক্ত জ্ঞানের অনুশীলন হয়ে আসছে পৃথিবীতে মানবের আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। অতএব মানুষের জয়যাত্রার যে ইতিহাস—তা বিজ্ঞানেরই ইতিহাস। এই বিজ্ঞানকে মানুষ জন্মলগ্নে প্রয়োগ করেছিল বলেই সে তার পারিপার্শ্বিক জীবজন্তু থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হতে পেরেছে, অরণ্য কেটে নগরের পত্তন করেছে, কালোর মাঝখানে আলোর বন্যা এনেছে। তাই এর ইতিহাস কেবল একটানা উন্নতির ইতিহাস। ঐ বিজ্ঞানের প্রভাবেই অপর দশটা প্রাণীর মত প্রতিকূল পরিবেশে মানুষকে চিরতরে হারিয়ে যেতে হয়নি। যেদিন সে পৃথিবীর পানে চোখ মেলে তাকাতে শিখেছিল, সেদিন সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করেছিল তার চারপাশের জীব ও উদ্ভিদ জগতকে। তাকিয়েছিল আকাশের পানে। ভয়ঙ্কর জীবজন্তুদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করতে গিয়ে হাতে পাথর তুলে নিয়েছিল, রোগ থেকে নিরাময় হওয়ার চিন্তা করতে গিয়ে উদ্ভিদের দ্বারস্থ হয়েছিল এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গুহাবাসী হয়েছিল।

মানুষের পূর্বপুরুষ যেদিন বৃক্ষশাখা থেকে মাটিতে নেমে এসেছিল সেই দিনই সে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। বঞ্চিত হয়েছিল প্রকৃতির দয়াদাক্ষিণ্য থেকে। কিন্তু বিজ্ঞানকে সে আয়ত্ত করতে পেরেছিল বলে প্রকৃতির শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে তার সভ্যতা। প্রস্তরযুগ থেকে তাম্রযুগ, তাম্রযুগ থেকে লৌহযুগ, লৌহযুগ থেকে যন্ত্রযুগ, বিদ্যুতের যুগ, পরিশেষে পারমাণবিক যুগে ঘটেছে তাদের উত্তরণ। বড় বিচিত্র ও বড় তাৎপর্যপূর্ণ সে ইতিহাস। এই ইতিহাস রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাস নয়—মানুষের উন্নতির ইতিহাস।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই জাতীয় বই বিদেশী ভাষায় যথেষ্ট থাকলেও বাংলায় নিতান্তই অল্প। প্রখ্যাত গবেষক ও লেখক আচার্য সমরেন্দ্রনাথ সেনের

"বিজ্ঞানের ইতিহাসকে" বাদ দিলে দ্বিতীয় কোন বই-এর নাম মনেই আসে না। অপরদিকে সেই অমূল্য গ্রন্থখানি বর্তমানে সুলভ নয় এবং সেখানি প্রধানত পণ্ডিত ও গবেষকদের জন্য। আমাদের কিশোর বিজ্ঞানী, যাদের চোখে ক্ষুধাতুর দৃষ্টি, মনে বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন, তাদের পক্ষে সেই মহাগ্রন্থের মর্মোদ্ধার করা খুবই কষ্টকর। তাই বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারাটির সঙ্গে তারা যাতে সহজে পরিচিত হতে পারে তার জন্য বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনা।

গ্রন্থখানি মানুষের তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিজ্ঞানের ধারাটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা। যেহেতু বিজ্ঞানের ইতিহাস মানুষের ইতিহাস এবং তাম্র যুগের পূর্বে মানুষকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কাটাতে হয়েছে অরণ্যে। সেদিনও তারা গবেষণা করেছিল। আবিষ্কারও করেছিল কত আয়ুধ, কত যন্ত্র, কত প্রয়োজনীয় গাছগাছড়া এবং নিত্যব্যবহার্য কত জিনিস। সে-সমস্ত আবিষ্কারের গুরুত্বও অপরিসীম। আর এও সত্য যে, সেইসব আবিষ্কারকে অবলম্বন করেই মানুষ নগর পত্তন করেছিল এবং ব্রোঞ্জযুগে পদার্পণ করেছিল। সেদিনের সেইসব আবিষ্কারাবলী "জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ" নামক গ্রন্থটিতে বর্ণিত হওয়ায় বাহুল্যবোধে এখানে আলোচনা করা হয়নি। অপরদিকে বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত পৃথিবীর মহান বিজ্ঞানীদের জীবন ও আবিষ্কারের কাহিনী "বিজ্ঞানী-প্রসঙ্গ," "বিজ্ঞানী চরিতকথা" ও "বিজ্ঞানের অমর-প্রতিভা" নামে তিনখানি গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই বিজ্ঞানীদের কেবল নামোল্লেখই করা হয়েছে। এছাড়া উপায়ও ছিল না। এত কথা একটিমাত্র গ্রন্থে সংযোজিত হলে পুস্তকের কলেবরখানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতো। ফলে যাদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটির পরিকল্পনা তাদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াতো।

গ্রন্থখানি রচনা করতে গিয়ে বহু গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। তাদের মধ্যে সমরেন্দ্রনাথ সেনের বিজ্ঞানের ইতিহাস, American Educator, Encyclopedia Biographical Dictionary of Eminent Scientists, A Picturesque Tale of Progres, Odhams Wonder World of Knowledge, ভারতকোষ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তাছাড়া নানা ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করেছি ইতিহাসের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুত রামেশ্বর গুচ্ছাইতের কাছ থেকে। এদের সবার ঋণ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করছি।

কালিন্দী, মেদিনীপুর

লেখক

সূচীপত্র

তালিকা—১

কালের ধারায় মানুষের ক্রমবিবর্তনের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য শাখা

এপোক	আবির্ভাব কাল (বর্তমান সময় থেকে পূর্বে)	শাখা ও তার বিবর্তনের ধারা
ইওসিন	পাঁচ থেকে সাত কোটি বছরের মধ্যে	বৃক্ষশাখা অবলম্বনকারী বানর জাতীয় প্রাণী ↓
ওলিগোসিন	৩½ থেকে ৫ কোটি বছরের মধ্যে	↓ প্রোপ্লিওপিথেকাস ↓
মায়োসিন	১½ কোটি থেকে ৩½ কোটি বছরের মধ্যে	অ্যানথ্রোপয়েড ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ প্যালিও পিথেকাস, শিভা পিথেকাস, ড্রায়োপিথেকাস, ওরাং ↓
প্লিওসিন	১০ লক্ষ থেকে ১½ কোটি বছরের মধ্যে	↓ ↓ পিথেকানথ্রোপাস, সিনানথ্রোপাস
প্লিস্টোসিন	২৫ হাজার থেকে ১০ লক্ষ বছরের মধ্যে	↓ নিয়ানডারথাল ↓
বর্তমান	আজ থেকে ২৫ হাজার বছরের মধ্যে	ক্রোম্যাগনন ও গ্রিমাল্ডি ↓ আধুনিক মানুষ

তালিকা—২

বিভিন্ন যুগে মানব-সভ্যতা

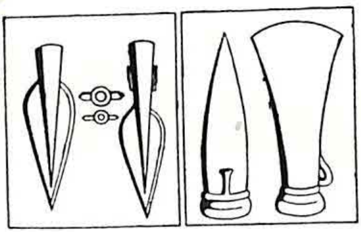
সভ্যতাভিত্তিক যুগ	সময় সীমা	সভ্যতা	তৎপরতা
পুরাতন প্রস্তর যুগ বা প্যালিওলিথিক (১ম ভাগ)	খ্রীষ্টজন্মের ৫০ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত	চেলীয়	১। পাথরের ভোঁতা হাতিয়ার নির্মাণ। ২। নানা প্রকার পাথর চেনার কৌশল।
পুরাতন প্রস্তর যুগ (২য় ভাগ)	খ্রীষ্টজন্মের ২৫ হাজার বছর আগে ও ৫০ হাজার বছরের মধ্যে	মৃস্তেরীয়	১। অঙ্গ আচ্ছাদনের উপায় আবিষ্কার। ২। গুহাবাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি। ৩। অগ্নি প্রজ্জ্বলনের উপায় আবিষ্কার। ৪। দলবদ্ধভাবে বাসের উপযোগিতা। ৫। মনের ভাবকে ভাষায় রূপ দেওয়া।
নব্যপ্রস্তর যুগ বা নিওলিথিক	খ্রীষ্টজন্মের ৫ হাজার বছর আগে এবং ২৫ হাজার বছরের মধ্যে	অরিনেশীয় ম্যাগদালেনীয় প্রেদ মোস্তীয় প্রভৃতি	১। ড্রিল যন্ত্র, তীরধনুক, ভেলা ও নৌকা নির্মাণ। ২। বস্ত্রবয়নের উপায় উদ্ভাবন। ৩। পশুপালন ব্যবস্থা। ৪। মৃৎশিল্প ও কৃষিকাজ। ৫। লিপির আবিষ্কার।

সভ্যতাভিত্তিক যুগ	সময় সীমা	সভ্যতা	তৎপরতা
তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ	খ্রীষ্টজন্মের ১ হাজার বছর আগে এবং ৫ হাজার বছরের মধ্যে	সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয়, ভারতীয়, মিশরীয়, চীন ও ক্রীট	১। সোনা, টিন, তামা, রূপা, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর সন্ধান। ২। অঙ্কের চার নিয়ম, ভগ্নাংশ, দ্বিঘাত সমীকরণ, জ্যামিতি ও পরিমিতির উদ্ভব। ৩। আকাশ পর্যবেক্ষণের ফলে দিন, মাস, বছর, গ্রহণ প্রভৃতি গণনার নিয়ম, এবং কতকগুলি গ্রহ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। ৪। কতকগুলি ভেষজের সঙ্গে পরিচয় এবং শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন। ৫। কাচ, চাকা, গাড়ি, পুলি, জাহাজ প্রভৃতির আবিষ্কার। ৬। জলসেচ ব্যবস্থা।
লৌহ যুগ (১ম ভাগ)	খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের মধ্যে	গ্রীক সভ্যতা রোমান সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা চীন সভ্যতা	১। গ্রীকদের দ্বারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গোড়াপত্তন। ২। রোমান আমলে যন্ত্রপাতি, রাস্তাঘাট, যানবাহন, জাহাজ প্রভৃতির উন্নতি। ৩। ভারতীয়দের দ্বারা গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অভাবনীয় উন্নতি। ৪। চীনাদের দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নানা যন্ত্রপাতি।

ঐতিহাসিক কাল



আদি মানব গোষ্ঠীর তামা পাথরের অনুসন্ধান



ব্রোঞ্জের তৈরী অস্ত্র (ব্রোঞ্জ যুগ)



মৃৎপাত্রে অঙ্কিত
হরিন ও নর্তকীর ছবি- মিশর



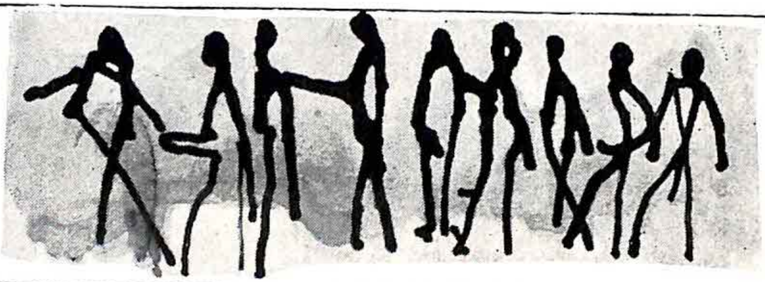
তামার তারে
মূল্যবান প্রস্তর খন্ড
সজ্জিত একটি প্রাচীন
অলঙ্কার - মিশরে প্রাপ্ত



সোনার ও মূল্যবান পাথরে তৈরী বুকের
একটি অলঙ্কার - কাইরো মিউজিয়ামে
রক্ষিত

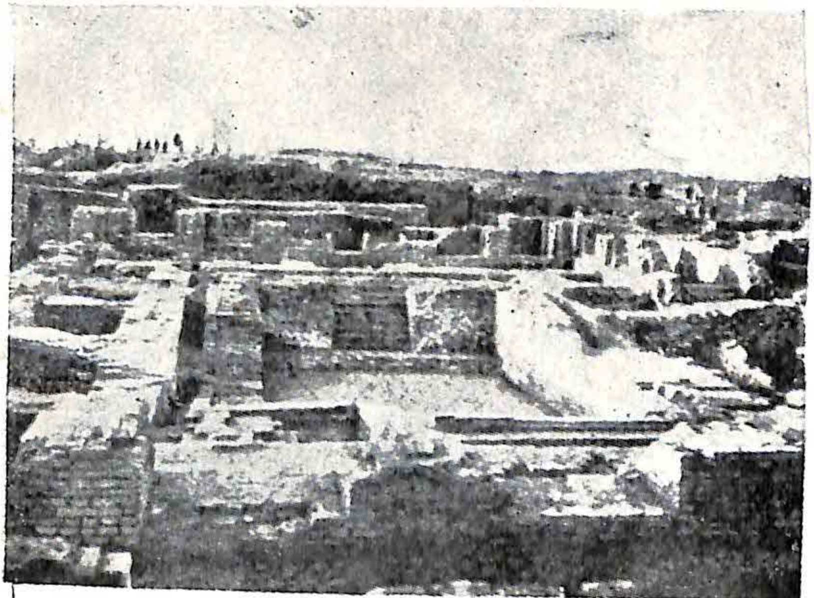


প্রাচীন গ্রীসের জনসভা



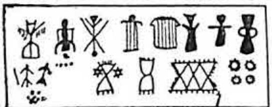


এক ব্যাবিলনীয় লিপিকর মাটির ফলকে লিখছেন

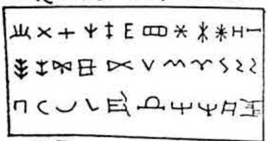


মহেঞ্জোদড়ো নগরীর ধ্বংসাবশেষ, বৃহৎ বাপী, গৃহ-ইত্যাদি





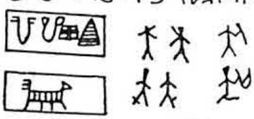
স্পেনে প্রাপ্ত প্রাচীন চিত্রলিপি



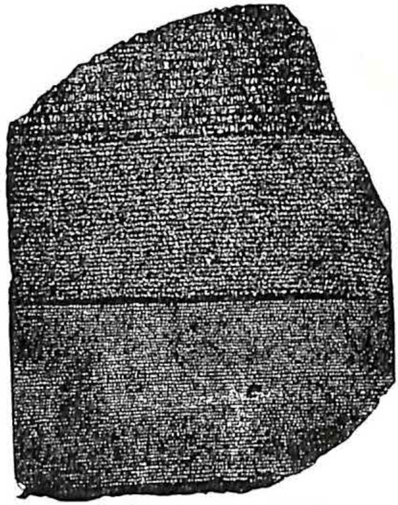
ক্রীটে প্রাপ্ত প্রাচীন চিত্রলিপি



প্যালেস্টাইনে প্রাপ্ত চিত্রলিপি



মহেঞ্জোদড়োর লিপি



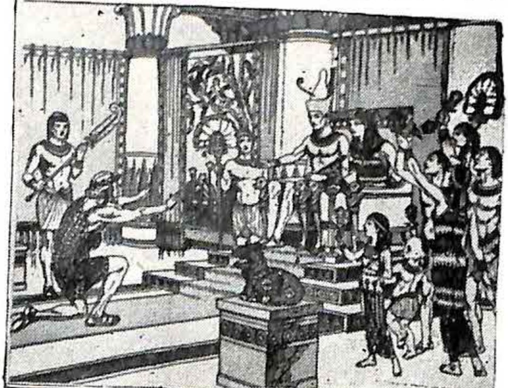
পাথরে উৎকীর্ণ মিশরীয় লিপি ১৭৯৯ খৃঃ নীল নদীর মুখে নেপোলিয়নের সৈন্যকর্তৃক প্রাপ্ত। বর্তমানে এটি লণ্ডন মিউজিয়ামে রক্ষিত।



ডালসেচ প্রাচীন মিশরীয় চিত্র



মিশরীয় এক লেখকের চুনাপাথরে তৈরী মূর্তি - প্যাপিরাসে লিখছেন। এটি বর্তমানে প্যারিস যাদুঘরে রক্ষিত



প্রাচীন মিশরীয় রাজসভা। সেকালের পোষাক পরিচ্ছদের নমুনা — মিশরীয় চিত্র থেকে



পাথরের উপর ছবি আঁকছেন গুহামানব



টলেমী অঙ্কিত পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র



মিশরের পিরামিডের সামনে পুরোহিতবর্গ



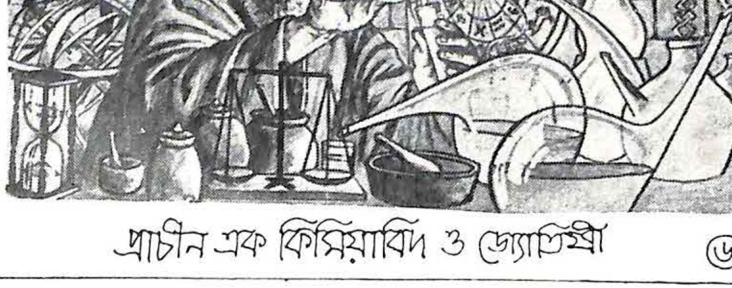
জ্যামিতিক প্রমাণে ব্যস্ত
পিথাগোরাস



অণুবাদ ব্যাখ্যা করছেন
ডিমোক্রিটাস



◄ দর্শন বোঝাচ্ছেন
অ্যারিস্টোটল

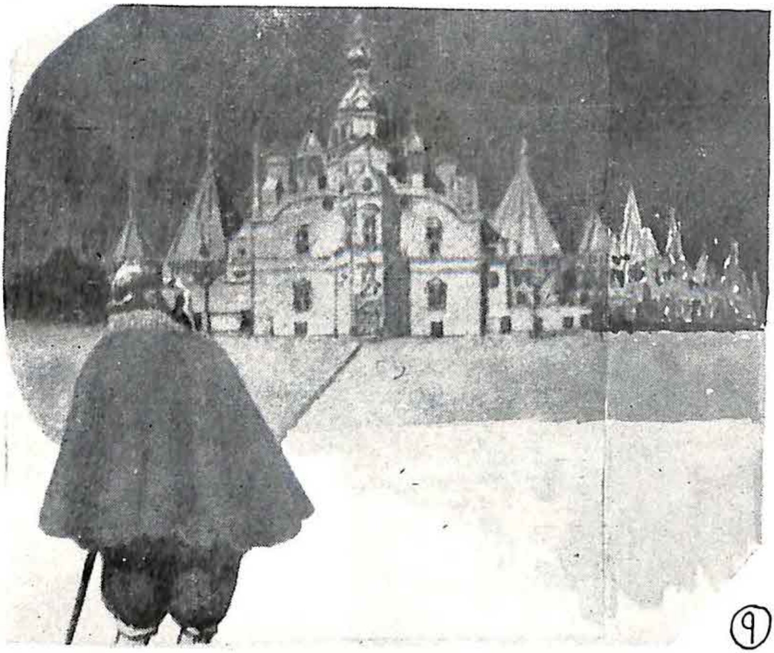


প্রাচীন এক কিমিয়াবিদ ও জ্যোতিষী

হার্শেল এবং তাঁর দূরবীন



টাইকো ব্রাহে ও তাঁর মানমন্দির





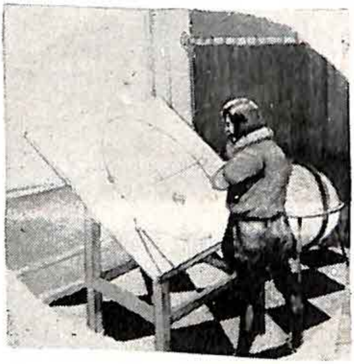
নিউটন ও তাঁর দূরবীন



কোপার্নিকাস মনে করেছিলেন পৃথিবী গোলাকার



টলেমীর আকাশ পর্যবেক্ষণ



গ্রহদের কক্ষপথ সম্বন্ধে কেপলারের গবেষনা



একটি শোচনীয় মৃত্যু —— গিলোটিনে হত্যার জন্য ল্যাভোয়সিয়ারকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

প্রাক কথন ঃ

জন্ম থেকে প্রায় দু'শ' কোটি বছর পর্যন্ত মা বসুন্ধরার বুকে চলেছিল একটানা অগ্নিদাহ। তারপর আপন অশ্রুধারায় আপন বক্ষের উত্তপ্ত জ্বালাকে নির্বাপিত করতে আরও অতিবাহিত হয়েছিল কত কোটি বছর। অবশেষে জননীর কোলে আসে জীব। বিশেষজ্ঞদের মতে সেই শুভলগ্নটি ছিল আজ থেকে প্রায় ২১০ কোটি বছর আগে। মহাকালের দরবারে এই সময়টা আবার কয়েক কোটি বছর এদিক ওদিক হতে পারে। তবে একথা সত্য যে, আদিম পৃথিবী একদিন জলমগ্ন হয়েছিল এবং সেই মহাসমুদ্রের বুকে প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল এককোষী জীবের।

তারপর কেটে গেছে আরও কত কোটি কোটি বছর। কালের কুটিল কটাক্ষে একদিন মহাসাগরের বুকে জেগে উঠলো স্থল। এককোষী জীব থেকে বহুকোষী জীব, নিরস্থিক থেকে মেরুদণ্ডী, ডিম্বপ্রসবী থেকে স্তন্যপায়ী, জলচর থেকে উভচর-খেচর ও স্থলচর, পরিশেষে ক্রমবিবর্তনের সহস্র সহস্র স্তর অতিক্রম করে আজ থেকে মাত্র সাড়ে তিন কোটি বছর আগে কেনোজোয়িক মহাযুগের মধ্যভাগে মিওসিন যুগে আবির্ভূত হয়েছিল বৃক্ষশাখা অবলম্বনকারী বানর জাতীয় উন্নত স্তন্যপায়ী। কালের ধারায় এই বানররাও নিজেদের ঠিক রাখতে পারে নি। বিভক্ত হয়ে পড়েছিল নানা শাখায়। কালক্রমে কোন কোন শাখা থেকে উৎপন্ন হয়েছিল গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং প্রভৃতি উন্নত শ্রেণীর বানর। ওরাও মহাকালের নিয়মকে তুচ্ছ করতে পারে নি। নানা শাখায় বিভক্ত হতে হতে পরবর্তী প্লিওসিন যুগে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দেড় কোটি বছর আগে কোন এক শাখা থেকে বিবর্তনের নানা স্তর অতিক্রম করতে করতে আবির্ভূত হয়েছিল অর্ধ-বানরাকৃতি মানুষ। পণ্ডিতেরা এদের নামকরণ করেছেন সিনানথ্রোপাস মানুষ।

সিনানথ্রোপাসদের আকৃতি মানুষের মত আদৌ ছিল না। ওদের ললাটদেশ একরকম ছিলনা বললেও চলে। চোয়াল ছিল অসম্ভব রকমের উঁচু, চোখগুলো ছিল গোল গোল ও কোটরাগত, শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখমণ্ডল অথচ লোমশ শরীর,

হাতে পায়ে সুতীক্ষ্ণ নখর, হাঁটতো কখনও দুপায়ে আবার কখনও কখনও হাত দুটিকে পায়ের মত ব্যবহার করতো। তারা কথা বলতে জানতো না, কোন পরিধেয়ও ছিল না তাদের। বাস করতো বৃক্ষশাখায় অথবা বড় বড় গর্তে, খাদ্য ছিল কাঁচা মাংস ও ফলমূল। এক কথায় পশুর সঙ্গে তাদের বড় একটা তফাৎ ছিল না। তথাপি হাত ও পাকে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবহার করতে শেখার জন্য তারা পাথর ধরতে শিখেছিল।

সিনানথ্রোপাসদের কাছ থেকেও লক্ষ লক্ষ বছরের ব্যবধানে বিবর্তনের নানা স্তর অতিক্রম করে উদ্ভব হয়েছিল কত শাখা ও উপশাখার। তাদের সব স্তরের জীবাশ্ম পাওয়া না যাওয়ায় বিবর্তনের স্তরগুলির সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও লাভ করা সম্ভব হয় নি। তবে যত জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তাদের বিশ্লেষণের ফলে জ্ঞাত হওয়া গেছে যে সিনানথ্রোপাসদের সঙ্গে পিথেকানথ্রোপাসদের এবং পিথেকানথ্রোপসদের সঙ্গে নিয়ানডারথাল মানুষের আকৃতিগত সাদৃশ্যই প্রবল। অবশ্য সরাসরিভাবে আসে নি। প্রতিটি ক্ষেত্রে সহস্র সহস্র বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এক শাখা থেকে উৎপন্ন হয়েছে কত শত শত শাখা ও উপশাখা। ওদের অধিকাংশ আবার হারিয়ে গেছে চিরতরে। বুদ্ধির জোরে এবং প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে যারা টিকে গেছে তারাই বজায় রেখেছে আপন বংশধারাকে। ভবিষ্যতে এদেরও মধ্যে এসেছে পরিবর্তন এবং বিভক্ত হয়েছে শাখা ও প্রশাখায়। এক্ষেত্রেও হারিয়ে গেছে অনেকে। শেষ পর্যন্ত ঐ নিয়ানডারথাল মানুষদের কাছ থেকে আজ থেকে মাত্র পঁচিশ হাজার বছর আগে ভূমিষ্ঠ হয়েছে আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ তথা ক্রোম্যাগনন মানুষ। প্রমাণিত হয়েছে, নিয়ানডারথাল মানুষের সময় পৃথিবীতে তুষার যুগ হানা দিয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। কিভাবে যে নিয়ানডারথাল মানুষ সম্পূর্ণরূপে আধুনিক মানুষে রূপান্তরিত হল পর্যাপ্ত জীবাশ্ম আবিষ্কৃত না হওয়ায় আজও তা বিস্ময় হয়ে থেকে গেছে।

নিয়ানডারথাল মানুষেরা ছিল বক্র মেরুদণ্ড বিশিষ্ট, বেঁটেখাটো চেহারা ও স্থূলকায়। ওদের ঠিক মানুষ হিসাবে গণ্য করেন না পণ্ডিতেরা। তবে মানুষের নিকট আত্মীয় তারাই। এবং মানবসভ্যতার ইতিহাসে ওদের দানও বড় কম নয়। কতকগুলি যুগান্তকারী আবিষ্কার ওদেরই মাধ্যমে লাভ করেছে মানবজাতি। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ওরাই প্রথম আগুন জ্বালিয়েছিল, শীত ও লজ্জা নিবারণের জন্য প্রথম ব্যবহার করেছিল পশুচর্মকে, স্বাদ গ্রহণ করেছিল অগ্নিদগ্ধ মাংসের। অপরদিকে ওরা গুহাবাসী হয়েছিল এবং হরিণ, কুকুর প্রভৃতি পশুদের পোষ মানিয়েছিল।

ওদের সভ্যতাকে ভিত্তি করে ক্রোম্যাগনন মানুষরা আরও কয়েক ধাপ

এগিয়ে যেতে পেরেছিল। সুসংবদ্ধভাবে চিন্তা করতে শিখেছিল ওরাই এবং আজ থেকে মাত্র দশ-বার হাজার বছর আগে। ওরা ছিল আজকের মানুষের স্বগোত্র এবং উক্ত সময়ের মধ্যে তারা অনেককিছু আবিষ্কারও করেছিল। আবিষ্কারগুলির মধ্যে মৃৎপাত্র-নির্মাণ, বস্ত্র-বয়ন, তীর-ধনুক, বন্যপশুদের পোষ মানানো, গৃহনির্মাণ ও কৃষিকাজ প্রধান। প্রকৃতপক্ষে ঐ দশ-বার হাজার বছর আগে থেকেই মানবসভ্যতার সূত্রপাত ও বিজ্ঞানের জন্ম। কিন্তু বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি তার জন্ম মাত্র কয়েকশ বছর আগে। চুলচেরা বিচার করতে গেলে দেখা যাবে এর অগ্রগতি হয়েছে মাত্র দু'শ বছরের মধ্যেই। তবু একথা সত্য যে, সেই আদিযুগ থেকে মানুষ তার পূর্বসূরীদের কাছ থেকে লব্ধ জ্ঞানকে আরও উন্নত এবং আরও প্রসারিত করে আজ এই অবস্থায় আসতে পেরেছে। দুশ' বছরের বিজ্ঞানের বিশাল অগ্রগতির পশ্চাতে রয়েছে সহস্র সহস্র বছরের সাধনা এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

আদি মানবের চিন্তাশক্তি নিয়োজিত হয়েছিল কেবলমাত্র খাদ্যান্বেষণে এবং আত্মরক্ষায়। তখন তারা সাহিত্য বুঝতো না, দর্শন বুঝতো না, ধর্মাধর্ম বুঝতো না, ইতিহাস-বিজ্ঞান প্রভৃতি কোনকিছুর ধারণাও তাদের ছিল না। আপন নিরাপত্তা ও সুখ-সুবিধার অন্বেষণ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে সেইদিনই জন্মগ্রহণ করেছিল বিজ্ঞান। অপর-দিকে ইতিহাসের সূচনাও বলতে হবে সেই থেকে। কারণ, ইতিহাসের ব্যাপক অর্থ হল, মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং তাদের ক্রমবিবর্তন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, পৃথিবীর সবদেশের মানুষের ইতিহাস এক নয়। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের মানবসভ্যতা এবং তার ক্রমবিবর্তনের ধারা ভিন্ন ভিন্ন রকমের। কিন্তু সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, মানবসভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কোন দেশের কোন বিরোধ নেই। সে বৈশিষ্ট্য আবার সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—বংশপরম্পরায় বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে নতুন চিন্তা-ধারার প্রবর্তন। আর ঐখানেই বিজ্ঞানের অস্তিত্ব। সত্য কথা বলতে কি, একমাত্র বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অগ্রগতির পথে। তা না হলে পশুর সঙ্গে মানুষের কোন তফাৎ থাকতো না।

সভ্যতার শুরুতে বিজ্ঞানের পৃথক কোন অস্তিত্ব ছিল না। সেদিনের মেহনতি মানুষ কাজের মাধ্যমে লাভ করেছিল কতকগুলি কারিগরি কৌশল এবং বিজ্ঞানের বীজ ঐখানেই হয়েছিল উপ্ত। সেই সঙ্গে কিছু দার্শনিক চিন্তাধারাও। তাই বিজ্ঞান হল, বিশেষ একধরণের অর্জিত জ্ঞান— যা সম্পূর্ণরূপে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বাস্তব পরীক্ষার দ্বারা হাতে-নাতে প্রমাণ করা জ্ঞান। এই জ্ঞানের

আবার শেষ নেই। একটি অজানাকে জানতে গেলে আরও বহু অজানা জিনিস এসে ভিড় করে। একটি তথ্যকে প্রমাণ করতে গেলে প্রয়োজন হয়ে পড়ে আরও বহু তথ্যের। সেই প্রয়োজনকে মেটাতে গিয়ে উদ্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার। যদিও কেবলমাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উক্তিটি প্রযোজ্য নয় অপরাপর সব বিষয়েও উক্তিটির যাথার্থ প্রমাণিত হয়েছে।

অপরদিকে দেখা যায়, বিজ্ঞানের চরিত্র যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রস্তরযুগের বিজ্ঞান তাম্রযুগের বিজ্ঞানের থেকে স্বতন্ত্র। এই দুই যুগে বিজ্ঞান ছিল কেবলমাত্র কারিগরি জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরবর্তী গ্রীক আমলে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অন্যরূপ পরিগ্রহ করে। এই সময় উদ্ভব হয় কতকগুলি দার্শনিক চিন্তাধারার এবং সেই দার্শনিক চিন্তাধারাই প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রকৃত রূপকার।

আদি পর্বের বিজ্ঞান

(খ্রীষ্টজন্মের পাঁচ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত)

বিশেষজ্ঞদের মতে আদি থেকে খ্রীষ্টপূর্ব জন্মের পাঁচ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত মানুষের হাতিয়ার এবং ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী সবই নির্মিত হতো পাথরের দ্বারা। তারপরেই মানুষ ধাতুকে ব্যবহার করতে শেখে। উক্ত কারণে মানবজাতির সুদীর্ঘকালের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটিকে প্রস্তরযুগ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত যুগটাকে তিনভাগে, আবার কেউ কেউ চারভাগে বিভক্ত করেছেন। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দেড়লক্ষ বছর আগে থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত অতি পুরাতন প্রস্তরযুগ, খ্রীষ্টজন্মের পঁচিশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত পুরাতন প্রস্তরযুগ, দশ হাজার বছর পূর্ব পর্য্যন্ত মধ্য প্রস্তরযুগ এবং মাত্র পাঁচ হাজার পূর্ব পর্য্যন্ত নব্যপ্রস্তর যুগের সীমা। অতি পুরাতন প্রস্তরযুগ ও পুরাতন প্রস্তরযুগকে একই সঙ্গে পুরাতন প্রস্তরযুগ বলেও চিহ্নিত করা হয়।

পুরাতন প্রস্তরযুগেই মানুষকে দীর্ঘকাল পড়ে থাকতে হয়েছিল। মানবসভ্যতার একেবারে আদিমস্তর। এই স্তরে সভ্যতার কোন নামগন্ধ ছিল না। সে আমলে মানুষের বুদ্ধি ছিল যেমন ভোঁতা তেমনই তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলিও ছিল ভোঁতা ও অমসৃণ। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ত্রিশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত দল কিংবা গোষ্ঠীতো দূরের কথা মানুষ পরিবারই গঠন করতে সক্ষম হয় নি। কথা বলতে জানতো না, কাঁচা মাংস খেতো, লজ্জা নিবারণেরও প্রয়োজন অনুভব

করতো না। সম্পদ ছিল পাথরের নুড়ি ও ভোঁতা ভোঁতা হাতিয়ার। বিজ্ঞানের কোন উন্নতি না হলেও কারিগরি-জ্ঞানটা অর্জন করেছিল এবং হিসাবের ধারণাটাও অল্প স্বল্প ছিল। এগুলির অবশ্য উদ্ভব হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে। বন্যপশুদের ঘায়েল করতে নতুন নতুন হাতিয়ার উদ্ভাবনে হয়েছিল আগ্রহী। অপরদিকে নুড়ি পাথর বা হাতিয়ার, শিকার করা পশুপাখী, সংগৃহীত ফলমূল ইত্যাদির হিসাব রাখতে গিয়ে হাতের আঙ্গুল, পায়ের আঙ্গুল, আরও বেশী হলে গাছের পাতা জমা করে হিসেব ঠিক রাখতো। হিসাবের এই পদ্ধতিটি নব্য প্রস্তরযুগের শেষের দিকে এমনকি আরও পরের দিকে প্রচলিত ছিল।

পুরাতন প্রস্তরযুগে মানুষকে কাটাতে হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক বছর। তার পরের অধ্যায়ে অর্থাৎ মধ্য প্রস্তরযুগে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। প্রাচীন ভোঁতা হাতিয়ারগুলোকে চেঁচে ছুলে মসৃণ ও ধারালো করেছিল, উপলব্ধি করেছিল গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করার সুফল, ঝড়-বৃষ্টি-ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাবলীও তাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। হয়ত মানুষ বুদ্ধি বলে বজ্রপাতের আগুন অথবা পাথর ঘষার সময় উৎপন্ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে এই সময় করেছিল বন্দী। আর প্রকৃতপক্ষে সেইদিন থেকেই তার সভ্যতার রথ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলতে থাকে।

মানুষ এতদিনে পবিত্র অগ্নিশিখাকে হাতে নিয়ে কেবল এগিয়েই চললো। অরণ্যে অরণ্যে, গুহার মুখে প্রকাশ পেল ক্ষীণ আলোর দীপ্তি। বিজ্ঞানেরও শুরু হল জয়যাত্রা। দেখতে দেখতে কাঁচা মাংস খাওয়ার দিন গেল ফুরিয়ে। অরণ্যের স্তূপীকৃত শুকনো ডালপালায় অগ্নিসংযোগ করে কনকনে ঠাণ্ডায় গুহাকে গরম রাখলো এবং বন্যজন্তুদের তাড়ালো। গায়ে পশুচর্ম জড়িয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে শিকারেও যেতে আরম্ভ করলো। অপরদিকে গুহা মধ্যে একটি বৃহৎ পরিবার বসবাস করায় জীবনেও এল যথেষ্ট নিরাপত্তা।

জীবনে নিরাপত্তা আসার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ চিন্তাভাবনার জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করতে পারলো। তার ফলে কারিগরি বিদ্যার হল উন্নতি। হাতিয়ারগুলো আর আগের মত ভোঁতা থাকলো না। অন্যদিকে বিভিন্ন কাজের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন হাতিয়ারও হল প্রস্তুত। তাছাড়া পৃথিবীর বুকে যে ভয়ঙ্কর তুষার যুগটা হানা দিয়েছিল সেটিও ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে গেল। পৃথিবীর ঋতু রঙ্গশালায় একে একে আবির্ভূত হতে লাগলো নানা ধরণের ঋতু। শীতের প্রাবল্য না থাকায় একরকম নব্য প্রস্তরযুগের গোড়ার দিকে মানুষ বেরিয়ে এল গুহা ছেড়ে। বেছে নিল যাযাবরের জীবন। গবাদি পশুকে পোষ মানালো,

অরণ্য থেকে তুলা সংগ্রহ করে সুতা তৈরি করলো। সুতা থেকে তৈরি করলো জাল, কাঠের গুঁড়ি পুড়িয়ে নির্মাণ করলো নৌকার মত জিনিস। কাঠের ভেলাও নির্মাণ করলো। ফলে একদিন তারা হ্রদের অথবা নদীর বুকে বাসগৃহ নির্মাণ করলো। জীবনে এল আরও নিরাপত্তা।

সেদিনের সেই মেহনতি মানুষ—যারা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করতো তারা একদিন আবিষ্কার করলো ভূমিকর্ষণের উপায় এবং বীজ বপনের পদ্ধতি। মানুষের ইতিহাসে এটিও এক গৌরবময় অধ্যায়। যার কিংবা যাদের মাথায় প্রথম এই চিন্তা স্থান পেয়েছিল সে বা সেই দল মানবজাতির কি যে উপকার সাধন করে গেছে তা বলে শেষ করা যায় না। অগ্নি-উৎপাদন ও কৃষিকাজ দুটোই হল কারিগরি বিজ্ঞানের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

এতদিনে মানুষের মুখে ভাষা এসেছিল। তবে সে ভাষা ছিল অপরিণত। বর্ণমালার তখনও উদ্ভব হয় নি। তবে মন হয়ে উঠেছিল কল্পনাপ্রবণ। স্বীয় কল্পনাকে রূপ দিয়েছিল গুহাগাত্রে। আর ছবি আঁকতে গিয়েই রঙ-বেরঙের পাথর, খড়িমাটি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। অনেকে আবার মনে করছেন, মধ্য প্রস্তরযুগ থেকেই মানুষ গুহাগাত্রে ছবি এঁকে আসছে। সে-সব ছবি জন্তু জানোয়ার ও শিকারের ছবি। আজও তাদের পরিত্যক্ত কোন কোন গুহায় সে-সব ছবি বিদ্যমান। সে ছবি আজও আমাকে বিস্ময় উৎপাদন না করে পারে না। এত নিখুঁত এবং এত জীবন্ত! তার উপর আছে রঙের বাহার।

নব্য প্রস্তরযুগের শেষভাগ পর্যন্তও মানুষের প্রকৃতি ছিল আজকের দিনের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হিংস্র জন্তুর সঙ্গে বসবাসের ফলে সেও হয়ে উঠেছিল হিংস্র। প্রধান প্রধান হাতিয়ার ছিল কুড়ুল, বর্শা ও তীরধনুক। যদিও তাদের চাহিদা ছিল অতি সামান্য, তবু সে চাহিদাকে পূরণ করতে হতো প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে। এরই ফলে একদিন গড়ে উঠেছিল পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব। আর ঐ নব্য প্রস্তরযুগে তারা ভালভাবে গঠন করতে পেরেছিল এক একটি গোষ্ঠী বা দল। আর তখনই কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে নবযুগের হয়েছিল সূচনা।

পণ্ডিতদের মতে প্রথম মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বসবাস আরম্ভ করেছিল রুশ মালভূমিসহ সমগ্র পশ্চিম ও পূর্ব ইওরোপে, দক্ষিণ ইওরোপে, উত্তর আফ্রিকা ও নিরক্ষীয় দক্ষিণ আফ্রিকায়, এশিয়া মাইনর, মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায়, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, সাইবেরিয়া, উত্তর চীন, ককেসাস ও ভারতবর্ষে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় গোষ্ঠীবদ্ধ আদিপর্বের এইসব মানুষকে বলা হয় ক্রোম্যাগনন মানুষ।

ওরা বর্তমান মানবজাতির আদিপুরুষ এবং কারিগরি বিজ্ঞানের জন্মদাতা। তবে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন ধরণের কারিগরি দক্ষতা অর্জন করেছিল এবং সেই দক্ষতা কেবলমাত্র সেই গোষ্ঠীরই মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ। তাই কালক্রমে হারিয়ে গেছে অনেককিছু।

বর্তমানে উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত প্রাচীন নিদর্শনগুলি থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন, ওরা প্রায় সবাই ব্যবহার করতো মসৃণ অস্ত্রশস্ত্র। আগুন জ্বালাতে জানতো। কাঠ-কাটার জন্য পাথরের বাটালি, করাত ও কুরুনি জাতীয় জিনিস ব্যবহার করতো এবং মোটা মোটা গাছের গুঁড়ির ভেতরটা পুড়িয়ে নৌকা তৈরি করতো। পরবর্তীকালে ঐ ক্রোম্যাগনন মানুষরাই সমগ্র এশিয়া, ইওরোপ ও আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশ গঠন করেছিল। কারও কারও মতে আজ থেকে প্রায় বার হাজার বছর আগে ওরা বেরিং প্রণালী অতিক্রম করে আমেরিকা মহাদেশেও উপস্থিত হয়েছিল। গবেষকদের মতে সেসময় বেরিং প্রণালীর বিস্তৃতি বর্তমানের মত ছিল না এবং বছরের অধিকাংশ সময় বরফে আবৃত থাকতো বলে সে যুগের মানুষের পক্ষে কাঠের গুঁড়ি বেয়ে বেরিং প্রণালী অতিক্রম করা সহজ হয়েছিল।

আদি মানবের এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ার একাধিক কারণ পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন, একইস্থানে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে তাদের খাদ্যের ঘাটতি ঘটেছিল। কারণ, কৃষিকাজে তারা আদৌ অগ্রসর ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নির্ভর করতো গাছের ফলমূল এবং অরণ্যের ছোট ছোট পশুর উপর। ফলে খাদ্যের চাহিদা মেটাতে তাদের যাযাবরের জীবন বরণ করতে হয়েছিল। নানা দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল দূরে-দূরান্তরে। যেহেতু পৃথিবীর সব জায়গায় পরিবেশ সমান নয়, তাই সহস্র সহস্র বছরের ব্যবধানে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে থেকে মানুষ হয়ে উঠলো নানা আকৃতির ও নানা বর্ণের। অন্যদিকে যতই দিন অতিবাহিত হতে লাগলো ততই পূর্ব সম্বন্ধ হলো বিস্মৃত। একদিন দেখা দিল জাতিগত বৈষম্য। ভুলে গেল, তারা এক জাতি। এবং অতীতের সে ভুল আজও মানুষ সংশোধন করতে পারলো না।

তারপরও কেটে গেল কত সহস্র সহস্র বছর। একদিন মানুষ উপলব্ধি করলো বসবাসের পক্ষে নদীর তীরই প্রশস্ত। নদীর সুস্বাদু জল সারাবছর পানীয়ের অভাব দূর করতে সক্ষম, পাওয়া যায় পর্যাপ্ত মাছ-কাঁকড়া-শামুক-গুগলি। এখানে হিংস্র জন্তুরও ভয় নেই, সর্বোপরি নদীর তীরে পলিমাটিকে কর্ষণ করা সুবিধা এবং শস্য ভাল জন্মায়। তাই ধীরে ধীরে মানুষ এসে ভিড় করলো বড়

বড় নদী-উপত্যকায়।

হাজার হাজার বছর পাহাড় ও অরণ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সেদিনের মানুষের হাতদুটোও পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠেছিল। বুকেও ছিল অসীম সাহস। ধনী-দরিদ্র, কোন ভেদাভেদ ছিল না। নারী, শিশু সবাই পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করতো এবং দলের সবাই একসঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খেতো। জীবনে ভালভাবে নিরাপত্তা আসায় ধীরে ধীরে নদী-উপত্যকাগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো এক-একটি সভ্যতা। সেই সভ্যতাগুলির মধ্যে মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে সুমেরীয় সভ্যতা, মিশরের নীল নদীর তীরে মিশরীয় সভ্যতা, ভারতবর্ষের সিন্ধু-নদীর তীরে সিন্ধুসভ্যতা এবং চীনের ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো তীরের সভ্যতাই প্রধান ও প্রাচীনতম সভ্যতা।

সমস্ত সভ্যতার গোড়ার দিকে কোন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু স্থানাভাব ঘটায় প্রতিটি পরিবারের জন্য জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট হলো। দেখতে দেখতে সৃষ্টি হলো স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব এবং উদ্ভব হলো ধনী ও দরিদ্র নামক দুটি সম্প্রদায়। এবার যেন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল—কে কতটা ভূমি অধিকার করে আপন সম্পদের পরিমাণ বাড়াতে পারে। মানব-সভ্যতার এক অভিশপ্ত অধ্যায়ের হল সূচনা। বুদ্ধিমানরা কৌশলে বা বলপ্রয়োগে অপরের সম্পদ অপহরণ করে আপন সম্পদ বাড়াতে থাকলো। উদ্ভব হলো ভূমিদাস, ক্রীতদাস প্রভৃতি কত শ্রেণী। অপরদিকে সৃষ্টি হলো রাজপদ। জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠলো মানবসভ্যতা।

মানুষের চিন্তা এবার আর কেবলমাত্র খাদ্য অন্বেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। সম্পদ বাড়াবার জন্য নানা কলাকৌশল আবিষ্কারেও হলো যত্নবান। তারই পরোক্ষ ফল, কারিগরি বিজ্ঞানের উন্নতি এবং গাণিতিক ও জ্যামিতিক তথ্যের উদ্ভব।

বর্ষাকালে নদীগুলিতে বন্যা আসতো। কখনও কখনও দুকূল-প্লাবী বন্যায় জমির সীমারেখা বা আল ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যেতো। পুনরায় ব্যক্তিগত জমির সীমানা ঠিক করার জন্য পরিমিতি নামক অঙ্কের শাখাটির হলো উদ্ভব। অনেক আগে থেকেই তারা পশুপালন করে আসছিল, এবার কৃষিকাজে অভ্যস্ত হওয়ায় বহু জিনিসের হিসাব রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। তাই উদ্ভব হলো সংখ্যা গণনা ও মাপজোখের পদ্ধতি। কৃষিকাজকে সহজ করার জন্য নানা যন্ত্রপাতিও অনেকে তৈরি করতে সচেষ্ট হলো। আবিষ্কৃত হলো পরিবহণের জন্য চাকা। নির্দিষ্ট সময়ে ফসল বোনার জন্য বছর-ঋতু-মাস ইত্যাদি গণনার হলো

সূত্রপাত। যেহেতু জীবমাত্রই রোগব্যাধির অধীন। মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। রোগব্যাধির আক্রমণ হলেই দ্বারস্থ হতো উদ্ভিদের কাছে এবং আবিষ্কারও করেছিল কতকগুলি উদ্ভিদের ভেষজ গুণ। অপরদিকে মুখের ভাষাকে রূপ দিল চিত্রে। পরিশেষে সেই চিত্র থেকে সৃষ্টি হলো বর্ণমালার।

খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চার-পাঁচ হাজার বছর পূর্ব থেকেই শুরু হয় স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, হানাহানি ও লুটতরাজ। অবশ্য হাজার হাজার বছর আগে থেকেই অর্থাৎ যখন থেকে মানুষ দলবদ্ধ হয়েছিল সেইদিন থেকেই আপন অধিকার স্থাপনের জন্য এবং অপর দলকে হটাবার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো। কিন্তু এবারের ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্যরূপ পরিগ্রহ করলো। যে মেহনতি মানুষ এতদিন কেবল মেহনতের জোরে এগিয়ে আসছিল, এবার ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা লাভ করে দৈহিক শক্তির পরিবর্তে বুদ্ধিকে কাজে লাগালো। সম্পদ আহরণ ও বিলাসোপকরণ সংগ্রহের জন্য লোক নিয়োগ করলো। আগে দলের দলপতি ছিল সর্বেসর্বা। দলের ভালমন্দ, শুভাশুভ প্রভৃতি সবকিছুই নির্ভর করতো দলপতির উপর। দলপতি নিযুক্তও হতো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এবার একশ্রেণীর মানুষের হাতে অর্থ সম্পদ জমা হওয়ায় তারা ক্ষমতালিপ্স, হয়ে উঠলো এবং একদিন সৃষ্টি হলো রাজপদের। একরকম সেই থেকেই সমাজে প্রচলিত হলো নিষ্ঠুর ও অভিশপ্ত দাসপ্রথা। রচিত হলো কত বিধিনিষেধ ও আইনকানুন। অভিজাতরা পুরুষানুক্রমে সুখ-সুবিধাগুলি ভোগ করার জন্য এবং সাধারণ মানুষের উন্নতি ব্যাহত করার জন্য ঈশ্বরের নামে ভীতি-প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করলো। অভিজাতদের ভোগবিলাসকে চরিতার্থ করার জন্য আগেকার পাতার কুঁড়ের পরিবর্তে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো বিশাল বিশাল অট্টালিকা। ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস, ইয়াংসিকিয়াং-হোয়াংহো, সিন্ধু-গঙ্গা ও নীল নদীর তীরভূমিতে গড়ে উঠলো শহর। সেই শহরগুলিকে কেন্দ্র করে মানুষের প্রথম জয়যাত্রা শুরু হয় সমৃদ্ধিশালী নাগরিক সভ্যতার মাধ্যমে।

মাটি খুঁড়ে সে যুগের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছে আজকের মানুষ। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় সেই সব ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকালে। চোখের সামনে ভেসে উঠে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের বড় বড় সৌধ, জমকালো রাজপ্রাসাদ, সোনার সিংহাসন, শান-বাঁধানো তকতকে ঝকঝকে রাস্তাঘাট এবং রাস্তার উভয়পার্শ্বে সুদৃশ্য পয়ঃপ্রণালী। কোথাও কোথাও বিরাট বিরাট দুর্গ, স্নানাগার ও শস্যাগার। আজকের মত সেদিনও নগরগুলি লোকজনে পরিপূর্ণ ছিল। বিদেশ থেকে বাণিজ্যতরী এসে ভিড় করতো নদীবন্দরে। সুদৃশ্য পোষাক ও অলঙ্কারে ভূষিত নরনারী সান্ধ্য-ভ্রমণে বহির্গত হতো।

অনেকের মতো প্রাচীন সভ্যদেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল। জলপথ ও স্থলপথ উভয়পথেই চলতো বাণিজ্য। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা প্রত্যেকটি দেশে ছিল স্বতন্ত্র। আর সৃষ্টি হয়েছিল স্বতন্ত্র বর্ণমালা এবং স্বতন্ত্র সাহিত্যের। এমনকি জ্ঞানবিজ্ঞানেও উন্নতিলাভ করেছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে। তবে বাণিজ্যের কারণে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় একের প্রভাব অন্যের উপর পড়েছিল। তাই প্রায় একই সময়ে সূত্রপাত হয়েছিল তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগ। অপরদিকে পাটিগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদ চর্চাও হয়েছিল একই সময়ে। তবে সবদেশ সমানভাবে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে নি।

ধাতু আবিষ্কার

১। **সোনা**—পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় কমবেশী সোনাকে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। সোনার আপেক্ষিক গুরুত্বও বেশী। পাথরের ক্ষয়ের ফলে মুক্ত স্বর্ণরেণু জলের দ্বারা বাহিত হয়ে নদীগর্ভে ও নদীর বেলাভূমিতে সঞ্চিত হয়। এর অত্যুজ্জ্বল বর্ণ আদি মানবকে নিশ্চয়ই আকর্ষণ করেছিল। সোনা আবার দীর্ঘকাল রোদ হাওয়ায় পড়ে থাকলেও তার ঔজ্জ্বল্য বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না। অর্থাৎ রাসায়নিক দিক থেকে বেশ নিষ্ক্রিয়। আদ্র বায়ু, অক্সিজেন, জল প্রভৃতির সঙ্গে সাধারণভাবে ক্রিয়া করে যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত হয় না। তাছাড়া সোনা বেশ নমনীয়ও। নব্য প্রস্তরযুগের মানুষ যখন পাহাড়ে, পর্বতে, নদীর তীরভূমিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো তখনই সোনার ঔজ্জ্বল্য তাদের আকর্ষণ করেছিল বলে মনে হয়। ভারী এই ধাতুটিকে সংগ্রহ করেছিল খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ছ'-সাত হাজার বছর আগে। পরের দিকে ব্যবহার করেছিল অলঙ্কাররূপে।

পণ্ডিতদের ধারণা, ধাতুর মধ্যে মানুষ সর্বপ্রথম সোনাকেই ব্যবহার করেছিল। সুপ্রাচীন সুমের সভ্যতা ও মিশরের প্রাক্ রাজবংশের সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকেও স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া গেছে। তবে ঠিক কোন্ সময় মানুষ যে সোনাকে কাজে লাগিয়েছিল তা আজ নির্ণয় করা বড়ই কষ্টসাধ্য।

২। **তামা**—সোনার মত তামাকেও মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং অতীতে মনে হয় আরও বেশী পাওয়া যেতো। সেদিনের মানুষ প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত অধিকাংশ তামাকে নিঃশেষ করে গেছে।

মানুষ তামাকে যে কবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল, তা সঠিক করে বলার

কোন উপায় নেই। নব্য প্রস্তরযুগে সোনার ব্যবহারের প্রায় সমসাময়িক সময়ে তামার ব্যবহার হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। তামার ব্যাপক ব্যবহারের সময়টাই তাম্রযুগ নামে খ্যাত। মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলির সভ্যতা তাম্রযুগের।

যে সময় তামার ব্যবহার শুরু হয় তখন তামাকে গলাবার মত এত উচ্চ-তাপমাত্রা (১০৮৫°) সৃষ্টি করার কোন যন্ত্র তথা হাপর আবিষ্কৃত হয় নি। ম্যালাকাইট জাতীয় আকরিক যা সাধারণত ৭০০° থেকে ৮০০° সেন্টিগ্রেডে গলে যেতে পারে তাকেই ব্যবহার করা হতো আর ব্যবহার করা হতো মুক্ত তামাকে।

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত মুক্ত তামার রঙ কিন্তু লাল নয়। দীর্ঘকাল ধরে বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে থাকলে কালো অথবা সবুজবর্ণ ধারণ করে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সেদিনের মানুষের মধ্যে কেউ হয়ত একদিন পাথর ভেবে কালো অথবা সবুজ তাম্রখণ্ডকে আগুনের সান্নিধ্যে এনেছিল অথবা ম্যালাকাইট জাতীয় আকরিক কিংবা মুক্ত তামাযুক্ত অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। ফলে লাল বর্ণের এই পদার্থটিকে দেখে বিস্ময়াভিভূত ও অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছিল। পরের দিকে ওকেই নিয়োগ করেছিল অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কাজে। যে কাঠকয়লার চুল্লীতে তারা মৃৎপাত্র পোড়াতো সেই চুল্লীর দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল ম্যালাকাইট আকরিক থেকে তামা নিষ্কাশন করা। আরও মনে করা হয়, প্রথম প্রথম তারা পাথরকে কেটে কেটে ছাঁচও তৈরি করতো। যেমন ছুরির ফলা, বর্শার ফলা, কুড়ুল ইত্যাদির। তবে সে ছাঁচ ছিল একপাশ খোলা। পরের দিকে ফাঁপা ছাঁচ ও হাপর আবিষ্কৃত হয়েছে।

এও সত্য যে, তামার ব্যবহার তথা তাম্রযুগের সূচনা রাতারাতি হয় নি। তামার পরিচয় লাভের পর হয়ত হাজার বছর পরেই তামার ব্যাপক ব্যবহারের প্রচলন হয়। সেদিন প্রতিটি মানুষকে খাদ্যের-চাহিদা পূরণের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হতো। কৃষিকাজেরও ব্যাপক প্রচলন হয় নি। নির্ভর করতে হতো পশুশিকার ও মৎস্যশিকারের উপর। তাতে সময় করে ধাতু নিষ্কাশন করিয়ে অস্ত্রনির্মাণ সম্ভব ছিল না। তার পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ বছরের পরিচিত পাথরের হাতিয়ার অল্পায়াসে বানিয়ে ফেলতো। তাছাড়া মানুষ মাত্রেরই পুরাতনের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকে। তাই পাথরকে পরিত্যাগ করে তামাকে ব্যবহার করতে অনেক সময় লেগেছিল। মনে হয়, কৃষিকাজের প্রচলনের ফলে খাদ্যের জন্য সবাইকে যখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হলো না এবং দলবদ্ধ হয়ে যখন বসতি আরম্ভ করলো তখনই তামার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের দিকে ঝোঁক দেয়। যেহেতু পাথরের অস্ত্র অল্প কয়েকবার ব্যবহারের ফলে ভোঁতা হয়ে যায়

এবং অধিকার বিস্তারের জন্য নানাদলের সঙ্গে মাঝে মাঝে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হতো, তাই স্থায়ী অস্ত্রনির্মাণের জন্য তামার ডাক পড়ে। পাথরের অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গেলে তাকে পরিত্যাগ করতে হতো কিন্তু তামার ক্ষেত্রে পুনরায় পিটিয়ে বা গালিয়ে নিলে পূর্বের মত ধারালো করা যেতো। এই সুবিধাটুকু উপলব্ধি করায় পাথরের যুগের পর আরম্ভ হয় তাম্র যুগ।

৩। **ব্রোঞ্জ ও পেতল**—তাম্রের ব্যবহারের প্রায় হাজার বছর পরে অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে শুরু হয় ব্রোঞ্জ ও পেতলের ব্যবহার। যেহেতু ব্রোঞ্জ হচ্ছে তামা ও টিনের সঙ্কর এবং পেতল হচ্ছে তামা ও দস্তার সঙ্কর। ব্রোঞ্জে টিনের পরিমাণ শতকরা ৪ থেকে ১২ ভাগ এবং পেতলে দস্তার পরিমাণ থাকে শতকরা ২০ থেকে ৪০ ভাগের মত। এই দুই সঙ্কর ধাতুর কথা মনে হলেই স্বভাবতই মনে হবে, সেদিনের মানুষ তামার পরেই টিন ও দস্তা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল এবং পরিমাণ মত মিশিয়ে সঙ্কর দুটিকে প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে উপরোক্ত ধাতুদুটির পরিচয় অজ্ঞাত ছিল বলে অনেকের বিশ্বাস।

গবেষকদের মতে কোথাও কোথাও এমন সব তাম্রের আকরিক পাওয়া যায়, যার সঙ্গে অবিশুদ্ধ হিসাবে মেশানো থাকে টিন। এখনও এই জাতীয় তামার আকরিক বহু জায়গায় দৃষ্ট হয়। আদিতে তামা নিষ্কাশন করতে গিয়ে মানুষ অনুরূপ আকরিককে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিল। ফলে লাভ করেছিল তামা ও টিনের মিশ্রিত ধাতু ব্রোঞ্জ। ব্রোঞ্জ আবার বিশুদ্ধ তামার চেয়ে কঠিন এবং গলনাঙ্ক কম। তাই পরবর্তী সময়ে ঐ জাতীয় আকরিকেরই ব্যবহার প্রচলিত হয়। সেই থেকে শুরু হয় ব্রোঞ্জ যুগ। পরে হাপর ইত্যাদি আবিষ্কার, কামারশালা স্থাপন ইত্যাদি হলে মানুষ টিনের খোঁজ করতে থাকে। খ্রীষ্টজন্মের দু হাজার বছর বা তার কিছু পরে ব্রোঞ্জের ব্যবহার ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।

তামার অন্য একটি সঙ্কর পেতলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতবাদ প্রযোজ্য। পেতলও বেশ দৃঢ় এবং মজবুত। তার উপর তামা অপেক্ষা এর গলনাঙ্ক কম। তামার সঙ্গে মিশ্রিত দস্তার আকরিককে গালিয়েই প্রথম সন্ধান পেয়েছিল পেতলের।

বহু গবেষকের মতে পেতল প্রথম ভারতেই প্রস্তুত হয়েছিল। অবশ্য সমসাময়িক সময়ে ভারতে ব্রোঞ্জের প্রচলনও ছিল। ভারতীয় পেতল অন্যত্র চালান যেতো বলেও অনেকের বিশ্বাস। কারণ, সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত পেতলের যে নমুনা পাওয়া গেছে তার মান অন্যান্য সভ্যতার পেতল

অপেক্ষা বেশ উন্নত।

খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ধাতু দ্রব্যের মধ্যে ব্রোঞ্জ মুখ্যস্থান অধিকার করে। মিশরে সেদিন ব্রোঞ্জ তৈরির জন্য পারস্য ও অন্যান্য জায়গা থেকে টিন সংগ্রহ হতো বলে অনেকে মনে করে থাকেন। অপরদিকে ব্রোঞ্জ যুগের সূত্রপাত হলে প্রচীন সুসভ্য দেশগুলি তামা ও টিন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই থেকে ধাতুশিল্পের প্রসার ঘটে। বহু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির যেমন উদ্ভব হয়, তেমনই আরও কতকগুলি ধাতুর সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে। তাদের মধ্যে রূপা ও সীসা প্রধান। সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলি থেকে ব্রোঞ্জ, পেতল, রূপা ও সীসার বহু নিদর্শন লাভ করা গেছে।

৪। **লোহা**—লোহা আবিষ্কার মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রকৃতপক্ষে লোহার ব্যবহারকে কেন্দ্র করেই তুমুল এক আলোড়নের শুরু হয় এবং প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠে মানুষ।

লোহার যুগ ব্রোঞ্জযুগের পরে আরম্ভ হলেও ব্রোঞ্জ যেমন পাথর ও তামাকে অনুসরণ করে এসেছে তেমনটি লোহা আসে নি। কথিত হয়েছে, এমন কিছু কিছু জাতি ও উপজাতি ছিল যারা পাথর থেকে সরাসরি লোহযুগে পদার্পণ করেছিল। মনে হয়, ঐসব জাতি ও উপজাতির কাছ থেকে পৃথিবীতে লোহার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে।

লোহা ব্যবহারের বহু প্রাচীন নমুনাও হস্তগত হয়েছে। সেসব নমুনাগুলিকে পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, খ্রীষ্টজন্মের চার হাজার বছর অগেও মানুষ লোহার টুকরাকে মালার মত করে গলায় পরতো। সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে বহু লোহার পুঁতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

কিন্তু লোহার ব্যবহার প্রচীন হলেও লোহাকে নিষ্কাশন করতে পারে নি সেদিনের মানুষ। ওরা যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতো। উল্কাপতনের ফলে যেগুলি পৃথিবীর বুকে সচরাচর পাওয়া যেতো সেগুলি সাধারণত লৌহপ্রধান এবং ঐগুলিই তারা ব্যবহার করতো। লোহা পাথরের সঙ্গে সহসা পরিচয় হয় নি তাদের।

পণ্ডিতদের ধারণা, প্রথম লৌহ নিষ্কাশন ও লৌহশিল্পের পত্তন হয়েছিল এশিয়া মাইনরের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে। এখানকার লোহাপাথর বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। অতি উন্নত শ্রেণীর লৌহ আকরিক ম্যাগনাটাইট থেকে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা লোহা তৈরি করেছিল খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দেড়হাজার বছর আগে। এখানে বাস করতো হিট্টাইট্ নামে এক জাতি। কালক্রমে তারা যে একটা বিশাল লৌহশিল্পনগরী গড়ে তুলেছিল তার প্রমাণ সেখানকার ধ্বংসাবশেষ।

15330

একটি চিঠিও পাওয়া গেছে। সে চিঠিটি ১২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লেখা এবং চিঠিতে তৎকালীন মিশরের রাজা হিট্টাইট্দের রাজাকে সোনার পরিবর্তে লোহা পাঠাবার অনুরোধ করেছেন।

হিহিট্টাইট্রা কাঠকয়লার চুল্লীতে লোহাপাথরকে গলিয়ে লোহা নিষ্কাশন করতো। দোরিয়, কেল্ট প্রভৃতি উপজাতি লোহাকে হস্তগত করে একদিন প্রবলও হয়ে উঠেছিল এবং ওদের আক্রমণের ফলে বহু জায়গায় ব্রোঞ্জযুগের অবসান হয়েছিল খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ১১০০ বছর আগে। আর ঠিক ঐসময় থেকেই লৌহনির্মিত অস্ত্রের উপযোগিতা সবার কাছে ধরা পড়ে এবং লোহা ব্যবহারের হিড়িক পড়ে যায়।

সভ্যতার আরও কতকগুলি উপকরণ

১। **কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি—**নব্য প্রস্তরযুগে মানুষ যখন অরণ্য ছেড়ে সমতল ভূমিতে নেমে এসেছিল এবং হ্রদ ও নদীর তীরভূমিতে বসবাস আরম্ভ করেছিল তখনই কৃষিকাজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল তাদের। পর্বতের গুহায় এবং অরণ্যে থাকাকালে রুক্ষ মৃত্তিকাকে কর্ষণ করা সম্ভব হয় নি, তাই সম্ভব হয়নি কৃষির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করা। অপরদিকে নদীতীরে বছরের বিশেষ এক সময়ে দানা জাতীয় শস্যকে আপনা আপনি জন্মাতে দেখে এবং তার সুস্বাদু দানাগুলোকে ভক্ষণ করে মানুষ চাষের দিকে আকর্ষণ অনুভব করেছিল বলে আজ মনে করা যেতে পারে।

অনেকের ধারণা, মানুষ প্রথমে নদীতীরের পাথরের পলিমাটিকে ফলা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে আলগা করতো। কিন্তু এই ব্যাপারটা ছিল বেশ কষ্টসাধ্য। বিশেষ এক ঋতুতে যেহেতু ফসল বোনার কাজ শেষ করতে হতো তাই অধিক জমি চাষ করা সম্ভব হতো না। তারই প্রত্যক্ষ ফল লাঙ্গল আবিষ্কার।

প্রথম লাঙ্গল ছিল পাথরের তৈরি। আজকের লাঙ্গলের আকারের বাঁকানো মোটা গাছের ডালের তলায় বেঁধে দিত পাথরের ফলক। সে লাঙ্গলকে একজন ধরতো এবং আর একজন টানতো। বিশেষ বেগ পেতে হতো না নদীর তীরে বা নদীগর্ভের পলিমাটিকে আলগা করতে।

পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের উন্নতির ফলে শত শত বৎসরের ব্যবধানে লাঙ্গলেরও উন্নতি হয়েছিল। তবে পশুর দ্বারা লাঙ্গল টানা হয়েছে বেশ পরে। তার কারণ গোরু, মহিষ প্রভৃতিকে মানুষ পরের দিকেই পোষ মানিয়েছিল।

প্রসঙ্গত পশুপালনের কথাটাও উল্লেখ করতে হয়। নব প্রস্তরযুগের বহু পূর্বে মানুষ, কুকুর ও বলগাহরিণকে পোষ মানিয়েছিল। কুকুর তাদের শিকারে সাহায্য করতো এবং বলগা হরিণের দুধ ও মাংস খেতো। তারপরে তারা মেষ প্রতিপালন করেছিল এবং উক্ত অবস্থায় বহু দল যাযাবরের জীবন যাপন করতো। গবাদি পশুকে তারা পোষ মানিয়েছে আরও পরে।

কিছুকালের অভিজ্ঞতায় মানুষ অবশ্যই বুঝতে পেরেছিল, যে সব জন্তু মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে তাদের পোষ মানানো যায় না। অপরদিকে তৃণভোজীরা যেন স্নেহের কাঙাল। তাদের খাওয়ার এবং সামান্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করলে সহজে অনুগত হয়ে পড়ে। তাই লাঙ্গল টানার জন্য তারা ডাক দিয়েছিল শক্তিশালী তৃণভোজীদের তথা গবাদি পশুকে।

লাঙ্গল আবিষ্কার ও গবাদি পশুকে পোষ মানানোর পর কৃষিকাজের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল। লাঙ্গলের উন্নতি হয়েছিল এবং প্রয়োজনানুযায়ী কৃষি-যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত করেছিল। প্রথম প্রথম সব যন্ত্রপাতি ছিল পাথরের। পরে তামাকে কাজে লাগায়। অবশেষে লৌহযুগ আরম্ভ হলে তামার পরিবর্তে লোহার ব্যবহারই শুরু হয়।

২। বস্ত্র বয়ন—মানুষ প্রথমে ছিল উলঙ্গ। তারপর পুরাতন প্রস্তর যুগের শীতল পরিবেশে কালযাপনের সময় বুদ্ধি করে পশুচর্ম দিয়ে অঙ্গকে আচ্ছাদিত করেছিল। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল মানুষের অগ্নিকে বন্দী করার আগেই।

পুরাতন প্রস্তরযুগ থেকে নব্য প্রস্তরযুগ পর্যন্ত চলে আসছিল সেই একই ব্যবস্থা। এমনকি খ্রীষ্টজন্মের প্রায় পঁচিশ হাজার বছর পূর্বে তুষার যুগটা অপসৃত হলেও মানুষ পশুচর্মকে পরিত্যাগ করে নি। তখন অনেকটা সভ্য হয়ে উঠেছে। নারী-পুরুষ-শিশু সবাই একসঙ্গে দল বেঁধে বাস করছে। উক্ত পরিবেশে লজ্জা নিবারণের প্রশ্নও তাদের মনে স্থান লাভ করেছিল।

পশুচর্মকে যদিও কেটে এবং পরে সেলাই করে তারা পরিধান করতো তবুও অসুবিধা ছিল অনেক। একদিকে চামড়ার বিশ্রী গন্ধ এবং অপরদিকে গরমের সময় পায়ে জড়িয়ে রাখার অস্বস্তি, মানুষকে অপর কোন পরিধেয়ের সন্ধান করতে প্রবৃত্ত করায়। তারই প্রত্যক্ষ ফল গাছের বাকল পরিধান।

নব্য প্রস্তরযুগের অনেক আগেই মানুষ অরণ্যে তুলার সন্ধান পেয়েছিল। খ্রীষ্টজন্মের দশ-বার হাজার বছর আগেও তুলা থেকে সূতা তৈরি করেছিল। ঐ সূতা দিয়ে তারা মাছ ধরার জাল তৈরি করতো এবং কৌপিনের মত সূতার গাছাকে পুরুষেরা পরিধানও করতো। তবে মেয়েরা কটিবাস ও বক্ষাবরণী হিসাবে ব্যবহার করতো পশুচর্মকে।

সেদিন তুলা এবং সুতা দুইই ছিল দুষ্প্রাপ্য। মানুষ কৃষিকাজে রপ্ত হওয়ায় ফসলের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় তুলার চাষও আরম্ভ করে। সুতা বেশী পরিমাণে হাতের কাছে আসায় সুতো থেকে বস্ত্রবয়নের উপায় চিন্তা করে। প্রথমে কাপড় বোনার জন্য তারা তাঁত স্থাপন করতে পারে নি। কাঠের চৌকো ফ্রেম বেঁধে সুতার টানা বাঁধতো। তারপর হাত দিয়ে একটা ছেড়ে একটার ভেতর দিয়ে সুতা ঢুকিয়ে যথেষ্ট সময় ব্যয় করে কেবলমাত্র কটিদেশে জড়ানোর মত একখানা বস্ত্র প্রস্তুত করতে সমর্থ হতো।

প্রাচীন সেই বস্ত্রের নমুনা প্রাচীন মিশরীয় ছবিতে দেখা যায়। প্যাপিরাসের উপর আঁকা ছবিতে রাজা-রানীর গায়ে অলঙ্কারে যথেষ্ট ঘটা দেখা গেলেও কাপড়টা কিন্তু হাঁটুর উপর অথবা হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত। কেবলমাত্র কটিদেশে জরানো ছাড়া কাপড়ের বাহুল্য দেখা যায় না। কেবল কোথাও কোথাও নারী-দেহের বক্ষাবরণী হিসাবে একটুখানি উড়নির মত ব্যবস্থা।

কাপড় দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল। ভারতে ভগবান গৌতমবুদ্ধের পিতামাতার যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে তাতেও দেখা যায় মিশরীয় চিত্রানুযায়ী কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত। অনেক পরে কাপড় বোনার জন্য তাঁত আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তুলা ছাড়া পশুর লোম ও রেশমকে বস্ত্র বয়নের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। মনে হয়, উক্ত ব্যবস্থায় ভারতবর্ষই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। কেননা রোমানদের আমলে ভারত থেকে রোমে সূতী ও বস্ত্র রপ্তানি হতো।

৩। গৃহ নির্মাণ—বিগত তুষার যুগের শেষে মানুষ গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এলে গুহার অনুরূপ ঘর তৈরী করতো। সে ঘর ডালপালা পুঁতে কাদার প্রলেপ দেওয়া। অনেকটা এস্কিমোদের ইগলুর মত। মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাসগৃহের রূপও পরিবর্তিত হলো। বিশেষ করে যতদিন থেকে সে হ্রদ কিংবা নদীর তীরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলো ততদিন থেকেই সাবেক গুহার আকার বাসগৃহ অন্তর্হিত হলো।

বন্যজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ হ্রদের উপর অথবা নদীর উপর গৃহ নির্মাণ করেছিল। বন থেকে মোটা মোটা গাছ কেটে বহে আনতো এবং খুঁটির মত পুঁততো। তারপর জলের উপর সরু সরু ডালপালা পেতে দিতো। চারদিকটা ঘিরেও ফেলতো ডালপালা দিয়ে এবং ছাউনি দিতো বড় বড় ঘাস পেতে। খ্রীষ্টজন্মের তিন কিংবা চার হাজার বছর আগে মানুষ ইট কেটে এবং তাকে পুড়িয়ে অট্টালিকা নির্মাণ শুরু করে।

৪। **মৃৎপাত্র**—মৃৎপাত্র নির্মাণ নব্য প্রস্তরযুগের মানুষের এক বড় অবদান। পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষ পাথর কেটে কলসি, বাটি ইত্যাদি যে তৈরি করতো সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্ভবতঃ নদী তীরে বসতি গড়ে ওঠায় এবং পাথর দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় মাটির পাত্র তৈরির দিকে মানুষের ঝোঁক আসে।

বিশেষজ্ঞদের মতে প্রথম মৃতপাত্র নির্মাণ ছোট ছোট-ছেলেমেয়েদেরই কাজ। শিশুমাত্রই অনুকরণ প্রিয়। যা দেখে তাকে নিজ হাতে গড়তে চায়। আমরা ধরে নিতে পারি, সেদিনের শিশুরাও খেলা ঘরের পুতুল তৈরি করতো, রান্না-খেলা খেলতো এবং ঐ সব করতে গিয়ে নদীতীরের অথবা হ্রদের তীরের নরম কাদামাটি দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় খেলার সামগ্রী তৈরী করে নিতো। কাদা দিয়ে পাত্র তৈরির মত এমন ছেলেখেলা সেদিনের কর্মঠ মানুষের মনে আদৌ স্থান পাওয়া সম্ভব ছিল না, তাছাড়া এমন চিন্তা করার সময় বা কোথায় ছিল।

ছেলেদের তৈরি মাটির পাত্র একদিন বড়দের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকর্ষণ করে থাকবে এবং পরিশ্রম করে পাথর কাটার বদলে মাটি দিয়ে পাত্র নির্মাণের কথা মাথায় আসতে পারে। ফলে ঐ কাজে হস্তক্ষেপ করে বড়রা এবং পরের দিকে কাঠকয়লার উনানে ওকে পুড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। মৃৎপাত্র নির্মাণের চাকা (কুমোরের চাকা) কিন্তু আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক পরে।

৫। **নৌকা**—নৌকার আদিরূপ ভেলা। হ্রদের উপর যখন বসতি স্থাপন করে তখন তীরের সঙ্গে যোগাযোগের বাহন ছিল ভেলা অথবা শুকনো গাছের গুঁড়ি। সে সময় মাছ ধরার জন্য পশুর চামড়া দিয়েও একরকম নৌকা তারা তৈরি করতো, এমন নিদর্শনও পাওয়া গেছে।

ভেলার পরবর্তীরূপ গাছের গুঁড়ির ভেতরটা পুড়িয়ে ফেলে এবং পরে কুরে কুরে ডোঙার রূপ প্রদান করে। অতঃপর অস্ত্রশস্ত্রের উন্নতি হলে তারা প্রকৃত নৌকা তৈরি করতে সমর্থ হয়।

ভেলা থেকে নৌকা তৈরি পর্যন্ত যদিও অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে, তবুও বলতে হবে খুব তাড়াতাড়ি মানুষ সে ধাপগুলি অতিক্রম করেছে। তার কারণ, পরিশ্রম লাঘব ও পরিবহনের কাজে নৌকা যে প্রধান সহায়—একথা সেদিনের মানুষ বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিল। তাছাড়া নৌকাযোগে তাড়াতাড়ি নদীপথে যাতায়াতও করা যেতো। তাই নৌকার উন্নতিতে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল।

বাতাসের অভিমুখ ও গতিবেগকে ব্যবহার করে নৌকা চালাতে মানুষকে প্রবৃত্ত করিয়েছিল সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেও। মিশরে প্রাপ্ত প্যাপিরাসের উপর এবং মৃৎপাত্রের উপর আঁকা নৌকার যে ছবি দেখা যায় তাতে পালও

চোখে পড়ে। একটি চিত্র খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আঁকা বলে অনেকে মনে করে থাকেন। সেটি ভেলার অনুরূপ। তবে লম্বায় বেশ বড়। মাঝখানে ছাউনি এবং পাল খাটানোর সরঞ্জাম। মূল ভেলাটি প্যাপিরাসের বাণ্ডিল বলে সন্দেহ করা হয়। আরও নজির পাওয়া গেছে, সেদিনের অনুরূপ নৌকা এত বড় হতো যে, দু' তিনশ লোক তাতে অক্লেশে চেপে যেতে পারতো।

৬। **কাচ**—অনেকের মতে কাচ নব্যপ্রস্তর যুগের আবিষ্কার। কাচের এমন কিছু কিছু নমুনা পাওয়া গেছে যা দেখে বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সাত হাজার বছর বা তারও আগে কাচ প্রস্তুত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের সাড়ে তিন কিংবা চার হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়া এবং মিশরে কাচের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। অনেকের মতে আবার প্রাচীন সভ্যতার গোড়ার দিকে মিশর অপেক্ষা মেসোপটেমিয়া কাচশিল্পে অধিক উন্নত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দু' হাজার অব্দের দিকে মিশর যে কাচ উৎপাদনে সমস্ত সভ্যদেশকে ছাড়িয়ে উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করেছিল—এ বিষয়ে আজ গবেষকরা একমত। তবে সে কাচ আজকের মত স্বচ্ছ ছিল না।

কোন কোন গবেষকের মতে মানুষ কাচ তৈরির অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল বজ্রপাতের ফলে উৎপন্ন কাচ থেকে। সোডিয়াম লবণ মিশ্রিত বালির সন্নিকটে বজ্রপাত হলে কাচের মত বস্তু উৎপন্ন হয়—এমন নমুনা আজকাল অনেকেই হস্তগত করেছেন। আদিতে অনুরূপ পদার্থ লাভ করায় সেদিনের অনুসন্ধিৎসু মানুষ এমন চমৎকার পদার্থটিকে তৈরি করতে প্রয়াসী হবে এতে অসম্ভবতা কোথায়?

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেদিন মানুষের বিপদ ছিল সর্বত্র এবং প্রাকৃতিক বহু রহস্যই ছিল তাদের অজানা। ওদের চোখ কান সব সময় খোলা থাকতো। ভাবালুতা ছিল না, ছিল না মৃত্যু ভয়। বাহুতে যেমন প্রচণ্ড শক্তি ছিল তেমনই বুকে ছিল অসম সাহস। যা দেখতো তাকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করতো এবং কাজে লাগাতেও সচেষ্ট হতো। তাই নব নব উদ্ভাবনী শক্তিতে তারা আজকের সুসভ্য মানুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিল মনে করা যেতে পারে। কাচও তাই তাদের উদ্ভাবনী শক্তির চরম বিকাশ বলা যেতে পারে। তবে কোথায় কিভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে তা সঠিকভাবে বলার কোন উপায় নেই।

খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার অব্দের দিকে মিশরীয়রা ধাতুবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলে তারা তাম্রঘটিত লবণ ব্যবহারের দ্বারা নানা রঙ-বেরঙের কাচ উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়েছিল। এগুলির দ্বারা প্রধানত ছোট বড় ও নানা কারুকার্য-খচিত পানপাত্র নির্মাণ করতো। যেহেতু কাচ সান্দ্র পদার্থ। ওর কোমলায়ন

পদ্ধতি কিংবা ফুঁ দিয়ে ঈপ্সিত বস্তুর রূপ প্রদান করা সেদিন সম্ভব হয়ে উঠেনি। আগে বালি ও মাটির দ্বারা নিরেট এক পাত্র প্রস্তুত করতো এবং তার উপর কারুকার্যের ব্যবস্থা করতো। তারপর প্রচণ্ড ধৈর্য সহকারে তার গায়ে উত্তপ্ত কাচের প্রলেপ দিত। ধাতব পাত্রের গায়েও প্রলেপ দিত ঠিক একই উপায়ে। ফুঁ দিয়ে কাচের পাত্র প্রস্তুতি খ্রীষ্টজন্মের প্রায় বারশ বছর আগে সেই মিশরেই প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস।

৭। **চাকা।**—চাকা নির্মাণ কৌশল আবিষ্কারও মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কোন্ শিল্পী যে প্রথম চাকার পরিকল্পনা করেছিল তা আজ বলার কোন উপায় নেই। তথাপি যার মস্তিষ্কে এর পরিকল্পনা এসেছিল তাঁর তুল্য কারিগর পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ হতে পারেন না।

চাকার সুপ্রাচীন নমুনা কিন্তু আবিষ্কৃত হয়নি। তার একমাত্র কারণ, দীর্ঘ-কালের ব্যবধানে কাঠ সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। নমুনা যা পাওয়া গেছে তা খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার চিত্র। সে চিত্র পাওয়া গেছে সুমের সভ্যতা ও মিশরীয় সভ্যতার যুগের। সিন্ধু সভ্যতায় এবং ক্রীটিয় সভ্যতায়ও অনুরূপ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

সেদিনের চাকা ব্যবহার করা হয়েছিল পরিবহনের জন্য এবং মৃৎপাত্র নির্মাণে। সুমেরীয়রা চার চাকার রথ প্রস্তুত করতো। পরবর্তী তাম্রযুগে চাকার যথেষ্ট উন্নতি হয়। সাধারণত দুটি অর্ধবৃত্তাকার কাষ্ঠখণ্ডকে দুপাশে তামার পেরেক দিয়ে আবদ্ধ করা হতো। তারপর অক্ষদণ্ডের সঙ্গে ভালভাবে বেঁধে দেওয়া হতো। পরের দিকে অক্ষদণ্ডকে চাকার সঙ্গে যুক্ত করার. পরিকল্পনা করতে করতে বহু শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস।

গবেষকদের আবার ধারণা প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলি একই সঙ্গে চাকা ব্যবহারে রপ্ত হয়নি। সিন্ধু সভ্যতায় ও সুমেরীয় সভ্যতায় চাকার নিদর্শন বহু পূর্ববর্তী। মিশর চাকা ব্যবহার করেছে খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার অব্দে। কথিত আছে, হিক্‌সস্ নামে পশ্চিম এশিয়ার এক দুর্ধর্ষ জাতির কাছ থেকে মিশরীয়রা চাকার ব্যবহার শিক্ষা করেছিল। এমন বহু জাতি ছিল, যারা খ্রীষ্টজন্মের মাত্র পাঁচশ বছর আগেও চাকার ব্যবহার জানতো না।

চাকাকে মানুষ প্রথম কিভাবে যে ব্যবহার করেছিল তা আজ বলার কোন উপায় নেই। একদলের মতে কুম্ভকার শ্রেণীর মানুষেরা মৃৎপাত্র তৈরী করতে প্রথম চাকার ব্যবহার করেছিল, অপর দল মনে করেন ঘর্ষণকে উপেক্ষা করতে পরিবহনের কাজে চাকার ব্যবহার আদিম। সে যাই হোক না কেন, ঐ চাকার উদ্ভাবনই মানুষকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। একদিকে কুমোরেরা

অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প সময়ে বহু মৃৎপাত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে, অপরদিকে পরিবহনের হয়েছে উন্নতি এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও এসেছে সাফল্য। সেই প্রাচীনকালেও চাকাযুক্ত রথকে টানার কাজে মানুষ পশুকে ব্যবহার করতো।

প্রাচীন সুসভ্য দেশ এবং তাদের বিজ্ঞান

(খ্রীঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীঃ পূর্ব ৩০০০ অব্দ)

১। **সুমেরীয় এবং ব্যাবিলনীয়দের বিজ্ঞান**—এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরভূমিতে প্রাচীনকালে যে সভ্যতাটি গড়ে উঠেছিল সেই সভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে সুমেরীয় সভ্যতাই সুপ্রাচীন সভ্যতা। খ্রীষ্টপূর্ব দু'হাজার অব্দে মানুষ এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার অব্দে ওরা গৃহপালিত পশুদের ভূমি কর্ষণের কাজে নিয়োগ করেছিল এবং কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের জন্য নদী থেকে খাল কেটে এনেছিল। সেই আমলেই তারা আবিষ্কার করেছিল লেখার পদ্ধতি। তাদের আবিষ্কৃত সেদিনের সেই বর্ণমালা থেকে পরবর্তীকালে "কিউনিফর্ম" বর্ণমালার উৎপত্তি হয়েছে। ওরা যে সভ্যতার পত্তন করেছিল সেটি সুসভ্য নগর সভ্যতা।

গবেষকদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে তারা চাকা আবিষ্কার করেছিল। চাকার সাহায্যে যান নির্মাণ করতো এবং সে যান টানতো গৃহপালিত পশুরা। জলপথে যাতায়াতের জন্য নৌকো তৈরি করতো। মৃৎশিল্পে এবং বয়ন শিল্পেও ছিল অগ্রসর।

খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার অব্দের কাছাকাছি সময়ে তারা পাথরের পরিবর্তে তামাকে ব্যবহার করতে শেখে। অর্থাৎ প্রস্তরযুগ থেকে তাম্রযুগে পদার্পণ করে। পরের দিকে টিনের সঙ্গেও পরিচিত হয় এবং ব্রোজ্ঞ নামক সঙ্কর ধাতুটি প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। ব্রোঞ্জ তৈরির পর তারা কারিগরি বিদ্যায় যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। নানাবিধ আসবাবপত্র, অলঙ্কার, মূর্তি, শীলমোহর ও অস্ত্রশস্ত্র তারা ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরী করতো।

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের দিকে সুমেরীয়রা পাটীগণিত, পরিমিতি ও জ্যামিতির চর্চা শুরু করে। তা হলেও গণিতে জ্ঞান তাদের বহুপূর্ব থেকেই ছিল। অপরদিকে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা বলে জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল এবং বর্ষারম্ভ গণনা করতো। বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও গোলকের

আয়তন নির্ণয়ের কৌশল তারা আবিষ্কার করেছিল—এমন মতও অনেকে পোষণ করে থাকেন। পূর্তবিদ্যা ও গৃহনির্মাণে ছিল যথেষ্ট পারদর্শী।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুমেরীয়রা খুব বেশী উন্নতি করেনি বলে অনেকের বিশ্বাস তবে ঋতু পরিবর্তনের জ্ঞান ছিল এবং বছরের প্রথম মাসকে বৃষ রাশির নামানুসারে নামকরণ করেছিল। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করলেও কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি।

খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দ পর্যন্ত সুমেরীয় সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। তারপর বহিঃশত্রুর আক্রমণে ঐ সভ্যতা মুছে যায়। সেখানকার শাসন ক্ষমতা অধিকার করে ব্যাবিলনের হামুরাবি রাজবংশ।

হামুরাবি ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর শাসনকাল পৃথিবীর ইতিহাসে একাধিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রথম শাসন সংক্রান্ত কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। সেই আইনগুলি "কোড্ অব্ হামুরাবি" বা হামুরাবি সংহিতা নামে আজও প্রসিদ্ধ। হামুরাবিই প্রথম উল্লেখ করেছিলেন "আইনের চোখে সবাই সমান"। অন্যদিকে জনসাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত তিনিই প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়। ফলে হামুরাবির পরবর্তী সম্রাটদের কালে বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।

অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই আছে ব্যাবিলনীয়দের মহত্তম অবদান। পাটীগণিতের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ—এই সাধারণত চার নিয়ম নয়, দশমিক পদ্ধতি, ভগ্নাংশ, বর্গমূল ও ঘনমূল তাদের জানা ছিল। বীজগণিতের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেছিলেন ব্যাবিলনীয় পণ্ডিতেরা। এমন অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ব্যাবিলনীয়রা একঘাত, দ্বিঘাত ও ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। অমূলদ সংখ্যা সম্বন্ধে অল্পসল্প ধারণা ছিল বলে আজকে অনেকে মনে করে থাকেন। আরও আশ্চর্যের কথা, বীজগণিতের পদ্ধতি প্রয়োগ করে তারা আকাশের গ্রহদের গতিবিধি নির্ণয় করতো। অর্ধবৃত্তস্থ কোণের পরিমাণ যে এক সমকোণ হয় এই সত্যের উদ্ভাবকও ব্যাবলনীয়রা।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যাবিলনীয় অবদানের যেন কোন তুলনাই হয় না। পঞ্জিকা গণনাও তারা ভালভাবে করতো। তারা হিসাব জানতো চান্দ্রবছর ও সৌর-বছরের। ফলে ঋতুকে ঠিক রাখার জন্য তারা কোন কোন বছর ১২ এর পরিবর্তে ১৩ মাস ধরতো। অর্থাৎ হিন্দু পঞ্জিকায় যেমন চান্দ্রবছর ও সৌরবছরের মধ্যে সমতা ঠিক রাখার প্রতি চার বছর অন্তর একটি মাসকে মলমাস

ধরা হয় এবং উক্ত মাসটিতে সমস্ত শুভ কর্ম নিষিদ্ধ করা হয়, এও যেন অনেকটা তেমনই।

গ্রহণ গণনা ব্যাবিলনীয়দের আর এক কৃতিত্ব। এঁরা স্যারোস চক্রের উদ্ভাবক। ঐ চক্র অনুযায়ী তারা প্রতি ১৮ বছর ১১ দিনে ২৭টি চন্দ্রগ্রহণ ও ৪২টি সূর্য গ্রহণকে স্থান দিয়েছিল। প্রতি ৫৪ বছর ১ মাস পরে গ্রহণগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটে—এই সিদ্ধান্তও তাদেরই। এই নিয়ম ১২০০ বছর ধরে মেনে চলার জন্য ১২০০ বছরের গ্রহণের চক্রবৎ অনুসরণের নীতিকে তারা স্যারোস চক্র নাম দিয়েছিল। এই নিয়ম আজও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

অয়নচলন সংক্রান্ত তথ্যও ব্যাবিলনীয়দের আবিষ্কার। প্রখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিদ হিপারকাসের বহু পূর্বে ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদ কিদিন্নু উক্ত আবিষ্কারটি করে গেছেন।

গ্রহদের গতিবিধি সংক্রান্ত বহু নির্ভুল তথ্য তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। শুক্রগ্রহ যে প্রতি আটবছরে পাঁচবার আকাশের বিশেষ একটি জায়গায় অবস্থান করে—এই সত্যেরও আবিষ্কারক তাঁরাই।

ব্যাবিলনীয়রা বছরকে মাসে, মাসকে সপ্তাহে ও দিনে ভাগ করেছিল। সপ্তাহের সাত দিনকে সাতজন দেবতার নামে তারা চিহ্নিত করেছিল। সাত-দিনের বারগুলি ছিল যথাক্রমে নিনিব, মার্দুক, নের্গাল, শামাশ, ইশতার, নাবু ও সিন। ওরা দিনকে আবার ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করেছিল। জলঘড়ি, সূর্যঘড়ি ইত্যাদির সাহায্যে সময়ও নির্ধারণ করতো।

বলা বাহুল্য যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে উক্ত আবিষ্কারগুলি ওদের সভ্যতার শেষ ভাগের দিকে। গ্রীকরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তার মূলে ছিল ব্যাবিলনীয়দের অবদান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রীকরা ব্যাবিলনীয়দের জোতির্বিজ্ঞানকে যেভাবে অনুসরণ করেছিল সেভাবে তাদের উন্নত বীজগণিতকে অনুসরণ করতে পারেনি।

কারিগরি বিদ্যায়ও যে তারা চরমভাবে উন্নতি লাভ করেছিল, তার প্রমাণ ব্যাবিলনের সম্রাট দ্বিতীয় নেবুকাডনেজারের আমলে নির্মিত ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান। এটি পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম হিসাবে ধরা হতো।

ব্যাবিলনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা হয়, ইউফ্রেটিসের উভয় তীরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল শহর। প্রধান নগরীকে ঘিরে ছিল সুউচ্চ প্রাচীর এবং প্রাচীরের বাহিরে ছিল গভীরপরিখা। সুরক্ষিত নগরটিতে প্রবেশের পথ ছিল মোট আটটি। প্রধান প্রবেশ পথটি ছিল ইস্তার দেবীর নামাঙ্কিত। নগরীর ঠিক মধ্যস্থলে ছিল অপূর্ব কারুকার্য মণ্ডিত নগর দেবতা মারডুকের মন্দির।

নগরীর বাড়ীগুলির কোন কোনটি সাত-আটতলা পর্যন্ত উচু ছিল এবং সমস্ত বাড়ী ছিল পাকা ইটের তৈরি। ইউফ্রেটিসের উভয়তীরের সংযোগ রক্ষা করতো কতকগুলি কাঠের সেতু। নিঃসন্দেহে এগুলি তাদের উন্নত বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের পরিচায়ক। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত উক্ত সভ্যতা স্থায়ী হয়েছিল।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে সুমেরীয়রা এবং ব্যাবিলনীয়রা যে কতখানি উন্নত ছিল—সে কথা সঠিকভাবে বলা যায় না। যে সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে চিকিৎসা সংক্রান্ত লিপির সংখ্যা নিতান্তই অল্প। যে একটি মাত্র পুঁথি পাওয়া গেছে সেটিকেও গবেষকরা খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর আগে স্থান দিতে চান না। তবে রাজা হামুরাবির একটি নির্দেশনামা পাওয়া গেছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন চিকিৎসক চিকিৎসাক্ষেত্রে যোগ্যতা প্রদর্শন করলে তাকে পুরষ্কৃত করা হবে এবং ব্যর্থতা বরণ করলে দণ্ডভোগ করতে হবে। উক্ত নির্দেশনামা অবশ্য তাদের চিকিৎসাবিজ্ঞানে অনগ্রসরতা প্রমাণ করে না।

২। **মিশরীয়দের বিজ্ঞান**—১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর নেপোলিয়েঁ মিশরে আপন অধিকার স্থাপনের জন্য যাত্রা করেন। নেপোলিয়েঁর একটা বড় গুণ ছিল, যখন তিনি যেখানে যেতেন সঙ্গে করতেন একদল পণ্ডিতকে। এবারও সঙ্গে ছিল বিরাট এক সৈন্যদল এবং কিছুসংখ্যক পণ্ডিত। কথিত আছে, নেপোলিয়েঁ ব্রিটিশ সেনাপতি নেলসনের হাতে পরাজিত হয়ে গোপনে পলায়ন করেন কিন্তু যেসব পণ্ডিতকে তিনি নিয়ে গেছিলেন তাঁরা ফিরে আসতে পারেননি। বাধ্য হয়ে তাঁরা মিশরে থেকে যায়। একদিন ঐ পণ্ডিতদের হাতে পড়ে মিশরের কতকগুলি প্রাচীন লিপি। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তাঁরা লিপিগুলোকে নিয়ে গবেষণা করেন। পরিশেষে বহু পরিশ্রমে শাপোলিয়েঁ ইয়ং প্রভৃতি পণ্ডিত ঐ লিপির প্রাঠোদ্ধারের সক্ষম হন। সেই সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রাচীন মিশরের ইতিহাসখানার আবরণ উন্মোচিত হয়।

প্যাপিরাসের উপর অঙ্কিত চিত্র ও লিপি, শীলমোহর ইত্যাদি পাঠ করে জানা গেছে, মিশরীয় সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার অব্দে বিস্তারলাভ করেছিল। প্রায় কুড়িটি রাজবংশ রাজত্ব করার পর খ্রীষ্টপূর্ব ৬৭৪ অব্দে এখানে স্থাপিত হয় আসিরীয় অধিকার। তাই প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও অধিককাল ধরে এই সভ্যতা বিকাশলাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করে জানা গেছে, ভারি অদ্ভুত দেশ ছিল সেই মিশর। সেখানকার রাজাদের উপাধি ছিল ফ্যারাও। এবং তাঁদের প্রাসাদে ঐশ্বর্যের যেন বান ডাকতো। সোনাদানা ও মণিমুক্তার ছিল ছড়াছড়ি। মিশরীয়দের মনে

বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল, মানুষ মৃত্যুর পরও পার্থিব সম্পদ ভোগ করতে পারে। সেই সংস্কারের বশেই রাজরাজড়ার মৃতদেহের সঙ্গে অজস্র রত্ন, স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার, মূল্যবান আসবাবপত্র এবং ইহজীবনে যে সব দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করতো তাদের সব কিছুকে কবরে স্থান দেওয়া হতো। মৃতদেহকেও সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা ছিল। সংরক্ষিত মৃতদেহকে বলা হতো মমি। সাধারণত রাজার মৃতদেহকে সংরক্ষিত করে এবং সঙ্গে অমুল্য রত্নরাজি দিয়ে কবর দেওয়া হতো। আর যাতে চুরি না হয় তারজন্য কবরের উপর রচনা করা হতো বিশাল বিশাল পিরামিড। সে পিরামিড এখনও দৃষ্ট হয়।

মৃতদেহ থেকে মমি প্রস্তুত করা হতো বড় অদ্ভুত উপায়ে। মরা মানুষকে প্রথমে কয়েক সপ্তাহ ধরে কোন একটি বিশেষ আরকে ভিজিয়ে রাখা হতো। তারপর তার পেট চিরে নাড়ি ভুঁড়িগুলো বার করে এবং তার পরিবর্তে পিচ পুরে সেলাই করে দেওয়া হতো। অতঃপর মৃতদেহের সর্বাঙ্গে জড়ানো হতো নতুন কাপড়ের ফালি। অবশেষে একটা সুদৃশ্য বাক্সের মধ্যে পুরে পিরামিডের তলায় একটি গোপন প্রকোষ্ঠে শায়িত করা হতো। ফরাসী ভাষায় পিচকে বলা হয় মমিয়াই। ঐ মমিয়াই থেকে মমি কথাটি এসেছে।

আশ্চর্যের বিষয়, সহস্র সহস্র বছরের ব্যবধানেও মমি অবিকৃত আছে। মৃতদেহকে অক্ষত রাখার জন্য যে রাসায়নিক পদার্থটি ব্যবহার করা হতো তা এখনও কিন্তু অজ্ঞাত। অপরদিকে কবরের উপর নির্মিত পিরামিডও বড় অদ্ভুত ধরনের। ফ্যারাওরা সমগ্র রাজত্বকালটা ধরে নিজেদের একটি করে পিরামিড নির্মাণের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁরা মনে করতেন, ইহকালটা সামান্য সময়। অনাদি ও অনন্তকাল ধরে তাকে কাটাতে হবে পরলোকে। দুষ্ট ব্যক্তিরা কোন সময়ে তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র যাতে চুরি করতে না পারে তার জন্য বড় বড় চৌকো পাথরকে পরপর গেঁথে শতশত ফুট উঁচু করা হতো। ওকেই পিরামিড বলা হতো এবং এর তিনটি অথবা চারটি পল অথচ উপরের দিকে ক্রমশ ছুঁচলো।

পিরামিডও এককালে পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম হিসাবে স্বীকার করা হতো। কিন্তু আশ্চর্য এই পিরামিড নির্মাণকালে নিশ্চয়ই কপিকল জাতীয় কিছু ব্যবহার করা হতো। এবং শীর্ষ থেকে মাইলের পর মাইল ঢালু করে রাস্তা তৈরি হতো। তা না হলে এত উচ্চে এত বড় চৌকো পাথরকে তোলা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। সেকালের পূর্তবিদ্যা, জ্যামিতি ও কারিগরি জ্ঞানের এক আশ্চর্য সমাহার এই পিরামিড।

প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয়েছে, মিশরবাসীরা বড় বড় খাল

কেটে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতো এবং নদীমুখে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখার পদ্ধতি প্রথম তাদেরই মাথায় এসেছিল।

প্যাপিরাসের লিপি থেকে জানা যায় মিশর পাটীগণিত ও বীজগণিতে ব্যাবিলনের মত এত উন্নত ছিল না। পাটীগণিতে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ও ভাগ এই চার নিয়ম এবং দশমিক পদ্ধতি জানতো। বেশ বড় বড় সংখ্যা তারা গণনা করতো, তবে শূন্যের ব্যবহার জানতো না। আহ্‌মেস প্যারিরাসে ভগ্নাংশের ব্যবহারও দেখা যায়। বীজগণিতে অবশ্য কিছুটা উন্নত ছিল। তারা সমীকরণের সমাধান করতে পারতো। প্যাপিরাসে সমান্তর শ্রেণী ও গুণোত্তর শ্রেণীরও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে।

আজকের প্রত্নতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত মিশরীয়দের উন্নত গণিত চিন্তার অনুকূলে রায় না দিলেও গ্রীকরা কিন্তু যথেষ্ট প্রশংসা করে গেছেন। মিশরীয়দের কাছে গ্রীকদের গণিতে ঋণও স্বীকার করেছেন অনেকে।

আজকের গবেষকদের মতে প্রাচীন মিশর পাটীগণিত ও বীজগণিতে ততখানি কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে না পারলেও জ্যামিতিতে অভাবনীয়ভাবে উন্নতি করেছিল। প্লেটো, হেরাডাটাস, অ্যারিস্টটল প্রভৃতি গ্রীক চিন্তানায়কগণ ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন মিশরীয় জ্যামিতির। হেরাডাটাসের বিবরণী থেকে জানা যায়, মিশরের ফ্যারাওরা নিদিষ্ট পরিমাণ এক এক খণ্ড জমি প্রজাদের মধ্যে বিলি করতেন এবং ঐ জমির উপর রাজস্ব নির্ধারণ করতেন। নীল নদের বন্যায় জমির সীমা মুছে গেলে কিংবা জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে পুনরায় জমির সীমানা নির্ধারণ ও সমপরিমাণ নতুন জমি দান ইত্যাদির জন্য বিশেষজ্ঞ পাঠাতেন। ঐ বিবরণী প্রমাণ করে, প্রাচীন মিশর জ্যামিতি ও পরিমিতিতে কি পরিমাণ অগ্রসর ছিল। আজকের দিনে আমরা যে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বহুভুজ ও বৃত্তের ক্ষেত্রফল এবং সিলিণ্ডার ও পিরামিডের ঘনফল নির্ণয় করে থাকি, তা মিশরেরই অবদান। বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে (পাই) নামক ধ্রুবকটির মান অনেকটা নির্ভুলভাবেই তারা নির্ণয় করে গিয়েছিল।

কারও কারও মতে ঘনফল নির্ণয়ের জন্য কোন সূত্র তারা উদ্ভাবন করতে পারেনি বা কোন তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু অনেক জটিল ঘনকের ঘনফল তারা নির্ভুলভাবেই নির্ণয় করেছিল। এটি তাদের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল বলে ধরে নিয়েছেন অনেকে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের মিশরীয়রা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারলেও উন্নত পঞ্জিকার উদ্ভাবন করেছিল। প্রথম প্রথম নীলনদে প্রথম বন্যা আসার দিনকে বর্ষারম্ভ ধরলেও পরের দিকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র স্থির করে বর্ষা গণনা শুরু

করে। পঞ্জিকার ক্ষেত্রে ওদের সর্বাধিক কৃতিত্ব লিপইয়ার গণনা। ৩৬৫ দিনে একবছর ধরলেও বছরের কিছু সময় অবশিষ্ট থেকে যায় এবং প্রতি চার বছরে সময়ের পরিমাণ দাঁড়ায় একদিনের মত। সত্যটি তারা সেইদিনই আবিষ্কার করেছিল এবং আজও সেই পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়।

মিশরীয়রা সৌরবছর ও চান্দ্রবছর উভয়ই গণনা করতো। সপ্তাহের বারগুলি চিহ্নিত করেছিল সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের নামে। ওরা রাশিচক্র ও কতকগুলি তারা-মণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত ছিল। এমনও মনে করা হয়, মিশরীয়রা আকাশের মানচিত্রও নির্মাণ করেছিল। ধ্রুবনক্ষত্র ছিল তাদের কাছে অতি পরিচিত। ঐ নক্ষত্রটির সাহায্যে তারা দিক নির্ণয়ও করতো এবং মন্দির, পিরামিড ইত্যাদি নির্মাণের ব্যাপারে ধ্রুবনক্ষত্রের অবস্থানকে কাজে লাগাতো।

সমসাময়িককালে মিশর চিকিৎসা বিদ্যায় ছিল বেশ অগ্রসর। প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ চিকিৎসা সংক্রান্ত যে সব লিপি পাওয়া গেছে সেগুলিকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে স্থান দিয়েছেন। সেই লিপি এবং মিশরের প্রাচীন প্যাপিরাসগুলিতে রোগের কারণ ও চিকিৎসার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে সর্বক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, দেহে অশুভ আত্মা তথা অপদেবতা ও ভূত প্রেতাদির আশ্রয় হলেই অসুখ করে। সেই কারণে সেকালে মিশরের চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল দেহ থেকে অশুভ আত্মার বিতাড়ন। তবে উক্ত কাজে তারা মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যবহার না করে ভেষজ শক্তিকেই প্রয়োগ করতেন।

প্রমাণিত হয়েছে মিশরীয় পুরোহিতরাই চিকিৎসা করতে করতে চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকও আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে ইমহোটোপ নামে এক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর নামও আছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, এই ইমহোটোপই চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্রষ্টা। ইনি ছিলেন মিশরের রাজা জোসারের চিকিৎসক।

এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস নামে শল্য চিকিৎসার একটি গ্রন্থও আবিষ্কৃত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার আঘাত ও ক্ষতের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে অস্ত্রোপচার বিধি। প্যাপিরাসটি থেকে অনেকে অনুমান করেন, শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে মিশরীয়রা যথেষ্ট উন্নত ছিল। যেহেতু মৃতদেহকে মমি করার প্রথা ছিল, তাই শারীরবিদ্যা সম্বন্ধেও ভালভাবে জ্ঞান ছিল তাদের।

মিশরীয় সভ্যতা ছিল তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা। অলঙ্কার শিল্পে, কারিগরি বিদ্যায় ও যন্ত্র বিদ্যার সে আমলে তাদের জুড়ি কেউ ছিল না। রসায়ন চর্চায় সেকালে মিশর ছিল একক। রসায়নকে তারা বলতো কিমিয়া যাঁরা এই শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করতেন তাদের বলা হতো কিমিয়াবিদ। কতকগুলি অম্ল,

জারক দ্রব্য ও রঞ্জক তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন।

ধাতুবিদ্যায়ও মিশরীয়রা যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। সোনা, রূপা, টিন, তামা প্রভৃতি ধাতুকে তারা ব্যবহার করতো। মিশরের কামারশালায় বহু চিত্র সংগৃহীত হয়েছে। বহু ধাতব আকরিকের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছিল বলেও মনে করা হয়। হীরকের ব্যবহারও তারা জানতো।

মিশরে আসিরীয় অধিকার স্থাপিত হলেও বিজ্ঞানচর্চা দীর্ঘকাল ধরেই চলেছিল। বিশেষতঃ রাজা আসুরবাণি পালের আমলে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা হয়েছিল পুরোদমে। যদিও ইতিহাসে তিনি একজন নিষ্ঠুর রাজা নামে খ্যাত, তথাপি প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। তিনি মিশরীয় প্রাচীন লিপি ও পুঁথিগুলি সংগ্রহ করেছিলেন এবং পুস্তক রচনার জন্য বহু পণ্ডিতকে নিয়োগ করেছিলেন। রাজধানী নিনেভে স্থাপন করেছিলেন একটি বিশাল গ্রন্থাগার। বর্তমানে নিনেভে গ্রন্থাগারটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেখান থেকে পাওয়া গেছে প্রায় ২২ হাজার গ্রন্থ। সমস্ত গ্রন্থই বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

৩। সিন্ধু সভ্যতার বিজ্ঞান—প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের লুধিয়ানা জেলার মহেঞ্জোদারো নামক স্থানে খনন কার্যের ফলে এক লুধিয়ানানগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। কিছুকাল পরে পাঞ্জাবের মণ্টগোয়া জেলার হরপ্পা নামক স্থানে এই ধরনের আর একটি সভ্যতার ধ্বংসাবশে ও আবিষ্কৃত হয়। এই দুই স্থানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন, অতি প্রাচীনকালে সিন্ধু ও তার উপনদীগুলির তীরে এক সুসভ্য নগর সভ্যতার পত্তন হয়েছিল। গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, এই সভ্যতা খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিনহাজার বছর পূর্বের এবং মিশরীয় সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক। পরবর্তীকালে গঙ্গা নদীর তীরে তীরে, গুজরাটের কাথিয়াবাড় ও আমেদাবাদ অঞ্চলে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় অনুরূপ আরও বহু প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় উক্ত অঞ্চলগুলিতে যে সব প্রাচীন লিপি পাওয়া গেছে তাদের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। তাই ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতাটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। কেবলমাত্র পণ্ডিতেরা অপরাপর প্রাচীন সভ্যতাগুলির নিদর্শনের সঙ্গে এখানকার নিদর্শনগুলিকে মিলিয়ে একটা অনুমান খাড়া করেছেন মাত্র। যদি কোনদিন লিপিগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় তাহলে ভারতের সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য হস্তগত হবে।

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মত সিন্ধু সভ্যতাও ছিল নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা।

মহেঞ্জোদাড়ো নগরটি প্রশস্ত রাজপথ দ্বারা বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত ছিল। পল্লীর বাড়ীগুলি তৈরির জন্য কাঁচা ও পাকা উভয় প্রকারের ইট ব্যবহার করা হয়েছিল। বহুতলা বিশিষ্ট ও বহু প্রকোষ্ঠযুক্ত অট্টালিকারও ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজপথের পাশে যে সব অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছিল তাদের নিচের তলাগুলো দোকানপাটের জন্য ব্যবহার করা হতো, এবং উপরের তলাগুলো ব্যবহৃত হতো বাসগৃহরূপে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো উভয়স্থানেই আবিষ্কৃত হয়েছে বিরাট বিরাট শস্যাগার, দুর্গ ক্রীতদাসদের থাকার ঘর ইত্যাদি।

অনেকে মনে করেন প্রস্তর যুগ, তাম্রযুগ এবং ব্রোঞ্জ যুগ এই তিনটি যুগ ধরে সিন্ধু সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। মহেঞ্জোদাড়োতে আবিষ্কৃত সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তুটি হলো এখানকার বিরাট স্নানাগার। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ১৮০ ফুট দৈর্ঘ্যের এবং ১০৮ ফুট প্রস্থের স্নানাগারটি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্মিত হয়েছিল। এখানকার শস্যাগারটির দৈর্ঘ্য ছিল ১৫০ ফুট এবং প্রস্থ ছিল ৭৫ ফুট। হরপ্পায়ও স্নানাগার এবং শস্যাগার উভয়েই ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পায় প্রাপ্ত ভুক্তাবশেষ ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র থেকে অনুমান করা হয়—ওরা যব, তিল, রাই, মটর প্রভৃতি শস্য চাষ করতো। আহার্য হিসাবে গ্রহণ করতো মেষ, শূকর, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস এবং শামুক, গুগলি ও সামুদ্রিক মাছ। তারা সূতীবস্ত্র ও পশম বস্ত্র দুইই প্রস্তুত করতে পারতো। গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করতো তামা, পেতল, ব্রোঞ্জ, পাথর ও পোড়ামাটির বাসনপত্র, চীনামাটির পাত্রেরও প্রচলন ছিল। নারীপুরুষ উভয়েই সোনা, রূপা শঙ্খ ও মূল্যবান প্রস্তর নির্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করতো। তারা যথেষ্ট সৌখিনও ছিল। গজদন্তের চিরুণী ব্যবহার করতো আর ব্যবহার করতো ধাতু নির্মিত দর্পন। প্রসাধন ও অঙ্গমার্জনার উপকরণ তাদের অজানা ছিল না। বড়শি, সূচ ও মার্বেল পাথরের বহু জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে।

পণ্ডিতেরা মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় কতকগুলি শীলমোহর পেয়েছেন। সেই শীলমোহরগুলি অনেকটা মেসোপটেমিয়া এবং মিশরে প্রাপ্ত শীলমোহরের অনুরূপ। তাই অনেকে অনুমান করেছেন, মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সঙ্গে ওদের ছিল বাণিজ্যিক যোগাযোগ। ওরা স্থলপথে মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে এবং জলপথে মিশরের সঙ্গে ব্যবসা বানিজ্য চালাতো।

সুপ্রাচীন এই সভ্যতাটি যে বিজ্ঞানে যথেষ্ট অগ্রসর ছিল, তা উপরোক্ত নিদর্শনগুলি থেকে বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়। ওরা কারিগরি বিদ্যায় ছিল মিশরের প্রায় সমকক্ষ এবং পূর্ত ও গৃহনির্মাণে মিশর ও মেসোপটেমিয়া থেকে

ছিল উন্নত। তারা তামা, টিন, দস্তা, তামা ও টিনের সঙ্কর ব্রোঞ্জ, তামা ও দস্তার সঙ্কর পেতল, প্রভৃতির ব্যবহার ও প্রস্তুত প্রণালী উভয়ই জানতো। সোনা ও রূপাকে তারা চিহ্নিত করেছিল মূল্যবান ধাতু হিসাবে। অলঙ্কার শিল্পে ও মৃৎশিল্পে সিন্ধুতীরের অধিবাসীরা ছিল বিশেষভাবে দক্ষ। কিন্তু সেখানে কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি। সেই কারণে অনেকে অনুমান করেন, ওদের মধ্যে বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। তাদের তৈরি স্নানাগার, শস্যাগার ও অট্টালিকা তাদের অঙ্ক ও জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করছে। বহু মাপনি দণ্ড ও বাটখারাও আবিষ্কৃত হয়েছে। এমন অনেক বাটখারা পাওয়া গেছে, যাদের ওজন এক গ্রামেরও কম। একটি দাঁড়িপাল্লা পাওয়া গেছে যার দণ্ডটি পেতলের এবং পাল্লা দুটি তামার।

সিন্ধুসভ্যতা কেবলমাত্র ভারতের নদী উপত্যকাগুলিতে নয়, ভারতের বাহিরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছুকাল আগে ডেনমার্কের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পারস্য উপসাগরে বহ্‌রাইন নামক একটি দ্বীপে খনন কার্য চালিয়েছিল। সেখান থেকে পাওয়া গেছে বহু পুরাবস্তু। আশ্চর্যের কথা এখানকার প্রাপ্ত পুরাবস্তুর সঙ্গে হরপ্পার আছে পুরাবস্তুর হুবহু মিল। এমনকি শীলমোহর পর্যন্ত।

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা ছিল তাম্র ও ব্রোঞ্জ-যুগের সভ্যতা। এখানে যে সব ধাতব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে তার বেশিরভাগই তামার তৈরি। পেতল এবং ব্রোঞ্জের জিনিসপত্রও নগণ্য নয়। বহিরাগত আর্যরাই এই সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল। সম্ভবতঃ আর্যদের আগমন হয়েছিল মধ্য-এশিয়া থেকে। আর্যরা লোহার ব্যবহার জানতো এবং যুদ্ধে রথ ও অশ্ব উভয়ই ব্যবহার করতো। ওদের উন্নত যুদ্ধোপকরণের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয় তৎকালীন ভারতীয় অধিবাসীরা। তবে রীতিমত যুদ্ধ হয়েছিল। মনে হয়, সেই যুদ্ধগুলি ভারতীয় পুরাণে দেবাসুরের যুদ্ধ নামে চিহ্নিত। যদি অসুরেরা এদেশের আদিম অধিবাসী হয়ে থাকেন তাহলে তাঁরা যে জ্ঞান বিজ্ঞানে অনগ্রসর ছিলেন—একথা পুরাণগুলি প্রমাণ করেন না। ওরা লোহার যে ব্যবহার জানতো তার উল্লেখ আছে ময়দানবের আখ্যানে। রাবণের স্বর্ণলঙ্কা, রথ ও যুদ্ধাস্ত্র উন্নত কারিগরি বিদ্যা এবং গভীর গণিত ও জ্যামিতি জ্ঞানের পরিচায়ক। রাবণের রাজসভার যে জাঁকজমকের কথা বর্ণিত হয়েছে তাতে তাঁকে অসভ্য কিংবা বর্বর কিছুতেই বলা যায় না। যন্ত্রবিদ্যা ও অট্টালিকা নির্মাণে আর্যদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল ওরাই। ওদের উন্নত কারিগরি বিদ্যা ও অট্টালিকা নির্মাণ পদ্ধতি আর্যদের যে একেবারে মুগ্ধ করেনি এমন নয়। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভা নির্মাণে ময়দানবের ডাক পড়েছিল। দুর্যোধন পুরোচনকে আশ্রয় দান করেছিলেন তাঁর যন্ত্রবিদ্যা,

স্থাপত্যবিদ্যা ও রসায়নে পারদর্শিতার জন্য।

হরপ্পার সভ্যতা যে আর্যরাই ধ্বংস করেছিলেন তার উল্লেখ তাঁদের ঋগ্বেদেই আছে। তাঁরা হরপ্পা না বলে বলেছেন হরিয়ুরোপীয়। ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে হরিয়ুরোপীয় এবং হরপ্পা একই স্থানের নাম।

মহাকবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণের কথাও একবার ভাবতে হয়। সেই মহাবলশালী রাক্ষসরাজ রাবণ কে? ইনি কি সত্যই ঐতিহাসিক পুরুষ? সম্প্রতি মালদ্বীপ থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি লক্ষ্য করে অনেকের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে, ঐ মালাদ্বীপেই ছিল রাবণের রাজধানী। ভারতীয় উপকূলভাগ পর্যন্ত এক বিশাল নিমজ্জিত শৈলশিরাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রাচীন লিপিসমূহের পাঠোদ্ধারের পর জানা গেছে, মহাকবি হোমার বর্ণিত ইলিয়াড ও ওডেসির কাহিনী অনৈতিহাসিক নয়। মহেঞ্জোদয়াড়ো ও হরপ্পার লিপিও পাঠ করা গেলে মনে হয় আবিষ্কৃত হবে মহাকবি বাল্মিকী ও বেদব্যাসের কাহিনীগুলির মধ্যেও ঐতিহাসিক সত্য বিদ্যমান। তবে যতদিন না পাঠ করা যাচ্ছে ততদিন সঠিকভাবে কিছু বলার উপায় নেই। শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে, আর্যদের আগমনের সময় ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা তারকাসুর, রাবণ প্রভৃতি রাজারা কম শক্তিধর ছিলেন না। পুরাণে এবং মহাকাব্যগুলিতে অতিশয়োক্তি থাকলেও বিশেষ বিশেষ কাহিনী থেকে মনে করা যেতে পারে, অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা থেকে ভারতীয় সিন্ধুসভ্যতা ছিল বিজ্ঞানে অধিক অগ্রসর। আর রাবণ যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে তিনি ছিলেন ব্যাবিলনের হামুরাবি কিংবা দ্বিতীয় নেবুকাডনেজার অথবা মিশরের খুফুর মত প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট। সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্যগুলি, যথা ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান এবং মিশরের পিরামিডের মতই স্বর্ণলঙ্কা ছিল সেদিনের এক দর্শনীয় বস্তু। তবে আসুরবাণিপালের মত রাবণ হয়ত এক অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর সম্রাট ছিলেন।

৪। **চীনের বিজ্ঞান**—চীনের ইয়াং সিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর তীরে প্রাচীনকালে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই সভ্যতাকে চীন সভ্যতা বলা হয়। এই সভ্যতা সেকালের অপরাপর সভ্যতার মত বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হতে পারেনি। তাই দীর্ঘকাল ধরে চীনসভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল এবং বলতে গেলে আজও পর্যন্ত তাদের সে ধারাটি অব্যাহত আছে। সেখানকার প্রাপ্ত প্রাচীন লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করতেও পণ্ডিতদের বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। উক্ত কারণে একমাত্র এই সভ্যতাটির বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে।

চীনের বৈশিষ্ট্য ছিল, অতি প্রাচীনকালেও তারা ইতিহাস লিখতে অভ্যস্ত

ছিল। সেই ইতিহাস থেকে জানা যায়, চীন সভ্যতার প্রথম যুগে পাঁচজন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। রাজাদের নাম যথাক্রমে ফুহ্‌সি, সেন্ নুং, হুয়াংতি, ইয়াও এবং শুন। কথিত আছে, প্রথম রাজা ফুহ্‌সিই চীনালিপির প্রচলন করেছিলেন। তাঁরই আমলে প্রথম রেশমকীটের প্রতিপালন শুরু হয় এবং সেই থেকে রেশমী বস্ত্রবয়ন পদ্ধতি প্রচলিত হয়। গবেষকদের মতে ফুহসির রাজত্বকাল খ্রীষ্টপূর্ব ২৭০০ অব্দের কাছাকাছি সময়। গবেষণা থেকে আরও অনুমান করা যায়, সিন্ধুসভ্যতা কিংবা মিশরীয় সভ্যতার মত চীনসভ্যতাও খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ বা সমসাময়িক কালে বিকাশলাভ করেছিল। আবার কোন কোন গবেষকের মতে চীন সভ্যতা এত প্রাচীন নয়। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের দিকেই বিকশিত হয়েছিল।

সে যাই হোক না কেন, গবেষকরা একমত যে, প্রাচীনকালে চীনের পঞ্চ রাজার রাজত্বকালে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। রাজা সেন্ নুং এর আমলে লাঙ্গল উদ্ভাবিত হয় এবং কৃষিকাজের প্রচলন হয়। হুয়াংতির সময় চীনারা চুম্বকের কয়েকটি গুণ আবিষ্কার করে এবং চাকাযুক্ত গাড়ির ব্যবহার শুরু করে। তাঁর সময় প্রথম বর্ষপঞ্জী রচিত হয়। কথিত আছে, রাজা স্বয়ং গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য কতকগুলি পণ্ডিতকে নিয়োগ করেছিলেন।

চতুর্থ রাজা ইয়াও ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ ও শ্রেষ্ঠ বিচারক। জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রজাদের উৎসাহিত করতেন। শেষ রাজা শুন হোয়াংহো নদীর বন্যা রোধের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের জন্য কতকগুলি খাল খনন করেছিলেন।

পরবর্তী শ্যাং রাজবংশের আমলেও বিজ্ঞানচর্চার ধারাটি অব্যাহত ছিল। হোনান প্রদেশে শাং রাজাদের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সব জিনিস পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে আছে কলাই করা ও নক্সা করা মৃৎপাত্র, ব্রোঞ্জ পাত্র, যাদুমন্ত্র লেখা কচ্ছপের খোল ইত্যাদি। কিন্তু কোন লোহার জিনিস পাওয়া যায়নি। নিদর্শনগুলি থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন শ্যাং রাজবংশের শেষেও অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ১১২৩ অব্দেও চীন লোহার ব্যবহার জানতো না। কচ্ছপের খোলে লেখা যাদুমন্ত্রগুলি থেকে অনুমান করা হয়, সেকালে চীনে একদল গণৎকারের আবির্ভাব হয়েছিল এবং তারা মানুষের ভাগ্য গণনা করতো।

শ্যাং রাজবংশের পর প্রায় হাজার বছর ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল জো রাজবংশ। জো বংশের রাজত্বকাল চীনের ইতিহাসে একাধিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত ঐ আমলে চীনে লোহার ব্যবহার শুরু হয়, দ্বিতীয়ত সুনির্দিষ্ট

আইন প্রণয়ন করা হয়। ফলে একদিকে প্রজাসাধারণের উন্নতি যেমন অব্যাহত থাকে তেমনই জ্ঞান বিজ্ঞানেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে চীনে কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। এঁদের মধ্যে পৃথিবী বিখ্যাত দার্শনিক কনফুসিয়ে অন্যতম। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। "শুচিং" নামক তাঁর ইতিহাস গ্রন্থটি থেকে জানা যায়, সে সময় চীনারা বিজ্ঞানে আশাতিতভাবে উন্নতি লাভ করেছিল। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা মানুষকে দান করেছিল যথেষ্ট সুখ ও সমৃদ্ধি। সেকালে চীনারা জুতা পরতো, পথে ঘোড়ায়টানা গাড়ি হাঁকিয়ে চলতো, চীনামাটির বিচিত্র পাত্রে পান ভোজন করতো এবং সুসজ্জিত গৃহে বাস করতো।

অপরাপর প্রাপ্ত নির্দর্শনগুলি থেকে প্রমাণিত হয়, প্রাচীনকালে চীন গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের চর্চায় সমকালীন বহু সভ্য দেশকে অতিক্রম করেছিল। "চিউচ্যাং স্থয়ানশু" নামে পাটিগণিতের এক বিরাট গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রন্থটি নয় খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলি যথাক্রমে (১) ক্ষেত্রজ্যামিতি ও ভগ্নাংশ (২) ত্রৈরাশিক (৩) সম্ভূয় সমুত্থান (৪) বর্গমূল ও ঘনমূল (৫) ঘন জ্যামিতি (৬) লাভ ক্ষতি (৭) একঘাত সমীকরণ (৮) বিমিশ্র প্রক্রিয়া ও (৯) পিথা গোরীয় উপপাদ্য। গ্রন্থখানি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫২ অব্দে সংস্কার করা হয়েছিল গণিতজ্ঞ চ্যাং সাং এর দ্বারা। গ্রন্থকারের উক্তি থেকে যানা যায়, উপরোক্ত নিয়মগুলি খ্রীষ্টপূর্ব ২৭০০ অব্দের কাছাকছি সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে।

গ্রন্থকারের উক্তিটিকে কিন্তু সমালোচকগণ বিশেষ আমল দেন না। তাঁদের ধারণা, অতি প্রাচীনকালে গণিতের কতকগুলো নিয়ম হয়ত আবিষ্কৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন চৈনিক পণ্ডিতের গবেষণা থেকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর দিকে এমন পল্লবিত হতে পেরেছিল।

চীনের আর এক প্রাচীন গণিতজ্ঞের নাম সান-ৎজু। ইনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনিও রচনা করেছিলেন একখানি গণিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি তিনখণ্ডে বিভক্ত। এতে অনির্ণেয় সমীকরণ, ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি এবং পদার্থের ঘনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত দুই গণিত গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত হয়, চীনারা গণিতে ছিল যথেষ্ট অগ্রসর। তবে তাদের আবিষ্কারাবলীর উপর গ্রীক প্রভাব পড়েছিল কিনা জানা যায় না। কারণ, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর দিকে গ্রীকরা গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে অভাবনীয়ভাবে উন্নতি করেছিল।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে সে সময় চীন যে সব দেশকে ছাড়িয়ে উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহন করেছিল তার একাধিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দেরও

আগে চীনা পণ্ডিতগণ গণনার দ্বারা গ্রহণের সময় অনেক আগে থেকে বলে দিতে পারতেন। তাঁরা বছরে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ গ্রহণের সংখ্যাও নির্ধারণ করেছিলেন।

চীনারা প্রথমে ৩০ দিনে মাস ও ৩৬০ দিনে বছর গণনা করলেও খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের দিকে ৩৬৫ দিনে বছর গণনা শুরু করে। ওরা দীর্ঘ বছরেরও কল্পনা করেছিল। গ্রহদের সম্বন্ধে তারা যথেষ্ট জ্ঞানও আহরণ করেছিল। প্রাচীন পুঁথিতে উল্লেখ আছে, চীন সম্রাট চৌন স্যুর রাজত্বকালে (খ্রীঃ পূঃ ২৫১৩-২৪৩৬ অব্দ) বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি—এই পাঁচ গ্রহের আকাশে সমাবেশ হয়েছিল। আধুনিক গণনায় জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৪৯ অব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারী অনুরূপ ঘটনা অর্থাৎ আকাশে উপরোক্ত পাঁচ গ্রহকে দেখার কথাটা মিথ্যা নাও হতে পারে। অতএব অনুমান করা যেতে পারে, সেই প্রাচীনকালেও চীনাদের পাঁচ-পাঁচটি গ্রহ সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল।

চীনাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের আর এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ধূমকেতু সম্বন্ধে এবং নবতারা বা নোভা সম্বন্ধে তথ্য আহরণ। পর্যবেক্ষণের দ্বারা কোন কোন ধূমকেতু কত বছর অন্তর সূর্য-সন্নিধানে আসে তার একটা তালিকা নির্মাণ করেছিলেন তৎকালীন চীনা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। ঐ তালিকা পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গবেষণায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

নবতারা বা নোভা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য আহরণ করতে না পারলেও আকাশে যে মাঝে মাঝে অত্যুজ্জ্বল তারা দেখা যায় এবং কিছুকাল পরে তারা যে পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যায় এমন তথ্য তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তারামণ্ডল সম্বন্ধেও তাদের ধারণা ছিল। ওরা আকাশের সমস্ত তারাকে ২৪৮টি তারামণ্ডলে বিভক্ত করেছিল। অনেকের মতে আকাশে রাশিচক্রের কল্পনাও চীনাদের।

ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে প্রথম বৈজ্ঞানিক মতবাদ চীনেই প্রচারিত হয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল ব্রহ্মাণ্ডটা অসীম।

প্রাচীনকালে চীনদেশে আবির্ভূত একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরও নাম পাওয়া গেছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দে আবির্ভূত এই বিজ্ঞানীটির নাম "ল-শ-ন"। এমন কথিত আছে যে, ইনিই প্রথম গ্রহণের নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

চীনের প্রাচীন চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থও বর্তমানের এক বিস্ময়। "নেই চিঙ" নামে যে চিকিৎসা গ্রন্থটি পাওয়া গেছে তার রচয়িতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে সম্রাট হুয়াংতি—যাঁর রাজত্বকাল খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯৮ থেকে ২৫৯৯ অব্দ। হুয়াংতি যদি রচয়িতা হন তাহলে ভারতের বৈদিক যুগের পূর্বে চীনে চিকিৎসাশাস্ত্রের আশ্চর্যজনকভাবে উন্নতি হয়েছিল বলে ধরতে হবে। কিন্তু এমনটি হয়ত সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে উক্ত গ্রন্থটিতে বহু গবেষকের গবেষণা সংযোজিত হয়ে এমন

উন্নতরূপ গ্রহণ করেছিল। এমনকি বহু চৈনিক গবেষকও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর দিকে গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গরূপ পরিগ্রহ করেছে।

"নেই চিঙ" গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে চিকিৎসা সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে আলোচনা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে শারীরস্থানের আলোচনা স্থান লাভ করেছে।

চীনা চিকিৎসাশাস্ত্রে দর্শনশাস্ত্রেরও অবতারণা করা হয়েছে। কল্পনা করা হয়েছে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে ক্ষুদ্র মানবশরীর পর্যন্ত সবাই পঞ্চভূতে গড়া। এগুলি যথাক্রমে কাঠ, আগুন, মৃত্তিকা, ধাতু ও জল। চীনাদের "পাঁচ" সংখ্যাটি বড় প্রিয় ছিল। হয়ত এই কারণে তারা পঞ্চভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ রং, পঞ্চ স্বাদ, পঞ্চ ধাতু, পঞ্চ অঙ্গ ইত্যাদির পরিকল্পনা করেছিল। সে যাই হোক না কেন ওদের চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী শরীরের পঞ্চ অঙ্গ যথা হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা ও বৃক্ক শরীরের পুষ্টিসাধনের কাজ করে থাকে। পাঁচটি প্রধান অঙ্গের আবার পাঁচটি অন্তরযন্ত্র আছে। সেগুলি অন্ত্র, মলাশয়, পিত্তাশয়, বস্তি ও পাকস্থলী।

বর্তমান অ্যানাটমির সঙ্গে যতই বিতর্ক থাকুক না কেন, সেই সুদূর অতীতে যে তারা অনুরূপ ধারণা পোষণ করেছিল তা সত্যই বিস্ময়কর। ওরা রক্তসংবহন সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করেছিল এবং নাড়ীর স্পন্দন দেখে রোগ নিরূপণ করতো। প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে দু'শ ধরনের নাড়ীর বিবরণ আছে। তার মধ্যে ছাব্বিশ প্রকারের নাড়ীকে মৃত্যুর নির্দেশক রূপে স্বীকার করেছে।

চীন চিকিৎসাশাস্ত্রে বসন্ত ও সিফিলিসের উল্লেখ আছে। বসন্তের চিকিৎসায় বলা হয়েছে বসন্তের গুটি থেকে পুঁজ গ্রহণ করে এবং তাকে শুকিয়ে নস্যের মত গ্রহণ করতে। নিঃসন্দেহে উক্ত পদ্ধতি ছিল অনেকটা টিকা জাতীয়। সিফিলিস রোগটিকে বংশানুক্রমিক হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সেকালে চীনদেশে শল্য চিকিৎসারও উদ্ভব হয়েছিল। তবে কালক্রমে এর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়ে যায়।

অপরাপর সভ্যতার মত চীন সভ্যতাও কারিগরি বিদ্যায় কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। তবে কারিগরি বিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলি চীন অনেক পরেই করেছে। যথাস্থানে সে কথা উল্লেখ করা হবে।

চীনাদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য, ওরা ধানের চাষ করতো। মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, মিশর এমনকি ভারতবর্ষেও সেকালের মানুষের ভুক্তাবশেষ রূপে সর্বত্র পাওয়া গেছে গম ও অন্যান্য শস্য। কিন্তু চীনের কোথাও গম পাওয়া যায়নি। সব জায়গায় পাওয়া গেছে ধান ও চাল। তাই ধরে নেওয়া হয়েছে, চীনারা প্রথম ধান চাষ শুরু করেছিল। অনেক পরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হয়ত

ঐ চীনাদের কাছ থেকেই ধানের বীজ সংগ্রহ করেছিল।

চা চাষ ও চা-পান রীতিও প্রথম চীনে প্রচলিত হয়। চীনের বিখ্যাত ধর্মগুরু "লাওৎসে"কে তাঁর শিষ্যরা চা-পানে আপ্যায়িত করেছিলেন—এমন উল্লেখ একাধিক স্থান থেকে লাভ করা যায়।

৫। বৈদিক যুগের ভারতীয় বিজ্ঞান—খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ বা তারও কিছু পূর্বে মধ্য এশিয়া থেকে মধ্য ইওরোপ পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ ভূভাগে একজাতীয় মানুষ বাস করতো। তাদের মুখের ভাষা ছিল একই এবং কৃষি কাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো। পরে তারা লৌহের ব্যবহারও শিখেছিল। তারা দেখতে ছিল গৌরবর্ণ ও সুশ্রী। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। তারপরে বংশবৃদ্ধি এবং তৎজনিত বসবাসের স্থানাভাব হেতু কতকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্য এশিয়া থেকে প্রথমে একটি শাখা এসেছিল ভারতবর্ষে। কালক্রমে একের পর এক এইভাবে আরও কতকগুলি শাখা এখানে প্রবেশ করে। ওরাই আর্যজাতি নামে পরিচিত।

আর্যজাতি যে বহিরাগত—তার প্রমাণ তাদের ভাষা। তাদের মূলভাষা তথা আর্যভাষা বৈদিক সংস্কৃতের অনুরূপ। সেই বৈদিক ভাষা থেকে জন্মলাভ করেছে সংস্কৃত ভাষা। বর্তমানে পণ্ডিতদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী, সংস্কৃত প্রভৃতির মূল একটি মাত্র ভাষা। বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গে সেই মূল ভাষাটির মিল যেন একটু বেশী। অতএব অনুমান করা হয়, এক ভাষাভাষি মানুষ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার জন্য দেশভেদে ও কালভেদে নানা রকম ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

আর্য জাতির মূল শাখাটি প্রথমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। সেই স্থানটি নদীবহুল। আর্যরা আবার নদীকে বলতো সিন্ধু। তাই অঞ্চলটির নাম রেখেছিল সপ্তসিন্ধু প্রদেশ। আর্যদের চেয়ে কিছুটা অনগ্রসর এক জাতি অবশ্য এ অঞ্চলে বাস করতো। আর্যরা তাদের অভিহিত করতো দাস, দস্যু, অনার্য, অসুর ইত্যাদি নামে। কাঁচা মাংস ভক্ষণকারী অসভ্য আদিম মানব-গোষ্ঠীর কোন কোন শাখাকে যে না দেখেছিল এমন নয়। ওরাই হয়ত তাদের কাছে রাক্ষস নামে পরিচিত ছিল। যাই হোক না কেন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে আর্যদের দীর্ঘকাল যুদ্ধ করতে হয়েছিল। শেষে আদি বাসিন্দারা হটে যেতে বাধ্য হয় এবং আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটে।

কারও কারও মতে আর্যরা খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দ বা তারই কাছাকাছি সময় থেকে ভারতে আগমন শুরু করে। এদেশে আসার আগেই তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে

যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। একদিকে কৃষিতে ছিল উন্নত, অপরদিকে তাদের মধ্যে ছিল গণতন্ত্রের প্রভাব। গোষ্ঠীপতি বা রাজা একজন নির্বাচিত হতেন বটে কিন্তু জনসভার মত গ্রহণ না করে রাজা কোন কাজ করতে পারতেন না। সিংহাসনে আরোহণ করেই রাজাকে শপথ গ্রহণ করতে হতো, জীবনে কোনোদিনই তিনি প্রজাদের বিশ্বাস হারাবেন না।

সপ্তসিন্ধুর উপকূলভাগে ফসল ফলতো প্রচুর। দেশে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হলে আর্যরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে মন দেন। গবেষকদের মতে আর্যরা দুটি ধারায় বিজ্ঞানচর্চা করেছিলেন। প্রথম ধারাটি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ধারাটি অব্যাহত ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দ পর্যন্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথম ধারার বিজ্ঞান চর্চার বিশেষ কোন নজির নেই। কেবলমাত্র প্রাচীন সাহিত্যগুলিতে কিছু কিছু উল্লেখ আছে। আর আছে পরবর্তীকালে রচিত সংহিতা গ্রন্থগুলিতে সেকালে রচিত পুস্তকগুলির নাম। পরবর্তী ধারায় রচিত কিছু কিছু পুস্তক অবশ্য পাওয়া গেছে।

আর্যদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য ঋক্ বেদ পাঠ করলে বিজ্ঞানের যে শাখাটির কথা আমাদের সর্বাগ্রে মনে আসে সেটি তাঁদের উন্নত চিকিৎসা শাস্ত্র। সেখানে দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের কথা বলা হয়েছে। এঁরা ভেষজশক্তির প্রয়োগে বার্দ্ধক্য দূর করতে পারতেন, অসমর্থ ও বিকলাঙ্গ অঙ্গকে কর্তন করে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজিত করতেন, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করতেন, এমনকি চক্ষুও অধিরোপণ করতেন। এককালে অনুরূপ উক্তি গালগল্পের মত শোনালেও বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের গৌরবময় যুগে চিন্তা করবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

আর্যরা ঋক, সাম, যজু—এই তিন বেদের পরে চতুর্থ বেদ তথা অথর্ব বেদ রচনা করেন। এই অথর্ব বেদই চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুমহান গ্রন্থ। পরে অথর্ব বেদ থেকে চিকিৎসাবিদ্যাকে পৃথক করা হয় এবং নাম দেওয়া হয় আয়ুর্বেদ। আয়ু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় বলে অনুরূপ নামকরণ হয়েছিল। কালক্রমে এটিকে পঞ্চম বেদ রূপে স্বীকার করা হয়। ভারতের আয়ুর্বেদ সে-যুগের এক বিস্ময়।

অনেকের বিশ্বাস খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে আয়ুর্বেদ রচিত হয়। আট ভাগে বিভক্ত সুবিশাল এই শাস্ত্রটিকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র নামেও অভিহিত করা হয়। সুশ্রুত বলেছেন, একলক্ষ শ্লোককে হাজার অধ্যায়ে বিভক্ত করে স্বয়ং ব্রহ্মা এটি রচনা করেছিলেন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের বিভাগগুলি যথাক্রমে—(১) কায়চিকিৎসা বা উপযুক্ত ভেষজের সাহায্যে রোগ নিরাময় ব্যবস্থা; (২) শল্যচিকিৎসা তথা

পর্যন্তই আর্যরা বিভিন্ন

অস্ত্রোপচারের দ্বারা ক্ষত নিরাময় পদ্ধতি ; (৩) শলাক্য চিকিৎসা বা চক্ষু, [illegible] নাসিকা, কণ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গে অস্ত্রোপচার ও বিকৃত অঙ্গের পুনর্গঠন ; (৪) ভূতবিদ্যা বা মানসিক রোগের চিকিৎসা ; (৫) কৌমার ভৃত্য বা শিশুরোগ চিকিৎসা ; (৬) অগদতন্ত্র বা বিষ চিকিৎসা ; (৭) বাজীকরণ তন্ত্র বা প্রজনন শক্তি বৃদ্ধির চিকিৎসা এবং (৮) রসায়নতন্ত্র বা রাসায়নিক ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসা।

উপরোক্ত বিভাগগুলি নিঃসন্দেহে এক প্রণালীবদ্ধ ও অতি উন্নতমানের চিকিৎসা শাস্ত্রের নিদর্শন। শারীরবিদ্যা সংক্রান্ত যেসব তথ্য সেদিন আহরিত হয়েছিল তার সঙ্গে বর্তমানের কোন বিরোধ নেই। তাছাড়া মানসিক রোগ চিকিৎসার কথাও বলা হয়েছে। আজ থেকে তিনহাজার বছর আগে যখন বিজ্ঞানের কোন শাখাই পুষ্ট হয়নি, যখন মানুষের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ তখন এমন এক আশ্চর্য বিজ্ঞান-গ্রন্থ এক পরম বিস্ময় ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভারতীয় প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্র কোন ব্যক্তি বিশেষের গবেষণার ফল নয় বলেই মনে হয়। সহস্র বছরের সহস্র সহস্র প্রতিভা নিয়োজিত হওয়ার ফলে এমন এক পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা-বিজ্ঞান। আয়ুর্বেদের সঙ্গে বহু চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর নাম জড়িত। যেমন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অশ্বিদয়, ধন্বন্তরি, আত্রেয়, অগ্নিবেশ, সুশ্রুত, চরক, জীবক ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে আত্রেয়, সুশ্রুত, জীবক ও চরক ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এঁরা সবাই আয়ুর্বেদ রচনার দ্বিতীয় ধারার গবেষক। আত্রেয়ের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ। এঁর পুরোনাম আত্রেয় পুর্নবসু। বৌদ্ধযুগের চিকিৎসক আত্রেয় থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইনি ছিলেন তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত একটি আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র রচনা করেছিলেন।

সুশ্রুতের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী। পিতা বিশ্বামিত্র ও গুরু কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি। ইনি সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসক এবং এঁরই রচিত সুশ্রুত সংহিতা বিশ্বের সুমহান গ্রন্থগুলির অন্যতম। সেকালে তো বটেই, উনবিংশ শতাব্দীতেও গ্রন্থখানিকে ইংরাজী, জার্মান প্রভৃতি নানা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। সুশ্রুত সংহিতা আজও এক বিস্ময়।

জীবক বা জীবক কোমারভচ্চ ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক এবং মগধের রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক। জন্ম রাজগৃহে। ইনি ছিলেন অদ্বিতীয় শিশু চিকিৎসক। তাঁর চিকিৎসার খ্যাতি এখনও কিংবদন্তী হয়ে আছে। বৃদ্ধ জীবকতন্ত্র নামে একখানি শিশু-চিকিৎসা গ্রন্থের রচয়িতা।

চরকের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। কেউ বলেন তিনি মহারাজ কণিষ্কের সমসাময়িক ও তাঁর চিকিৎসক। আবার কেউ বলেন তিনি

...পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক এবং বৌদ্ধচরক থেকে আলাদা ব্যক্তি। জন্ম কাশ্মীর বলেই মনে হয়। এঁর প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করা না গেলেও এঁর রচিত চরক-সংহিতা বিশ্বের এক অদ্বিতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র। এককালে পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায় গ্রন্থটিকে অনুবাদ করা হয়েছিল এবং এত সম্মান বোধ হয় পৃথিবীর কোন গ্রন্থের ভাগ্যে জোটেনি।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পর বৈদিক ভারত বিজ্ঞানের অপর যে শাখায় চরম উন্নতি লাভ করেছিল সেটি জ্যোতির্বিজ্ঞান। যেহেতু বৈদিক ভারতের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। তাই বৎসরকে বারমাস ও বিভিন্ন ঋতুতে তারা ভাগ করেছিল। তার উপর বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে আর্যরা যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। তাই ঋতু ও তিথি—এই দুটির উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য চান্দ্র বছর এবং সৌর বছর এই দুয়ের তফাৎ তাঁরা ধরতে পেরেছিলেন।

আকাশের ২৭টি নক্ষত্রপুঞ্জের কল্পনা একমাত্র বৈদিক ভারতেরই। ভারত রাশিচক্রেরও কল্পনা করেছিল। তবে এক্ষেত্রে বিদেশী সমালোচকরা বাহিরের কাছ থেকে ধার করা বলে উল্লেখ করে থাকেন। গ্রহণ গণনার ক্ষেত্রে অনুরূপ মন্তব্য করতেও দেখা যায়।

বৈদিক ভারত সাতটি গ্রহের উল্লেখ করেছে। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি ছাড়া তারা চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রহ মনে করতো। সূর্য ও চন্দ্রের গতিবিধি তারা ভালভাবে জানতো। অয়ন চলনের ব্যাপারটা জানা ছিল বলেও অনেকের বিশ্বাস। গণিতের ক্ষেত্রেও বৈদিক ভারত উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। শূন্যের সাহায্যে বিরাট বিরাট সংখ্যা প্রকাশের রীতি প্রথম ভারতই আবিষ্কার করেছে। অপরাপর দেশের মত ভারতও পাটীগণিতের সন্থুয় সমুত্থান, ত্রৈরাশিক, ঘনমূল, বর্গমূল ইত্যাদি জানতো। বীজগণিতে সমান্তর শ্রেণী, গুণোত্তর শ্রেণী, দ্বিঘাত সমীকরণ প্রভৃতিরও আবিষ্কার করেছিল। সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল জ্যামিতিতে। পিথাগোরাসের বহু পূর্বে সমকোণী ত্রিভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্যটি উদ্ভাবিত হয়েছিল। বৈদিক যুগের কাত্যায়ন, বৌধায়ন প্রভৃতি কয়েকজন শূল্বসূত্রকারের সূত্র গভীর জ্যামিতিজ্ঞানের পরিচয় বহন করছে।

ডিমোক্রিটাসের বহু পূর্বে ভারতীয় ঋষি কণাদ "কণাবাদ" তথা পরমাণুবাদের অবতারণা করেছিলেন—যার সঙ্গে ডালটনের পরমাণুবাদেরও কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শুদ্ধ রসায়নবিজ্ঞানের-চর্চা হয়েছিল। সোমলতা থেকে মদ্য জাতীয় পদার্থ প্রস্তুত করতো। নানারকম রঙ, রঞ্জক পদার্থ, কজ্জলী প্রভৃতি তৈরি করতো এবং তৈরি করতো নানা প্রসাধন দ্রব্য। সেসময় রেশম চাষও হতো বলে অনেকের ধারণা। বস্ত্রবয়নে অসামান্য সাফল্য প্রদর্শন করেছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্তই আর্যরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ করেছিলেন। তারপরে তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চায় ভাটা পড়ে। কিন্তু অনুশীলনের ধারাটি দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল এবং পূর্বের আবিষ্কারগুলি লিপিবদ্ধ করারও চেষ্টা হয়েছিল। তাই পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে কতকগুলি সংহিতা গ্রন্থ। প্রায় পাঁচশ বছর পরে ঐ সংহিতাগুলিকে অবলম্বন করে পুনরায় ভারতের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আসে মহাপ্লাবন। সে আর এক অধ্যায়।

৬। **ফিনিশিয়দের বিজ্ঞান**—পাশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগরের তীরে সিরীয় উপকূলে ফিনিশিয়া নামে একটি ছোট্ট দেশ ছিল। সেখানকার অধিবাসীদের ফিনিশিয়ান নামে অভিহিত করা হতো। দেশটি দীর্ঘকাল ধরে মিশরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দে ওরা স্বাধীনতা অর্জন করে। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত তাদের একটানা গৌরবময় যুগ চলেছিল।

ফিনিশিয়রা নৌ-বিজ্ঞানেই অধিক উন্নতিলাভ করেছিল। তারা সমুদ্র যাত্রার জন্য যে সব জাহাজ নির্মাণ করতো তার এক একটির দৈর্ঘ্য ছিল আশি থেকে একশ' ফুট পর্যন্ত। জাহাজের সামনে লাগানো থাকতো একরকম ধ্বসন যন্ত্র। প্রয়োজন হলে ঐ ধ্বসন যন্ত্রের সাহায্যে কোন নৌকা বা জাহাজকে মুহূর্তের মধ্যেই সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করতে পারতো। ব্যবসাবাণিজ্যে ওরা ছিল একেবারে পাকা এবং জলদস্যুতায় সে যুগে ওদের জুড়ি কেউ ছিল না। সুদূর বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে তারা টিন আনতো। আফ্রিকার উত্তরে কার্থেজ বন্দর ছিল ওদের পশ্চিমের বাণিজ্যকেন্দ্র। আরও আশ্চর্যের কথা, ভাস্কোডা-গামার প্রায় দু হাজার বছর আগে ওরা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর অগ্রসর হয়েছিল এবং বর্তমানের "কেপ অফ্ গুড হোপ" তথা উত্তমাশা অন্তরীপে উপস্থিত হয়েছিল।

ফিনিশিয়রা ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসী নাবিক এবং প্রকৃতিতে ছিল অতীব নিষ্ঠুর। তারা বহু জায়গায় যাতায়াত করতো এবং বিদেশীদের ধরে এনে ক্রীতদাস করে রাখতো কিংবা বাজারে বিক্রি করতো। হত্যা ও লুণ্ঠনে ওদের জুড়ি কেউ ছিল না। তবু বিজ্ঞান এবং পরবর্তীকালের ইওরোপীয় সভ্যতা ওদের কাছে অনেকখানি ঋণী। ওরা মিশরীয় বর্ণমালা থেকে বাইশটি অক্ষর নিয়ে এক উন্নত ধরণের বর্ণমালা রচনা করেছিল। সেই বর্ণমালাই গ্রীক ও রোমান বর্ণমালার ভিত্তি। তাদের জাহাজ নির্মাণ কৌশল ও ধ্বসন যন্ত্রকে অনুকরণ করেছিল পাশ্চাত্যের গ্রীস ও রোম।

আকাশের নক্ষত্র দেখে দিক্ নির্ণয় পদ্ধতি ফিনিশিয়দের আবিষ্কার। ধাতু

শিল্পে ও রাসায়নিক শিল্পে সে আমলে ওদের চেয়ে উন্নত কেউ ছিল না বললেও চলে। তারা আফ্রিকা থেকে বহে আনতো উটপাখীর পালক, হাতির দাঁত এবং পেরিরাস। স্পেন থেকে আনতো রূপা এবং গ্রেটব্রিটেন থেকে আনতো টিন। দেশকে একেবারে শিল্পে ভরিয়ে ফেলেছিল তারা। তারা মদ তৈরির কৌশল জানতো, তৈলবীজ থেকে তেল নিষ্কাশন করতো, মিহি পশমীবস্ত্র বয়ন করতো, সুতীবস্ত্রকে নানা রঙে রঞ্জিত করতো। এমনই আরও কত কি! তারা এক ধরণের লাল রঙ তৈরি করতো—যার চাহিদা ছিল বিদেশে প্রচুর। এ ছাড়াও তারা তৈরি করতো কাচ, চীনামাটি ও রূপার সুদৃশ্য পানপাত্র। কথিত আছে, ওরা লোহিত সাগর দিয়ে ভারতেও বাণিজ্য করতে আসতো।

প্রকৃতপক্ষে ফিনিশিয়রাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাতায়াতের জলপথটি সেই দিনই আবিষ্কার করেছিল। তাদের উন্নত কারিগরিবিদ্যা ও শিল্প গ্রীকদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল এবং সে প্রভাব হয়েছে সুদূর প্রসারী। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফিনিশিয়া পারস্যের অধীন হয়ে পড়ায় তাদের গৌরবসূর্য অস্তমিত হয়।

৭। **ক্রীটীয়সভ্যতার বিজ্ঞান**—অধুনা আবিষ্কৃত হয়েছে ভূমধ্যসাগরে ক্রীটদ্বীপ এবং তার আশেপাশের জায়গাগুলিকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকালে আর একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। খনন কারে ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে বহু নিদর্শন। সেই থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, উক্ত সভ্যতাটিও তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা। মিশরের প্রায় সমসাময়িক কালে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে সভ্যতাটি বিকাশ লাভ করেছিল। সুমেরীয় সভ্যতা ও মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে উক্ত সভ্যতার যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সভ্যতাটি ক্রীটের ঈজিয়ান সভ্যতা নামে পরিচিত। সভ্যতাটির নামকরণের কারণ, ঈজিয়ান সাগরে দ্বীপগুলিকে ঘিরে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। গ্রীকদের উত্থানের যুগে সভ্যতাটি গ্রীকদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রাচীন বিজ্ঞানের অবনতি এবং তার কারণ

বিজ্ঞান জন্মলাভ করেছিল প্রাচ্যভূখণ্ডে—মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, মিশর, চীন ও ভারতবর্ষে। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন যন্ত্র ও কারিগরি বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের মূল্যবান শাখাগুলির কেবলমাত্র উদ্ভব হয়নি, প্রত্যেকটি শাখা যথেষ্ট পুষ্টও হয়ে উঠেছিল। আর তাদের ঐ বিজ্ঞান উন্নতিলাভ

করার জন্যই তাদের মধ্যে সুখ-সমৃদ্ধির বন্যা এসেছিল এবং বিজ্ঞানের বলেই প্রতিষ্ঠা করেছিল সুসভ্য নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, একমাত্র চীন সভ্যতা ছাড়া আর কোন সভ্যতা দীর্ঘকাল ধরে টিঁকে থাকতে পারেনি। তবে ভারতীয় বিজ্ঞান সে সময় হোঁচট খেয়ে পড়লেও অনুশীলনের কাজটা যৎকিঞ্চিৎ বজায় ছিল। ফলে কয়েকশ বছরের ব্যবধানে পুনরায় জাগরণ এসেছিল তার। কিন্তু মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতির জাগরণ আসেনি। আবার ভারতেরও জাগরণ দীর্ঘকাল অটুট ছিল না।

প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলির আত্মতৃপ্তির মনোভাব তাদের ধ্বংসের মূল কারণ। নিজেদের আবিষ্কারগুলিকে নিয়ে তারা ব্যস্ত ছিল। ভেবে নিয়েছিল, যা তারা আবিষ্কার করেছে, তার উপরে আর কিছু থাকতে পারে না। নিজেদের আবিষ্কার-গুলিকে নিয়ে আরও গবেষণা করার মনোভাব যেমন হারিয়েছিল তেমনই বাহিরে কোথায় নতুন কিছু আবিষ্কার হচ্ছে কিনা সে খবরও বড় একটা রাখতো না। তাই বিজ্ঞানে বলীয়ান মুষ্টিমেয় কোন জাতি কিংবা উপজাতির হাতে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে তারা। যেমন উন্নত ব্যাবিলনীয়রা ধ্বংস করেছিল সুমেরীয় সভ্যতাকে এবং দীর্ঘকাল পরে ঐ ব্যাবিলনীয়রা আবার ধ্বংস হয়েছিল আসিরিয়দের হাতে। অপরদিকে লৌহ নির্মিত অস্ত্র, রথ ইত্যাদি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার করে পারসিকরা ধ্বংস করেছিল মিশরকে এবং আর্যরা ধ্বংস করেছিল সিন্ধু সভ্যতাকে। মিশরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ও ফিনিসিয় সভ্যতা কোন রকমে টিকে ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত। তারপর হারিয়ে গেছে চিরতরে। বর্তমানে সেই সভ্যতাগুলি গবেষকদের গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে আর্য সভ্যতার ক্ষেত্রেও নেমে আসে অন্ধকার এবং উক্ত সভ্যতাও আজকের গবেষণার বিষয়।

সভ্যতাগুলি এবং তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবনতির মূলে বহু কারণ বিদ্যমান। মানুষ যখন প্রথম নদীর তীরগুলিতে বসবাস শুরু করেছিল তখন তারা ছিল দলবদ্ধ এবং একটা সমাজ ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল। সেই সমাজে সব মানুষের ছিল সমান অধিকার। সেদিনের মানুষ যা কিছু করতো, সবই দলগত স্বার্থে। ব্যক্তি স্বার্থ আদৌ ছিল না। যে কোন আবিষ্কার দলের সম্পদরূপে বিবেচিত হতো এবং দলের প্রতিটি মানুষের প্রতিভাকে কাজে লাগানো হতো। কিন্তু এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারেনি।

প্রথম প্রথম মানুষ দলবদ্ধ হয়ে চাষবাস করতো। চাষের জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। সমবেতভাবে যে ফসল তারা উৎপন্ন করতো তাকেই তারা সবাই আহার্যরূপে গ্রহণ করতো। জনসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু মানুষের মনে এলো

জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা সম্বন্ধে ধারণা। যারা বুদ্ধিমান তারা ছলে, বলে ও কৌশলে দখল করলো প্রচুর জমি। আর তারই ফলে কয়েক পুরুষের মধ্যে দেখা দিল শ্রেণী বৈষম্য। যাদের অধীনে বেশী জমি থাকলো তারা লোকজনকে খাটিয়ে প্রচুর শস্য উৎপাদন করে মজুত রাখলো আর যাদের জমিজমা কম ছিল অথবা আদৌ ছিল না তারা মহাজনের জমি ভাগে চাষ আরম্ভ করলো অথবা জনমজুরী খাটতে লাগলো। এইভাবে সমানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো দুটি সম্প্রদায়—ধনী ও গরীব।

শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে মানুষের চাহিদা ছিল ন্যূনতম এবং প্রত্যেকের মধ্যে ছিল ভাই-ভাই সম্পর্ক। সবাই চাহিদা পূরণ করতো একমাত্র মেহনতের দ্বারা। এবার বিনা মেহনতেই এক শ্রেণীর হাতে জমে উঠলো প্রচুর সম্পদ। সম্পদ থেকে লোভের সূচনা। বুদ্ধিবলে এবং সম্পদের লোভ দেখিয়ে আরও ভূমিকে তারা গ্রাস করে নিতে থাকলো। ধীরে ধীরে ভূমিহীনদের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলো এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন সম্পদের পাহাড় রচনা করলো।

সম্পদ লাভ করায় তাদের মধ্যে আরও একটি উপসর্গ দেখা গেল। সেটি কর্তৃত্ব করার লোভ। আগে দলকে পরিচালিত করতো দলের বয়োজ্যেষ্ঠ ও বহুদর্শী দলপতিরা। এখন যাদেরই হাতে সম্পদ জমা হলো তারাই হয়ে উঠলো ক্ষমতালিপ্সু। পাতার কুঁড়ের পরিবর্তে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো প্রাসাদ। সৃষ্টি হলো রাজপদ। শুরু হলো ডাকাতি, হানাহানি, রক্তারক্তি, লুঠতরাজ এবং নিষ্ঠুরতার রাজনীতি। আর ঠিক তখনই সমাজের বুকে দেখা দিল মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা—নিষ্ঠুর ক্রীতদাস ও ভূমিদাস প্রথা। প্রকৃতপক্ষে সেইদিনই বিজ্ঞানের ঘটলো অপমৃত্যু। ব্যাবিলন, মিশর, ভারত প্রায় সব দেশেই একই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল সেই জঘন্য ও নিষ্ঠুর প্রথা। পরের দিকে পাশ্চাত্যে গ্রীক ও রোমানদের যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তারও মূলে ছিল ঐ ক্রীতদাসেরা।

প্রধানত যুদ্ধ বন্দীদেরই ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে হতো। অপরপক্ষে লুণ্ঠনকারীরা ধনরত্নসহ বহু নরনারীকেও জোর করে ধরে নিয়ে আসতো এবং গরু-ছাগলের মত বাজারে বাজারে বিক্রী করতো। যাদের লোকের দরকার হতো তারা মূল্য দিয়ে কিনে আনতো এবং কেবলমাত্র প্রাণটা যাতে থাকে তার জন্য যতটুকু পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন কেবল ততটুকুই দিতো এবং রাতদিন যথেচ্ছভাবে খাটিয়ে নিতো। অত্যাচারও করতো প্রচণ্ডভাবে। সেকালের সেই যে বিশাল বিশাল ইমারত, ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান, মিশরের পিরামিড, প্রভৃতি সবকিছুর মূলে ছিল ক্রীতদাসদের অবদান। এমনকি ভারতের মহান আর্য-

সভ্যতার মূলেও ছিল ক্রীতদাস প্রথা।

ক্রীতদাস প্রথা যতই জোরদার হলো, ততই কারিগরি বিদ্যাটা ঐ ক্রীতদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়লো। অবহেলিত ক্রীতদাসের সঙ্গে তাদের কারিগরি কৌশলও অভিজাতরা ঘৃণার চোখে দেখলেন এবং উপেক্ষা করলেন। সেই বিদ্যা লিখে রাখার প্রয়োজন অনুভব করলেন না কেউই। অপরপক্ষে দেশের সাধারণ মানুষের কারিগরি দক্ষতাও হলো অবহেলিত। ফলে কয়েকশ' বছরের ব্যবধানে বেশ কিছু জিনিস হারিয়ে গেল এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনের চিন্তাও হলো ব্যাহত।

ধর্মের গোঁড়ামিও বিজ্ঞান-চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। মানুষ প্রথম যেদিন চোখ মেলে তাকিয়েছিল প্রকৃতির পানে—সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল ঝড়বৃষ্টি, আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, খরা-বন্যা প্রভৃতি প্রকৃতির ভয়াল রূপগুলিকে। আরও লক্ষ্য করেছিল, আকাশে সূর্য জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির ঘুম ভাঙ্গে, রাতে চাঁদের কিরণ অমৃত বর্ষণ করে, কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে দীপ্তিমান সূর্য ও চন্দ্র কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কালো যবনিকার আড়ালে মুখ ঢাকে, কড় কড় শব্দে বাজ পড়ে, কালো মেঘের আড়ালে বিদ্যুৎ চমকায়, পাহাড়ে পাহাড়ে অথবা বনে বনে আগুন জ্বলে উঠে, ইত্যাদি কত সহস্র ঘটনা! এইসব দেখে শুনে প্রথমে তাদের মনে ভয় এসেছিল এবং পরে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কল্পনা করেছিল। জীবের জন্ম-মৃত্যুর কথাও তাদের ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই জ্ঞানোন্মেষের প্রথম পর্বেই তাদের মনে দুটি চিন্তা পাশাপাশি অবস্থান করতে শুরু করে। একটি চিন্তা প্রকৃতি সংক্রান্ত এবং অপরটি বেঁচে থাকার চিন্তা। ঐ বেঁচে থাকার চিন্তা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে বিজ্ঞান এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়েই স্থান লাভ করেছে ঈশ্বরচিন্তা।

প্রথম প্রথম ঐ দুই চিন্তার মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। ধর্ম চিন্তার দ্বারা মনকে করতো কলুষমুক্ত এবং বিজ্ঞান চিন্তার দ্বারা আহরণ করেছিল সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু দেশে দেশে অভিজাত ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের ফলে দুই চিন্তার মধ্যে দেখা দিল সংঘর্ষ।

পুরোহিত সম্প্রদায়ই কালক্রমে হয়ে উঠেছিলেন দেশের সবচেয়ে অভিজাত সম্প্রদায় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, দেশে কারিগরি বিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রসার ঘটলে সাধারণ মানুষের হাতে জমে উঠবে সম্পদ। কারণ গতর খাটাতে অভ্যস্ত ছিল ঐ সাধারণ মানুষই। অভিজাতরা কর্মবিমুখ ও বিলাসী। সাধারণের হাতে সম্পদ এলে অভিজাতদের আভিজাত্য নষ্ট হবে এবং ভবিষ্যতে গতর খাটাতে হবে। তাই স্বার্থপর পুরোহিত সম্প্রদায়

মানুষকে বোঝালেন, তাঁরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাঁদের অবহেলা করার অর্থ ঈশ্বরের অবমাননা। তাঁরা আরও জানালেন, ঈশ্বরের করুণায় সূর্য-চন্দ্র আলো দেয়, মাঠে মাঠে ফসল ফলে, বৃষ্টিপাত ঘটে, নদী প্রবাহিত হয় ইত্যাদি। আর ঈশ্বর রুষ্ট হলেই নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে। অতএব পৃথিবীতে একমাত্র ঈশ্বর সত্য, আর সব কিছুই মিথ্যা।

পুরোহিত সম্প্রদায় এই সব বাঁধা বুলিগুলি আবৃত্তি করে সন্তুষ্ট হলেন না, বংশ বংশ ধরে সুখসুবিধাগুলি যাতে ভোগ করতে পারে তার জন্য রচনা করলেন ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশক নানা কাল্পনিক কাহিনী এবং নানা প্রকার বিধিনিষেধ। তাঁদের সে কাহিনীগুলি যদিও ছিল সম্পূর্ণ অবাস্তব তবুও যেহেতু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করছে, তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন সন্দেহের উদ্রেক হলো না। বরং কাল যতই গড়িয়ে যেতে লাগলো ততই সংস্কারে পরিণত হলো।

বেশ কয়েক পুরুষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর শুরু হলো ধর্মের নামে গোঁড়ামি। কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে আর ভালভাবে গবেষণা হলো না। কেবল রচিত হলো রাশি রাশি সামাজিক অনুশাসন। প্রাচীন আবিষ্কারগুলির মধ্যে যা লিপিবদ্ধ হয়েছিল তাতেও ঈশ্বরের মহিমাকে যুক্ত করে পুনর্লিখিত হলো। জানানো হলো, প্রাচীন আবিষ্কারগুলি সত্যদ্রষ্টাদের দ্বারা লিখিত অথবা ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী। অতএব এর পরে আর কিছু হতে পারে না এবং যা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত। কোথাও কোথাও "অপৌরুষেয়" আখ্যাও প্রদান করা হলো। অপর পক্ষে সাধারণ মানুষ যাতে বিদ্রোহী না হয়ে উঠতে পারে তার জন্য অদৃষ্টকে স্বীকার করতে নানা প্রকার ছলাকলারও আশ্রয় গ্রহণ করা হলো। মানুষের বিশ্বাস হলো, পূর্বজন্মের কৃতকার্যের ফলে বর্তমান জন্মে কোন মানুষ ক্রীতদাস, কেউ বা রাজা। জন্ম জন্মান্তরের ঈশ্বর বিশ্বাস এবং সুকৃতির ফলে ইহজন্মে মানুষের কপালে সুখ আসে। যারাই অভিজাত বংশে জন্ম গ্রহণ করে তারা শত শত জন্মের পুণ্যার্জনের ফলে। কাল্পনিক পরজন্ম এমন লোভনীয় হয়ে উঠলো যে, মানুষ সম্পূর্ণরূপে ইহবিমুখ হয়ে উঠলো। পরকাল সর্বস্ব চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে রাজাও পুরোহিতের সম্পূর্ণরূপে বশবর্তী হয়ে পড়লো। পার্থিব স্থূলবস্তু সম্বন্ধে তথা বিজ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তা পরিত্যক্ত হয়ে দার্শনিক চিন্তাধারার দিকে আকৃষ্ট হলো আপামর জনসাধারণ।

বিজ্ঞানের চিরন্তন এক বৈশিষ্ট্য আছে। সংস্কার ও কোনরকম গোঁড়ামি সমাজের বুকে চেপে বসলে, সর্বস্তরের মানুষের প্রতিভার বিকাশ ঘটতে অসমর্থ হলে এবং দেশের স্থায়ী শান্তি বিরাজ না করলে সে বিদায় গ্রহণ করে। দেশের

গণতন্ত্র যখন বিপন্ন হলো, সম্পদের জন্য হনাহানি শুরু হলো, মানুষের মধ্যে যখন বিভেদ রচিত হলো এবং মানুষ নানা সংস্কারের বশবর্তী হয়ে উঠলো তখনই হারিয়ে গেল বিজ্ঞান-চর্চার পরিবেশ। সেই সঙ্গে হারিয়ে গেল সহস্র সহস্র বছরের সাধনায় লব্ধ তার উন্নত রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসা বিদ্যা, রঞ্জন বিদ্যা, যন্ত্র বিদ্যা প্রভৃতি প্রায় সব কিছুই। কেবল মাত্র টিকে থাকলো ধনীর বিলাসোপকরণ ও অস্ত্র নির্মাণের কৌশলগুলি। অবশ্য দুটিরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা এবং পুরোহিত সম্প্রদায়—উভয়েই।

গ্রীকদের বিজ্ঞান

(খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী)

গ্রীক-বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও অগ্রগতি ঃ—পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বিজ্ঞানের জন্ম প্রাচ্য ভূখণ্ডে। প্রায় দু-হাজার বছর ধরে প্রাচ্যের ব্যাবিলন, মিশর ও ভারবর্ষে বিজ্ঞানের চলেছিল অনুশীলন। তারপর প্রাচ্য ভূখণ্ডের মানুষ আপন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীকে যখন বিকৃত করলো, স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে যখন মনুষ্যত্বের করলো অবমাননা এবং নানারকম সংস্কারের বশবর্তী হয়ে ধর্মের নামে কেবল ভণ্ডামীকে অবলম্বন করলো তখনই প্রাচ্য থেকে এক রকম মুছে গেল বিজ্ঞান।

আরও সত্য যে, বিজ্ঞানে মানুষ সে আমলে যতখানি উন্নতি করেছিল তার অধিকাংশের সূচনা হয়েছিল নব্য প্রস্তর যুগে। হাজার হাজার বছর অনুশীলনের ফলেও বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকটার কোন উন্নতি হয়নি বলা চলে। কেবল ব্যবহারিক দিকটার প্রতি এতকাল যাবৎ গুরুত্ব আরোপ করে আসছিল। উদাহরণস্বরূপ মিশরে জ্যামিতির উদ্ভব হলেও সে জ্যামিতি ছিল পরিমিতির নামান্তর। তিন বা ততোধিক সরলরেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকেই বিচার করা হতো, কিন্তু ঐ রেখার বৈশিষ্ট্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না। ব্যাবিলন হাজার হাজার বছর ধরে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে আসছিল। লক্ষ্য করেছিল গ্রহদের গতিবিধি, নানাপ্রকার তারামণ্ডল ইত্যাদি। কিন্তু মহাকাশের রহস্য ভেদ করতে যত্নবান হয়নি। সিন্ধু সভ্যতায় দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা ইত্যাদি অনেক পাওয়া গেছে। ব্যবহারিক জ্ঞান অনুযায়ী আলম্ব থেকে তুলাদণ্ডের দু-পাশের দূরত্ব সমান থাকলেও বেশী কম হলে কতটুকু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেনি। তাছাড়া সে আমলে কোন জাতিই বিজ্ঞানকে

প্রণালীবদ্ধ ভাবে আলোচনা করতে যত্নবান হয়নি। এককথায় প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করেনি কেউ এবং কেবলমাত্র ব্যবহারিক দিক নয়, বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকটাও যে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—এ চিন্তাটা যেন কারও মাথায় স্থান পায়নি।

গ্রীকদের বৈশিষ্ট্য, তাঁরা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটা যেমন লক্ষ্য করেছেন তেমনই লক্ষ্য করেছেন তার তাত্ত্বিক দিকটাও। যার ফলে প্রথম প্রণালীবদ্ধ বিজ্ঞান এসেছে ঐ গ্রীকদের হাত থেকেই। অনেকের মতে প্রকৃত বিজ্ঞান বলতে আজকের দিনে আমরা যা বুঝি তার প্রকৃত রূপকার গ্রীকরা। কথাটাতে কিছুটা অতিশয়োক্তি থাকলেও সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা যায় না। গ্রীকদের আরও বৈশিষ্ট্য, বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখারই গোড়াপত্তন করে গেছেন তাঁরা। উক্ত কারণে বিজ্ঞানে গ্রীকদের অবদান মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

এখন প্রশ্ন, ঐ গ্রীকরা কারা? কেমন করেই বা তারা হঠাৎ সহস্র সূর্যের দীপ্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল? আর কেমন করেই বা হারিয়ে গেল তারা?

উনবিংশ শতাব্দীর একরকম শেষভাগ পর্যন্ত গ্রীকদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। সামান্য তথ্যমাত্র লাভ হয়েছিল প্রখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডাটাসের লেখা ইতিহাস এবং মহাকবি হোমার রচিত পৌরাণিক কাহিনী থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম অষ্টম দশকে তুজন জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক শ্লীম্যান ও ডফ্‌ফেলড মিকেনাই, মিসিন, ট্রয় প্রভৃতি অঞ্চলে খনন কার্য চালান। ফলে আবিষ্কৃত হয় বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্যার আর্থার ইভান্সের নেতৃত্বে ক্রীটে নোসস্ নামক একটি স্থান থেকে উদ্ধার করা হয় কিছু কিছু নিদর্শন। উক্ত নিদর্শনগুলি থেকে গবেষকরা প্রমাণ করেছেন, গ্রীক সভ্যতা ও সুপ্রাচীন সভ্যতা। মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে যেমন ক্রীট সভ্যতার অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় তেমনই ক্রীট সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার মিল বহুলাংশে পরিলক্ষিত হয়। তাই মনে করা হচ্ছে, এই সভ্যতা ব্রোঞ্জযুগে গঠিত হয়েছিল এবং প্রভাব পড়েছিল মিশর ও ক্রীটের।

মিসিনে এবং ট্রয়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে খনন কার্য চালিয়ে ট্রোজন যুদ্ধের বহু নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নিদর্শনগুলি প্রমাণ করেছে মহাকবি হোমারের কাহিনী অনৈতিহাসিক নয়। মহাকবি নিজেই উল্লেখ করেছেন গ্রীসে ব্রোঞ্জযুগের উন্নত সভ্যতা। তিনি যে অ্যাকিয়ানদের কথা বলেছেন, তারা ছিল বহিরাগত। ওরা লোহার ব্যবহার জানতো। ফলে ওদেরই হাতে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের দিকে গ্রীসের ব্রোঞ্জ সভ্যতার ধ্বংস হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে গ্রীকভাষী

অ্যাকিয়ানরা। অনেকের মতে ঐ অ্যাকিয়ানরা এসেছিল দানিয়ুব নদীর উপত্যকা থেকে এবং আকৃতিতে ছিল দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ ও সুদর্শন।

ঐ অ্যাকিয়ানরা আবার পরাজয় স্বীকার করে দোরীয় নামক বহিরাগত এক উপজাতির কাছে। দোরীয়রাও লোহার ব্যবহার জানতো। এদের উন্নত অস্ত্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল অ্যাকিয়ানরা। দোরীয়দের পরেও এসেছিল নানা জাতি। মোট কথা, এখানকার আদিম অধিবাসী। অ্যাকিয়ান, দোরীয় এবং আরও বহু জাতির সংমিশ্রণে কালক্রমে গঠিত হয়েছে গ্রীক জাতিটা। আর ওদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। ওদের রাজনৈতিক ইতিহাস কিন্তু সুদীর্ঘ নয়। নানা বৈদেশিক আক্রমণে বিপর্যস্ত হতে হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৯০০ অব্দ পর্যন্ত। স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হতে লেগেছিল আরও কয়েক শতাব্দী। তরাপরেই অনুকূল পরিবেশ লাভ করায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। সেও মাত্র কয়েকশ' বছর। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে পুনরায় শুরু হয় বৈদেশিক আক্রমণ। আর তখন থেকেই গ্রীসের আকাশে অন্ধকার ঘণীভূত হতে থাকে।

গ্রীকদের উন্নতির মূলে বিশেষ কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন তাদের করতে হয়নি। একদিকে বিজ্ঞানের উন্নত বহু বহিরাগত জাতির সমাবেশ ঘটেছিল এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দের কিছু পূর্ব থেকে তারা বাণিজ্যের জন্য বিদেশে যাতায়াত শুরু করেছিল। এদিক থেকে ফিনিশিয়দের কাছ থেকে তারা লাভ করেছিল অনুপ্রেরণা। তবে ফিনিশিয়দের মত নিষ্ঠুর বা লুণ্ঠন পিপাসু ওরা ছিল না। কেবলমাত্র বাণিজ্যের কারণেই যাত্রা করতো।

গ্রীকরা নিকটবর্তী ক্রীট ও মিশর তো বটেই মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, এমনকি ভারতবর্ষেও আসতো। ওদের ছিল প্রবল অনুসন্ধিৎসা। একদিকে বিভিন্ন দেশের জনজীবনের সঙ্গে যেমন পরিচিত হতো অপরদিকে তেমনই যেখানে যত নতুন আবিষ্কার দেখতো তাকে আয়ত্ব করতে চেষ্টা করতো। উদাহরণ স্বরূপ থেল্‌স ও পিথাগোরাসের কথা ধরা যেতে পারে। এঁদের উভয়েরই মাতা গ্রীক কিন্তু পিতা ছিলেন ফিনিশিয়দের বংশধর এবং উভয়েই প্রথম জীবনে ছিলেন বণিক। বাণিজ্যের কারণে থেল্‌স মিশরে গমন করলে সেখানকার উন্নত জ্যামিতি তাঁর দৃষ্টিগোচরে আসে। ফলে জ্যামিতি সম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞানলাভের আশায় তিনি বেশ কিছুকাল মিশরে অবস্থান করেন। পরে তিনি মেসোপটেমিয়ায় গিয়ে সেখানকার উন্নত জ্যোতির্বিদ্যাও আয়ত্ত করেন। অপরপক্ষে পিথাগোরাসও একাধারে ছিলেন জ্ঞানপিপাসু ও বণিক। তৎকালীন সভ্যদেশগুলির উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার জন্য বহুকাল নানা জায়গায় অবস্থান করেছিলেন।

সম্ভবও তিনি ভারতেও এসেছিলেন এবং বৈদিক ভাষা শিক্ষালাভ করার পর ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করেছিলেন। মোট কথা, গ্রীকরা নিজের দেশের আবিষ্কারগুলিকে নিয়ে তৃপ্ত ছিলেন না। অপর দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানটা প্রত্যক্ষ করার জন্য দেশভ্রমণ করেছিলেন। আর যেখানে যত মূলবান তথ্য পেয়েছেন সেগুলিকে আত্মসাৎ করেছেন। বিজ্ঞানের নিয়মও তাই। সে দেশ ও কাল নিরপেক্ষ। সামান্য উপকরণকে অবলম্বন করে সাতমহলা বিরাট অট্টালিকা তৈরি হতে পারে।

সেকালে গ্রীকরা যে বিভিন্ন সভ্যদেশগুলির কাছ থেকে বিজ্ঞানের বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তার উল্লেখ একাধিক গ্রন্থে দেখা যায়। গ্রীকপণ্ডিতরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাবিলনের ঋণ এবং জ্যামিতির ক্ষেত্রে মিশরের ঋণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে গেছেন।

দ্বিতীয়তঃ সে সময়ে গ্রীসে বহু চিন্তানায়কের আবির্ভাব গ্রীক সভ্যতা বিকাশের আর একটি কারণ। থেল্‌স, পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেতো, অ্যারিস্তোতল, আর্কিমিদিস প্রভৃতি পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাগুলির মধ্যে অন্যতম। অবশ্য সর্বস্তরের প্রতিভা বিকাশের সুবিধা ছিল। গ্রীস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকলেও গণতান্ত্রিক আদর্শে রাজ্য পরিচালিত হতো। সব মানুষের ছিল সমান অধিকার। শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক এবং নব নব আবিষ্কারের জন্য উৎসাহদানের ব্যবস্থা ছিল। সর্বস্তরের মানুষের মর্যাদা সমান হওয়ায় এবং ক্ষুদ্রই হোক আর বৃহৎই হোক সব আবিষ্কারের স্বীকৃতি থাকায় গ্রীসে এত প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছিল।

প্রতিভা বিকাশের আরও কারণ ছিল। সেখানে কঠোর রাজতন্ত্র কিংবা পুরোহিতবর্গের কঠোর অনুশাসনও প্রচলিত ছিল না। সর্বস্তরের মানুষের মর্যাদা যেমন সমান ছিল তেমনই ছিল মানবিকতাবোধ। কোনরূপ সংস্কার তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। দৈব অপেক্ষা পুরুষকারের ছিল প্রাধান্য। মহাকবি হোমারের মহাকাব্যদ্বয় ইলিয়াড এবং ওডেসিতেও সে সুর স্পষ্ট। মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকারা আপন অদৃষ্টকে স্বীকার করেন নি। নিজের ভাগ্য নিজের হাতে গড়তে চেষ্টা করেছেন। কোন ক্ষেত্রে ভাগ্যের কাছে মাথা নত করেন নি তাঁরা। সেখানে দেব-দেবীরও কল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের দেবদেবী সর্বশক্তিমান ছিলেন না। মানুষের মত দোষগুণ উভয়ই গ্রীক দেবদেবীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সেখানকার দেবদেবী কাঁদতেন মানুষের জন্য আবার দেবতার দুঃখে মানুষও কাঁদতো। কোন দেবতা অপরাপর দেশে কল্পিত দেবতার মত মানুষের ব্যক্তিস্বতন্ত্র হরণ করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হতেন না। অপরদিকে

পুরোহিত সম্প্রদায়ের লেখা গ্রন্থকে অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরের বাণীরূপে আখ্যা দান করে মানুষের পৌরুষত্বকে খর্ব করা হয়নি। মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ এবং ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষত্বকে প্রকাশ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় গ্রীক সভ্যতা আজ বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে।

তৃতীয়ত সুষ্ঠুভাবে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কারও গ্রীকদের অগ্রগতির আর এক কারণ। গ্রীক পণ্ডিতেরা যা আবিষ্কার করতেন এবং বিদেশ থেকে যে সব তত্ত্ব আহরণ করতেন সেগুলিকে লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন। তাই পরবর্তীকালে আবির্ভূত চিন্তানায়কদের গবেষণায় প্রবৃত্ত হতে কোন অসুবিধা হয়নি।

গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে পণ্ডিতেরা মনে করেন সে এক সর্বব্যাপী অনুসন্ধিৎসা, সত্যনিষ্ঠা এবং বিচার বুদ্ধির চরম বিকাশ। তারই উপর ভিত্তি করে কাব্য, নাটক, শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞানে অতি উন্নতমানের সাফল্য। এগুলির সবই যে গ্রীসের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রথমভাগে উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল সে কথা মহাকবি হোমারের মহাকাব্যদ্বয় থেকে জানা যায়। বহু পণ্ডিতের মতে প্রথম দিকের এই সভ্যতা অপরাপর দেশের তুলনায় নিকৃষ্ট হলেও একমাত্র মানবত্ববোধ ও ধর্মনীতির শাসনের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেছিল। তবে ধর্মনীতি বলতে এখানে কতকগুলি গোঁড়ামি এবং সংস্কারের সমাবেশ নয়। যা মানুষের মহত্বকে বিকাশ করে, নিজের উপর আস্থা-স্থাপনে যত্নবান করে, সর্বশ্রেণীর মানুষকে আপন করে নিতে পারে, তাই-ই ছিল ধর্মজ্ঞান। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ মাসিদনের রাজা ফিলিপের অভ্যুত্থানের যুগ পর্যন্ত প্রায় তিনশ বছর কাল চলেছিল অনুরূপ ব্যবস্থা। তারপর ফিলিপের আমলে কঠোর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্বের সেই পরিমণ্ডল বিঘ্নিত হলো এবং সঙ্কুচিত হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সুবিশাল ক্ষেত্রটি। অবশেষে পরবর্তী রাজনৈতিক উত্থান পতনের যুগে ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে গেল।

গ্রীসের বৈজ্ঞানিক তথ্য মূলতঃ দর্শনের ভেতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই দর্শনের সূত্রপাত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহামণীষী থেলস এর দ্বারা। অন্যদিকে থেলস থেকে প্লেতো পর্যন্ত দর্শনের যে ধারাটি প্রবাহিত হয়েছিল তাতে দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। এই পর্যায়ে গ্রীক দর্শনের গুরুস্থানীয়রা যথা থেলস, অ্যানাক্সামেণ্ডার, অ্যানাক্সাগোরাস, অ্যানাক্সামেনস, পিথাগোরাস, হেরাক্লিতিস প্রভৃতি বিশ্বের উপাদান এবং স্থূল বস্তুজগৎ সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। তাছাড়া পৃথক পৃথক

ভাবে তাঁরা অঙ্ক, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন।

পরবর্তীকালে প্লেতোর দর্শনচিন্তা অন্য রূপ পরিগ্রহ করে। প্লেতোর দর্শন ছিল অন্তর্মুখী ও বিজ্ঞান বিরোধী। আধ্যাত্মজগৎ নিয়েই ছিল তাঁর দর্শন। স্থূল বস্তুকে তিনি উপেক্ষাই করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরই দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান "প্লেতো একাদেমি" বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছিল। প্রকৃত পক্ষে আলেকজান্দ্রিয়ার সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিই গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে করেছে মহান। সর্বযুগের ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বিজ্ঞানী অ্যারিস্তোতল ছিলেন ঐ প্লেতো একাদেমিরই ছাত্র। তিনি উত্তরকালে যে সমস্ত পুস্তক রচনা করেছিলেন তাতে একদিকে যেমন প্লেতোর দর্শন পূর্ণাঙ্গ লাভ করেছিল অপরদিকে তেমনই পদার্থবিজ্ঞানও জীববিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেছিলেন। আর অ্যারিস্তোতলের পরেই এসেছিলেন মহামতি আর্কিমিদিস—গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের নব রূপকার।

গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানে আছে গ্রীকদের অবিস্মরণীয় অবদান। গণিত ও জ্যামিতির সূচনা করেছেন ইউক্লিড ও পিথাগোরাস, গণিত ও পদার্থ-বিদ্যার বিভিন্ন শাখাকে পুষ্ট করেছেন আর্কিমিদিস, পৃথিবীর আহ্নিকগতি সম্বন্ধে প্রথম চিন্তাভাবনা শুরু করেন অ্যারিস্তার্কাস, চিকিৎসাবিজ্ঞানকে সংস্কারমুক্ত করেন হিপ্পোক্রাতেশ এবং জীব ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেন অ্যারিস্তোতল। এক কথায় বিজ্ঞানের অধিকাংশ শাখার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন গ্রীকরাই। তাই আজ সেই সব মহামণীষীদের কয়েকজনকে বিজ্ঞানের এক একটি শাখার "জনক" রূপে অভিহিত করা হয়। যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপ্পোক্রাতেশ, জীববিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্তোতল, উদস্থিতিবিদ্যার জনক আর্কিমিদিস, ইত্যাদি।

সেকালে গ্রীসে বহু প্রতিভার সমাবেশ হয়েছিল। বিজ্ঞানের এক একটি শাখায় আবার অনেকেরই আছে অবদান। তাঁদের সবার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করতে গেলে পুস্তকের কলেবর মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে উঠবে। তাই তাঁদের নাম, আবির্ভাবকাল এবং আবিষ্কারের একটি তালিকা প্রদান করা গেল।

বিজ্ঞানীর নাম ও আবির্ভাবকাল	আবিষ্কার
১। থেলস (খ্রীঃ পূঃ ৬২৫—৫৪৫)	একাধারে দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও পূর্তবিদ্যা বিশারদ। ইনিই প্রথম উচ্চারণ করেন, বিশ্বজগতের রহস্যের মূলে প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খলা বিদ্যমান। আবিষ্কারাবলী :—(১) সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক কারণ (২) বৃত্তের ব্যাস বৃত্তকে সমান দুই অংশে বিভক্ত করে (৩) সমবাহু ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন কোণদ্বয় সমান (৪) ব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনা (৫) ছায়ার দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের দ্বারা কোন সুউচ্চ বস্তুর দৈর্ঘ্য নির্ণয়।
২। থিওফ্রেস্টাস অ্যানাক্সামেণ্ডার (খ্রীঃ পূঃ ৬১১—৫৪৭)	পাশ্চাত্য দর্শনের স্রষ্টা। জ্যোতিষ, জ্যামিতি, সৃষ্টিতত্ত্ব, ভূগোল প্রভৃতি নানা বিষয়ের গবেষক। ইনিই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন। পৃথিবীর স্থলভাগকে যে সমুদ্র বেষ্টন করে আছে—এই সত্যটি তাঁর মানচিত্র থেকে প্রকাশ পায় এবং মানচিত্রটি দীর্ঘকাল নাবিকমহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে এসেছিল। এঁর লিখিত পুস্তক Nature (নেচার)।
৩। অ্যানাক্সামেনস (খ্রীঃ পূঃ ৫৮৫—৫২৮)	বিখ্যাত দার্শনিক। উল্লেখ করেন পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহরা বায়ুসমুদ্রে ভাসমান। প্রচার করেন, চন্দ্রের নিজস্ব কোন দ্যুতি নেই। ইনি বায়ুকে পৃথিবী সৃষ্টির মূল উপাদান হিসাবে ধরেছিলেন।
৪। পিথাগোরাস (সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৫৭৫—৪৯৭)	একাধারে দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। ধর্ম, দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য ক্রোটনে ভ্রাতৃসংঘ স্থাপন করেন এবং সমাজ-সংস্কার ও মানুষের নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য সংঘের সবাইকে সন্ন্যাসজীবন-যাপনে

বিজ্ঞানীর নাম ও আবির্ভাবকাল	আবিষ্কার
	উদ্বুদ্ধ করান। তিনি কিছু লিখে যাননি। সংঘের ভাইদের দ্বারা মুখে মুখে প্রচলিত তথ্যগুলি থেকে জানা যায়, সংখ্যাতত্ব সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেছিলেন, সমকোণী ত্রিভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্যটির প্রবক্তা, এবং তিনিই আকাশের গ্রহ ও জ্যোতিষ্কদের গোলাকার কল্পনা করেন।
৫। পার্মেনিডিস (জন্ম আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৫১৬ অব্দ)	প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেতোর লেখা থেকে জানা যায় সক্রেটিসের ১৮ বছর বয়সের সময় এঁর বয়স ছিল ৬৫। এঁর দর্শনে কোন কিছুর বিনাশ নেই এবং "কিছু না" থেকে সৃষ্টি হয় না। অর্থাৎ বর্তমানে বিজ্ঞানের "বস্তুর নিত্যতা সূত্র" তাঁর দর্শনেই পাওয়া যায়।
৬। এল্কমেয়ন বা আলক্ মাওন (জন্ম সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দ)	অপটিক্ নার্ভের আবিষ্কর্তা। আমাদের অনুভূতি ও মননশক্তির কেন্দ্রস্থল যে মস্তিষ্ক—এই সত্যটি তিনি উদঘাটন করেন।
৭। অ্যানাক্সাগোরাস (খ্রীঃ পূঃ ৫০০—৪২৮)	প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ইনিই প্রথম চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। উল্লেখ করেন পৃথিবী, চাঁদ ও আকাশের গ্রহগুলির উপাদান একই। সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতিকে ঈশ্বর সৃষ্ট বলে মনে করতেন না। তাই তিনি নাস্তিক আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।
৮। এম্পিডক্লেস (খ্রীঃ পূঃ ৪৯৪—৪৩৪)	প্রখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ও পদার্থবিদ। ইনিই প্রথম প্রমাণ করেন আলোর গতিবেগ আছে। বৈজ্ঞানিক সত্যকে বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার নীতি তিনিই গ্রহণ করেছিলেন।

বিজ্ঞানীর নাম ও আবির্ভাবকাল	আবিষ্কার
৯। ডিমোক্রিটাস (জন্ম খ্রীঃ পূঃ ৪৬০ অব্দ)	পরমাণুবাদের প্রথম প্রবক্তা। জ্যামিতি, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা নিয়েও গবেষণা করেছিলেন।
১০। হিপ্পোক্রাতেশ (খ্রীঃ পূঃ ৪৬০—৩৭৭)	চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক। চিকিৎসাশাস্ত্রকে প্রথম তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক করে গড়ে তোলেন এবং মানবদেহ সম্বন্ধে গবেষণার প্রথম সূত্রপাত করেন। তিনি নিজে সুচিকিৎসক ছিলেন এবং ১০১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর দীর্ঘকালের চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতা সর্বকালের সমস্ত চিকিৎসাবিদের অনুসরণ করে আসছেন।
১১। অ্যানারকাসিস (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী)	বিখ্যাত প্রযুক্তিবিদ। হাপরের আবিষ্কর্তা।
১২। থিওডোরাস লাভেল (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী)	বিখ্যাত প্রযুক্তিবিদ। মাপনযন্ত্র, লেদ, রুলার, চাবি, সেট্স্কোয়ার প্রভৃতি বহু জিনিসের আবিষ্কারক।
১৩। প্লেতো (খ্রীঃ পূঃ ৪২৮—৩৪৮)	পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তা সত্ত্বেও গণিতে ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান আছে। বিন্দু, রেখা, তল, ঘন ইত্যাদির নির্ভুল সংজ্ঞা প্রথম তিনিই দান করেছেন।
১৪। ইউডক্সাস (খ্রীঃ পূঃ ৪০৯—৩৫৬)	ইনিই প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানকে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। Theory of proportion এবং Method of exhaustion এর আবিষ্কারক। তাঁর এই আবিষ্কার আর্কিমিদিসকে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীকালে Method of exhaustion থেকে Integral calculus এর উদ্ভব।

বিজ্ঞানীর নাম ও আবির্ভাবকাল	আবিষ্কার
১৫। হেরাক্লিডিস (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৮—৩১৫)	প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। পৃথিবীর আহ্নিক গতির আবিষ্কর্তা। ইনিই প্রথম উল্লেখ করেন, বুধ ও শুক্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।
১৬। মেনেকমাস (খ্রীঃ পূঃ ৩৭৫—৩২৫)	কনিক জ্যামিতির আবিষ্কর্তা।
১৭। অ্যারিস্তোতল (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪—৩২২)	প্রখ্যাত দার্শনিক ও জীব বিজ্ঞানী। জীবজন্তুর আকৃতির তারতম্য অনুসারে জীবকে প্রথম ইনিই কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। জীববিদ্যার জনক হিসাবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।
১৮। থিওফ্রেসটাস (খ্রীঃ পূঃ ৩৭৩—২৮৮)	উদ্ভিদবিদ্যা ও জীববিদ্যার গবেষক ও বহু তথ্যের আবিষ্কারক। ইনি প্রথম **white lead** প্রস্তুত করতে সমর্থ হন।
১৯। ডিকেয়ারবাস (খ্রীঃ পূঃ ৩৫৫—২৮৫)	পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে প্রথম অক্ষাংশের কল্পনা করেন।
২০। হিরোফিলাস (জন্ম অনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দ)	প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ও যন্ত্রবিদ। শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে বহু তথ্য উদঘাটন করেন এবং চক্ষুর গঠন বৈচিত্র্য প্রদান করেন।
২১। ইরাসিসট্রেটাস (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী)	রক্ত সংবহন সম্বন্ধে প্রথম মৌলিক তথ্য আহরণ করেন। মস্তিষ্ক, ধমনী ও শিরা, স্নায়ুতন্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখযোগ্য তথ্য আহরণ করেছিলেন।

বিজ্ঞানীর নাম ও আবির্ভাবকাল	আবিষ্কার
২২। ইউক্লিড (খ্রীঃ পূঃ ৩৩০—২৬০)	প্রখ্যাত জ্যামিতিবিদ। প্রচলিত জ্যামিতিক তথ্যগুলিকে তিনি সুশৃঙ্খলভাবে সঙ্কলিত করে মহৎ উপকার সাধন করে গেছেন। তাঁর জ্যামিতি ইউক্লিডের জ্যামিতি নামে আজও প্রসিদ্ধ। আলোকের স্বরূপ ও তার প্রতিফলনের নিয়মগুলি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছিলেন ইউক্লিড।
২৩। আর্কিমিদিস (খ্রীঃ পূঃ ২৮৭—২১২)	উদস্থিতিবিদ্যার জনক। বলবিদ্যা ও পূর্তবিদ্যার ভিত্তি স্থাপক। ইনিই প্রথম সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার মহান কৃতিত্ব তাঁরই। বহু আবিষ্কারের সঙ্গে আর্কিমিদিসের নাম জড়িত। তাদের মধ্যে তরলের প্লবতা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় তাঁর সুমহান কীর্তি। গণিতেও আছে তাঁর অসামান্য অবদান।
২৪। স্ট্রাটো (খ্রীঃ পূঃ ২৮৭—২৫৯)	বৈজ্ঞানিক সত্যকে বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করার কৃতিত্ব স্ট্রাটোর। বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ।
২৫। স্টেসিবাস (খ্রীঃ পূঃ ২৮৫—২২২)	ক্ষৌরকারের পুত্র নামে খ্যাত এক বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ। ইনি ফোর্স পাম্পের আবিষ্কর্তা। জলঘড়িও নাকি ইনিই আবিষ্কার করেছিলেন।
২৬। অ্যাপোলোনিয়াস (খ্রীঃ পূঃ ২৬০—২০০)	প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ। কনিক জ্যামিতির গবেষক। প্যারোবোলা, হাইপারবোলা, ইলিপস্ প্রভৃতি শব্দগুলি ইনিই প্রথম ব্যবহার করেন।

বিজ্ঞানীর নাম ও আবির্ভাবকাল	আবিষ্কার
২৭। ইরাটোস্থেনিস (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩—১৯২)	প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও ভৌগোলিক। ইনিই প্রথম পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস নির্ণয় করেন।
২৮। অ্যারিস্টার্কাস (খ্রীঃ পূঃ ৩১০—২৩০)	প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। পৃথিবী থেকে সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয়ে এবং পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্র ও সূর্যের আয়তন নির্ণয়ের প্রথম প্রয়াস অ্যারিস্টার্কাসের। এঁর আরও এক মহান অবদান, সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণের কল্পনা।
২৯। হিপারকাস (খ্রীঃ পূঃ ১৯০—১২০)	পৃথিবীর অয়নচলন সংক্রান্ত তথ্যের প্রবর্তক এবং ত্রিকোণোমিতি নামক গণিতের শাখাটির উদ্ভাবক।
৩০। টলেমি সোতার (খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী)	বিজ্ঞানের নিজস্ব বিশেষ কোন অবদান না থাকলেও বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার পথকে প্রশস্ত করার জন্য গ্রন্থাগার, বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, শবব্যবচ্ছেদের ঘর, আকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি অনেক কিছু স্থাপন করেছিলেন। এর ফল হয়েছে সুদূর প্রসারী। যে টলেমির ভূকেন্দ্রিক মতবাদ এককালে ভয়ানকভাবে সাড়া জাগিয়েছিল, সে টলেমি ইনি নন। তিনি ক্লডিয়াস টমেনি এবং তার আবির্ভাবকাল খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী।
৩১। হীরো বা হেরণ (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী)	পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যন্ত্রবিদদের মধ্যে অন্যতম। বাষ্পচালিত টারবাইনের আবিষ্কর্তা। জ্যামিতিতেও এঁর অবদান আছে।

গ্রীক বিজ্ঞানের অবনতি

পাহাড় পর্বত ও নদনদী বেষ্টিত খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত সেই যে প্রাচীন গ্রীস—যার গৌরবগাথা বলে শেষ করা যায় না, তারও একদিন হলো অবনতি। উত্থান ও পতন, মহাকালের নিয়মও বুঝি তাই। উত্থান হলেই পতন অবশ্যম্ভাবী।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রীক রাজ্যগুলির উন্নতির মূলে ছিল গণতন্ত্র। ছোট ছোট রাজ্যগুলি সেদিন নগর রাষ্ট্র বা "পলিস" নামে খ্যাত হয়েছিল। এই পলিস কথাটি থেকে পলিটিক্স বা রাষ্ট্রনীতি কথাটির উদ্ভব হয়েছে। সেই পলিসগুলির কোন রাজা ছিল না। তাই গ্রীকরাই প্রথম জগৎকে দেখিয়েছিলেন রাজাকে বাদ দিয়েও রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায়। রাজ্যগুলি যেহেতু ছোট ছিল তাই তাদের লোকসংখ্যাও ছিল বেশ কম। বড় বড় রাস্তার মোড়ে অথবা কোন ফাঁকা জায়গায় প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখে সাধারণ মানুষের সভা বসতো। কোন কোন জায়গায় আবার চতুর্দিক অনাবৃত এক একটি সভাগৃহও ছিল। সভাগুলিই নির্দেশ করতো রাষ্ট্রনায়কদের এবং রাজ্যের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও নির্ধারণ করতো উক্ত সভাগুলি। এমনকি সেখানে অপরাধীর দণ্ড বিধানও করা হতো। অন্যদিকে কিছু কিছু সভা ছিল, যেখানে আলোচনা করা হতো সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির। তাতে উৎসাহিত হতো সাধারণ মানুষ। প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার থাকার জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, সর্ববিষয়ে ছিল সবার যোগ।

গ্রীকদের মধ্যেও ক্রীতদাস প্রথা ছিল এবং ক্রীতদাসদের রাষ্ট্রে কোন মৌলিক অধিকারও ছিল না। অবশ্য রাজ্যের নারীদেরও নয়। তবে মানবতার পূজারী গ্রীকরা ক্রীতদাসদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতো না। সাধারণত যুদ্ধবন্দীরাই ক্রীতদাস হতো। যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের কাজে নিয়োগ করা হতো। কেউ কেউ পুলিশের কাজও যে করতো এমন নজিরও আছে। এমনকি ক্রীতদাসের জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে স্বাধীন নাগরিক হিসাবে যোগদানেরও কতকগুলি নিয়ম রচিত হয়েছিল। তাই ক্রীতদাসও সেখানে ফেলনা ছিল না। আপন যোগ্যতায় স্বাধীন নাগরিক হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতো। অতএব এ হেন দেশে সর্বশ্রেণীর মানুষ দেশের উন্নতিতে যে আত্মোৎসর্গ করবে—তাতে আর আশ্চর্য কি?

হয়েছিলও তাই। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সর্বক্ষেত্রেই চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছিল। অস্ত্রশস্ত্রের উন্নতি হওয়ায় এবং দেশের প্রতি টান সবার থাকায় (ক্রীতদাসদেরও) যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল অপরাজেয়। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডেটাসের বিবরণী থেকে জানা যায়, পশ্চিম এশিয়ার সমস্ত দেশজুড়ে পারসিক জাতি সাম্রাজ্য গঠন করলেও গ্রীসকে পদানত করতে পারেনি। প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী বীর কাইরাস ব্যাবিলন, আসিরিয়া, মিশর, এশিয়া মাইনর, এমন কি গ্রীসের উত্তরে ম্যাসিডন পর্যন্ত জয় করেছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন গ্রীসে প্রবেশ করতে। এমনকি পারস্যের তৃতীয় সম্রাট প্রথম দারায়ুস গ্রীসের এথেন্স ও স্পার্টাকে স্বাধিকারে আনার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। আরও উল্লেখ করেছেন হেরোডাটাস, দারায়ুসের পুত্র জার্কসিস পিতার পরাজয়ের গ্লানিকে মুছে দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ পারসিক সৈন্যকে নিয়ে গ্রীসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং দার্দানেলিস প্রণালীর উপর সারি সারি নৌকা সাজিয়ে সেতু নির্মাণ করেছিলেন। সঙ্গে ছিল বারশ জাহাজ বোঝাই রসদ ও যুদ্ধোপকরণ। প্রথম প্রথম গ্রীকরা বিশেষ সুবিধা করতে না পারলেও শেষের দিকে গ্রীক নৌবাহিনীর নেতা থেমিস্টক্লিসের অসাধারণ নৈপুণ্যে রসদ বোঝাই সমস্ত পারসিক জাহাজকে ছিন্নভিন্ন হতে হয়েছিল। পারস্য উপসাগরের কূলে এক শৈলশিখর থেকে জার্কসিস এই নিদারুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে কপালে করাঘাত করতে করতে স্বদেশে পলায়ন করেন।

পারসিকদের সঙ্গে গ্রীকদের বিরোধ প্রায় শতবর্ষকাল স্থায়ী হয়েছিল। তবুও গ্রীসের কিছুই হয়নি। যুদ্ধ শেষে অতি বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস অত্যল্পকালের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছিলেন দেশের সুখশান্তি। প্রকৃতপক্ষে তারই আমলে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এথেন্সে গ্রীক সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটেছিল। এবং সেই সময়টা ছিল গ্রীসের গৌরবময় যুগ।

গ্রীসের জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার ধারাটি দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ধারাটি অর্থাৎ গৌরবময় যুগটি চলেছিল গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের আমল পর্যন্ত। কথিত আছে, ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ তথা আলেকজাণ্ডারের পিতা গ্রীসকে নিজের অধীনে আনেন। সেই থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় কঠোর রাজতন্ত্র। যে গ্রীক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ছিল শারীরিক ও মানসিক উন্নতিসাধন, মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা-প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, সংযম ও সর্বপ্রকারের আতিশয্য বর্জন—সেই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর এবার আসে প্রচণ্ড আঘাত। আলেকজাণ্ডারের আমলে আবার আরও কঠোর রাজতন্ত্র ও অভিজাত-

তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। তা সত্ত্বেও গ্রীসে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার ধারাটি লুপ্ত হলো না। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারলো না। অথচ আড্রিয়াটিক থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে তিনি স্বাধিকারে এনেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সর্বত্র দেখা গেল বিশৃঙ্খলা। গ্রীক সাম্রাজ্যের বনিয়াদও ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেল। বিভিন্ন স্থান ভাগ করে নিলেন আলেকজাণ্ডারের বিভিন্ন সেনানায়করা। মূল গ্রীস ভূখণ্ডে কিন্তু শুরু হয়ে গেল গৃহযুদ্ধ।

বিখ্যাত বিজ্ঞান সাধক টলেমি সোতার (ক্লডিয়াস টলেমি নন) ছিলেন আলেকজাণ্ডারের অন্যতম এক সেনানায়ক। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের কিছু অংশ তাঁরই ভাগ্যে জুটেছিল। সেখানে ছিল আলেকজাণ্ডারের স্থাপিত নতুন নগরী আলেকজান্দ্রিয়া। টলেমির উৎসাহে সেই আলেকজান্দ্রিয়াই হয়ে উঠলো বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থল। এইখানেই গ্রীক বিজ্ঞানের প্রথম ধারার সমাপ্তি ও দ্বিতীয় ধারার উদ্ভব। আলেকজান্দ্রিয়ার রাজশক্তির উৎসাহে অত্যল্পকালের মধ্যে গ্রীক বিজ্ঞান পুনরায় তার গতি ফিরে পেল এবং বিভিন্ন স্থানের বিজ্ঞানিরাও সমবেত হলেন। এই পর্যায়ের বিজ্ঞানীদের মধ্যে আছেন ইউক্লিড, আর্কিমিদিস, হিপার্কাস, অ্যারিসটার্কাস, ক্লডিয়াস টলেমি প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। প্রকৃতপক্ষে সেদিনের আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানচর্চাকে অবলম্বন করেই খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে নতুন ভাবে জেগে উঠেছে বিজ্ঞান।

আলেকজান্দ্রিয়া শহর মূলতঃ গ্রীকদের বিজ্ঞান চর্চার স্থল বলে পরিচিত হলেও এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় ঘটেছিল। গ্রীকদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ যদিও প্রবল ছিল এবং রাজশক্তিরও উক্ত মনোভাবের প্রতি সমর্থন ছিল, তবুও কালক্রমে আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে মিশরীয় এবং ইহুদীরাও বিজ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করে। কারণ দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল।

আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানচর্চা দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল। তবে রোমানদের আক্রমণের সময় থেকে এর গৌরবসূর্য অস্তমিত হয়। তথাপি এখানকার বিরাট পুঁথিশালাটি অক্ষত অবস্থায় ছিল। কেবল অ্যারিস্তোতলের সংগৃহীত চার লক্ষের মত পুস্তক সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছিল। হয়ত সেখানে সর্বসাকুল্যে সংরক্ষিত পুস্তকের সংখ্যা কাছাকাছি ৫০ লক্ষ বা আরও বেশী ছিল। এই গ্রন্থাগারটি প্রাচীনকালের পৃথিবীর অন্যতম এক বিস্ময়ও বলা যেতে পারে।

পৃথিবীর এই অমূল্য সম্পদকে নাস্তিকতার অভিযোগে প্রথম ৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে

ধ্বংস করেন বিশপ থিওফিলাস। তবুও সম্পূর্ণ তাঁর দ্বারা ধ্বংস হয়নি। মুসলমানরা ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করলে ধর্মান্ধ নেতা খলিফা ওমর ওর ধ্বংস কার্য সম্পন্ন করেন। তাঁর মতে আলেকজান্দ্রিয়ার শিক্ষা ছিল কোরান বিরুদ্ধ শিক্ষা।

আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞান চর্চার আর এক বৈশিষ্ট্য এখানেই প্রথম রসায়ন বিজ্ঞানের প্রণালীবদ্ধভাবে চর্চা শুরু হয় এবং নারী বিজ্ঞানীও যোগ দেন। মারিয়া নামে এক ইহুদী মহিলার নাম পাওয়া যায়। তিনি রসায়নের বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করে গেছেন। এঁর আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী। পৃথিবীর প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী হিসাবেও এঁকে চিহ্নিত করা যায়। মারিয়া রচিত একখানি গ্রন্থও পাওয়া গেছে।

আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে প্রথম রসায়ন চর্চা তথা কিমিয়ার প্রসার হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। সে সময়কার আরও দুজন রসায়নবিদ ডিমোক্রিটাস (দ্বিতীয়) এবং জোসিমোস অনেকগুলি রাসায়নিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবক।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানচর্চা একেবারে স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যায় গ্রীক বিজ্ঞানচর্চার দ্বিতীয় ধারাটি। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে এর পর সারা ইউরোপের উপর নেমে আসে এক অন্ধকার যুগ।

রোমান আমলের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

(খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী)

ইওরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্ধকার যুগের সূচনা বলতে হবে রোমানদেরই হাতে। অনেক আগেই গ্রীক সভ্যতার বনিয়াদে ফাটল ধরেছিল। গৃহযুদ্ধের সুযোগে বিদেশীরা চালালো আক্রমণ। শেষে রোমানরা পাকাফলের মত লুফে নিল গ্রীসকে। খ্রীষ্টপূর্ব ৫০ অব্দে টলেমির সাধের বিজ্ঞানকেন্দ্রটিও হল রোমানদের পদানত। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে প্রায় সাতশ বছর কাল ইওরোপে রোমানদের প্রাধান্যের যুগ।

রোমান আমলের প্রথম দিকে অবশ্য ঐ গ্রীকদের দ্বারা বিজ্ঞানচর্চা কিছুটা অব্যাহত ছিল। তার কারণ, রোমানরা একরকম বর্বর জাতিই ছিল। ওদের

না ছিল সাহিত্য, না ছিল দর্শন, না ছিল বিজ্ঞান, না ছিল ভাব প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষা। গ্রীস জয়ের পর রাজশক্তি নিজেদের দুর্বলতার কথা বুঝতে পেরেছিল। তাই প্রশ্রয় দিয়েছিল গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানকে। এমনকি খ্রীঃ পূর্ব ১৬৮ অব্দে পিডনার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর কিছু গ্রীক পণ্ডিত তাঁদের পুঁথিপত্র সমেত খোদ রোমে এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রার্থী হলে তাঁদের সাদরে গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ গ্রীস জয়ের পর গ্রীসের উন্নত সংস্কৃতিকেও তারা আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল।

প্রাথমিক অবস্থায় তাই রোমানদের প্রশ্রয়ে ঐ গ্রীকরাই বিজ্ঞানচর্চা করেছিল। কিন্তু তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের দিকে রোমানরা কোন আর্কষণ অনুভব করেনি। তারা গ্রীক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্যে ও শিল্পকলায় যে ভাবে উন্নতি লাভ করেছিল, তার শতাংশের এক অংশও বিজ্ঞানে উন্নতি করেনি। তবে ফলিত বিজ্ঞানে সে আমল কিছুটা বৈশিষ্ট্য রেখে গেছে। বিশেষ করে বলবিদ্যায় ও যন্ত্রবিদ্যায় বহু আবিষ্কার আছে রোমান আমলের। অপরদিকে স্থাপত্যবিদ্যায় ও পূর্তবিদ্যায় গ্রীকদেরও অতিক্রম করে গেছে।

অনেকে মনে করেন, রোমানদের চরিত্রই ছিল আলাদা। তারা বিলাসী ও নিষ্ঠুর ছিল। যার কোন ব্যবহারিক দিক নেই তার দিকে আদৌ লক্ষ্য করতো না। চিন্তাশীলতা তাদের জাতীয় চরিত্রের বহির্ভূত ছিল। আপন স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসোপকরণ ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য শ্রম ও বুদ্ধি নিয়োগ করতো। নিবিড়ভাবে কোন কিছুকে নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে বসে থেকে গবেষণা করা তাদের ধাতে ছিল না। একেবারে ব্যবহারিক দৃষ্টিসম্পন্ন কাঠখোট্টা মানুষ। ঐ চরিত্রের জন্যই তারা যন্ত্রবিদ্যা, পূর্তবিদ্যা ও স্থাপত্যবিদ্যায় উন্নতি করেছে কিন্তু তত্ত্বীয় বিজ্ঞানে ও দর্শনে একেবারে অনগ্রসর থেকে গেছে। তারা যাতেই উন্নতি করেছে তাদের প্রত্যেকটির উৎসস্থল গ্রীকদের বিজ্ঞান। অথচ চিন্তাশীলতা এবং বিশ্লেষণক্ষম মনোভাব না থাকার জন্য এতবড় যে গ্রীক গণিত, জ্যামিতি, ও দর্শন সবই অবহেলিত হয়েছে।

রোমান আমলের কয়েকজন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ :—

১। মার্কাস্ পোর্সিয়াস ক্যাটো (খ্রীঃ পূঃ ২৩৪—১৪৯) ইনি প্রথম কৃষিবিদ্যার পুস্তক রচনা করেন এবং তাঁর পুস্তকে ১২০টি উদ্ভিদের নাম লিপিবদ্ধ করেন।

২। টেরেন্টিয়াস ভারো—(খ্রীঃ পূঃ ১১৬—২৭)

গ্রীকভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কৃষিবিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তকের রচয়িতা।

পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের ভারি সুন্দর বর্ণনা তিনি করেছিলেন। ইউরোপে রেনেসাঁসের আমলে ভারোর কৃষিবিদ্যার পুস্তক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

৩। ভিট্রুভিয়াস—(খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী)

স্থাপত্য ও পূর্তবিদ্যা বিশারদ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ De architecture প্রাচীনকালের পূর্তবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। নগর ও বন্দর পরিকল্পনা, মন্দির, স্নানাগার, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি নির্মাণের কৌশল অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই আজও বইটির সমাদর হ্রাস পায়নি।

৪। স্ট্রাবো—(খ্রীঃ পূর্ব প্রথম শতাব্দী)

জাতিতে গ্রীক। প্রখ্যাত ভৌগোলিক। এঁর রচিত ১৭ খণ্ডে বিভক্ত Geography বইখানি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক ভূগোল গ্রন্থ। বইটিতে দেশ মহাদেশের কেবল ভৌগোলিক বৃত্তান্ত নেই, ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, ইউরোপীয় জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস, পৃথিবীর নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি-সমভূমি, প্রভৃতির বিশেষ বর্ণনা সবাইকে মুগ্ধ করে।

৫। ক্লডিয়াস টলেমি—(খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী)

ইনি ভূকেন্দ্রিক মতবাদ প্রচার করেছিলেন। সেটি আধুনিককালে পরিত্যক্ত হলেও দীর্ঘকাল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে এসেছিল।

৬। প্লিনি—(খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী)

পুরোনাম প্লিনিয়াস সিকান্দার। ৩৭ খণ্ডে বিভক্ত পৃথিবীর প্রথম বিশ্বকোষ প্রণেতা। ১৬ টি খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা। গ্রন্থটি সর্বকালের এক অমূল্য সম্পদ। ইউরোপের রেনেসাঁসের যুগে প্লিনির বিশ্বকোষ অনেক তথ্য সরবরাহ করেছিল। ফলে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছিল।

প্লিনির জন্ম ২৩ খ্রীষ্টাব্দে, অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তাই তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রত্যক্ষ করতে গেলে সেইখানে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

৭। পেণ্ডনিওস ডিওস্কোরিডিস—(খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী)

উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান সম্বন্ধে প্রথমে ইনিই গবেষণা করেছিলেন। তাঁর তালিকায় প্রায় ৬০০ উদ্ভিদ স্থান লাভ করেছিল। মূল, কাণ্ড ও পাতার গঠন বৈচিত্র্যের নিখুঁত বর্ণনা প্রথম তিনিই প্রদান করেন।

৮। সেলসাস—(খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী)

প্রখ্যাত চিকিৎসক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস

লিপিবদ্ধ করে মহদুপকার সাধন করেছিলেন।

৯। গ্যালেন—(খ্রীঃ ১৩০ থেকে খ্রীঃ ২০০)

পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের অন্যতম। এঁরই গবেষণায় শারীরবৃত্ত ও শারীরস্থান নামক দুটি শাখায় পুষ্ট হয়। গ্যালেনের সময় শব-ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ হওয়ায় তাকে ভয়ানক অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। নাহলে তিনি আরও বহু তথ্য প্রদান করতে পারতেন। সেযুগে হিপ্পোক্রাতেশের পর এত বড় চিকিৎসা-বিজ্ঞানী আর জন্মগ্রহণ করেননি।

১০। ডায়োফ্যান্টাস—(খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী)

রোমান আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। অনেকের মতে আলেকজান্দ্রিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর। এঁর রচিত Arithmetica গ্রন্থখানি চিরকাল সুধীমহলে বিশেষ সমাদর লাভ করে আসছে।

১১। হাইপেসিয়া—(খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী)

প্রখ্যাত রোম গণিতজ্ঞ থিওনের কন্যা। রোমান আমলের সর্বশেষ গণিতের গবেষক। বিশ্বের দ্বিতীয় মহিলা বিজ্ঞানী নামেও অভিহিত করা যায়। ইনি জাতিতে ছিলেন গ্রীক এবং অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী। তাঁর লেখা গণিতের সমালোচনা গ্রন্থটি মূল্যবান সম্পদ বিশেষ।

ইনি অসামান্যা রূপ লাবণ্যবতীও ছিলেন। একাধারে রূপ ও গুণ তাঁর কাল হয়েছিল। খ্রীষ্টান পাদরীরা তাঁকে কিছুতেই সহ্য করতে পারেননি। বিধর্মী ও পৌত্তলিক আখ্যায় ভূষিত করে ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আর তাঁরই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে আলেকজান্দ্রিয়ার গৌরব।

উপরোক্ত আলোচনা ও বিজ্ঞানীদের বিবরণী থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সাতশ' বছরের রোমানদের ইতিহাসে বিজ্ঞানে যা জমা পড়েছে তা গ্রীকদের তুলনায় অতি নগণ্য। তবু একেবারে নিঃস্ব বলা যায় না। কিন্তু রোমানদের পতনের পরে ইউরোপের বিজ্ঞানচর্চার ধারাটি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলতে হবে।

এও সত্য যে, রোমান আমলের প্রথমভাগেই মণিমুক্তাগুলি জমা পড়েছে, এবং জমা পড়েছে ঐ গ্রীকদের দ্বারাই। রোমানরা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি। কারণ হিসাবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ওরা জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যবহারিক দিকটা বড় করে দেখতো। প্রকৃতিতে ছিল অতি নিষ্ঠুর। দস্যুবৃত্তি ও অবাধ লুণ্ঠন ছিল পেশা। এমনকি সম্পদের জন্য নিজেদের মধ্যেই হানাহানি করতো। ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং ধন সম্পদ জমা হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনীর হাতে। ধনীদের তখন নামকরণ হয় প্যাটরিসিয়ান

এবং সর্বহারাদের প্রলেটারিয়েট।

ধনীদের তথা প্যাটরিসিয়ানদের অত্যাচারে ও শোষণে দেশে ভূমিদাসের উদ্ভব হয়েছিল এবং ক্রীতদাস শ্রেণীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে চললো। অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত হল ভূমিদাস ও ক্রীতদাস। শিক্ষা-দীক্ষা গেল রসাতলে। একজন মানুষের সেবায় নিযুক্ত হল সহস্র সহস্র মানুষ। কিন্তু সেই বিশেষ মানুষটিও বিলাসব্যসনে মত্ত থেকে তুচ্ছ করলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে।

শেষের দিকে অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত ভূমিদাস ও ক্রীতদাসরা জীবনকে তুচ্ছ করে মালিকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। এদিকে সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে মালিকদের মধ্যেও লেগে গেল সংঘাত। গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ায় বিশাল রোমসাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়লো। আর তখনই আরম্ভ হয়ে গেল বিদেশী টিউটনদের আক্রমণ। যেহেতু দেশরক্ষার ভার ছিল ঐ ক্রীতদাসদের উপর। তারা যুদ্ধ না করে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিদেশীদের আগমনকে পরিষ্কার করে দিল। সুযোগ পেয়ে ইউরোপের অন্যান্য জায়গা থেকেও ছুটে এল বিভিন্ন জাতি। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল রোমসাম্রাজ্য।

সাতশ' বছরের রোমানদের ইতিহাস—যা একটানা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ ও শোষণ-নিপীড়নের ইতিহাস, তাতে প্রাচীন সৃষ্টিগুলি যেমন অবহেলিত হয়েছিল তেমনই নতুন সৃষ্টিও বিঘ্নিত হয়েছিল। রোমানদের অবহেলার ফলেই গ্রীকদের মহামূল্য অবদান এমনকি জ্ঞানবিজ্ঞানের পীঠস্থান আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কেবল কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে টিকে থাকে কয়েকটি পুস্তক ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের আবিষ্কৃত কতকগুলো যন্ত্রপাতি।

প্রাচ্যের পুনর্জাগরণ

(খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী)

একদিন প্রাচ্যে বিজ্ঞানচর্চার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হলে তথা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ায়, সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় এবং নানা কুসংস্কারের বেড়াজালে জাতি আবদ্ধ হওয়ায় বিজ্ঞানীলক্ষ্মী ঘৃণায় পরিত্যাগ করেছিলেন প্রাচ্যকে। ধরা দিয়েছিলেন মানবতার পূজারী এবং সর্বসংস্কারমুক্ত পাশ্চাত্যের গ্রীকদের হাতে। প্রায় হাজার বছর কাল বিজ্ঞান-লক্ষ্মী পাশ্চাত্যের দ্বারে ছিলেন বন্দিনী। কিন্তু রোমানদের অত্যাচারে দেশে

অশান্তির আগুন জ্বলে উঠলে তিনি আবার ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন প্রাচ্যের দিকে। তাঁর কল্যানস্পর্শে পুনর্জাগরিত হল ভারতবর্ষ এবং যে চীন বিজ্ঞানচর্চায় ভাটা পড়েছিল সে চীনও জেগে উঠলো। প্রকৃতপক্ষে ইওরোপের যখন অন্ধকারযুগ, সেই যুগে মাত্র দুটি দেশই বিজ্ঞানে চরম উন্নতিলাভ করেছিল।

চীনের বিজ্ঞান—আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, চীন সুপ্রাচীন সভ্যতা-গুলির অন্যতম। চীনাদের সৌভাগ্য, অপরাপর প্রাচীন জাতির মত বহিঃশত্রুর আক্রমণে তাদের সভ্যতা ধ্বংস হতে পারেনি। হয়ত ভৌগোলিক পরিবেশই তাঁর সহায়ক ছিল।

গ্রীসের মত চীনে কিন্তু কোনদিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দু হাজার বছর আগে সেই যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার জের চলছিল তখনও। কিন্তু গবেষকদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, চীনে রাজতন্ত্র থাকলেও প্রায় প্রতিটি রাজবংশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এবং অত্যাচারী তাঁরা ছিলেন না বা তাঁদের অত্যাচারে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়নি। মোটামুটিভাবে সবাই স্বীকার করেন, চীনের ইতিহাস—একটানা উন্নতিরই ইতিহাস।

একটি আশ্চর্যের বিষয়, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ধর্মগুরুগণ। মাত্র দু-একশ বছরের ব্যবধানে গ্রীস লাভ করেছিল সক্রেটিসকে, ভারত লাভ করেছিল গৌতম বুদ্ধকে এবং চীন লাভ করেছিল কনফুশিয়াসকে। ফলে পৃথিবীর সেরা চিন্তানায়কগণ তিনটি দেশে আবির্ভূত হওয়ায় তিন দেশেরই ধর্মক্ষেত্রে ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে—উভয়ক্ষেত্রেই এসেছিল প্লাবন। যেহেতু এঁরা ছিলেন মানব দরদী এবং সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিভেদ—অপসারণ করেছিলেন তাই মানবতার ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়েছিল। ধর্মের গোঁড়ামিকে অপসারিত করায় দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানও উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করেছিল।

অতএব উল্লেখ করলে অসংগত হবে না যে, সততা-অহিংসা-প্রেম-সৌভ্রাত্র প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীর সঙ্গে বিজ্ঞানের আছে নাড়ির যোগ। কেননা পরের দিকেও দেখা গেছে যীশু ও হজরত মোহম্মদের বাণীকে যখনই যারা অনুসরণ করেছিল তখনই তাদের জড়তা দূরীভূত হয়েছিল এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এসেছিল প্রবল আলোড়ন। আর যখনই বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, অবিচার, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি কদাচার মানব সমাজের বুকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তখনই বিজ্ঞানলক্ষ্মী হয়েছেন চঞ্চলা। পুরাতন আবাসস্থল পরিত্যাগ করে এগিয়ে গেছেন নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে।

চীনে কনফুশিয়াস, লাওৎসে প্রমুখ মণীষিগণ যে দার্শনিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছিলেন এবং যে অহিংসামন্ত্রে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন তারই প্রভাবে পরবর্তীকালে সূচিত হয়েছিল এক মহাপ্লাবন। তার জের আজও পর্যন্ত চলেছে বললেও অত্যুক্তি হবে না।

কথিত আছে খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে চীনাদেশে প্রথম লোহার ব্যবহার শুরু হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ২০৬ অব্দে হান রাজবংশের সূচনা থেকে দেশের শিক্ষাদীক্ষা, পথঘাট, সেচব্যবস্থা প্রভৃতির প্রভূত উন্নতি হয়। হান রাজবংশের পতনের পর বাহিরের যাযাবর জাতিদের আক্রমণে চীন বিব্রত বোধ করে। একটানা সাড়ে তিনশ বছর কাল যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তির ইতিহাস। এই সময়টা চীনের জ্ঞান-বিজ্ঞানে ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের যুগ। অতঃপর দেশে স্থায়ীভাবে শান্তি স্থাপিত হলে বিজ্ঞানচর্চার দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ দ্বিতীয় যুগটাই চীনের বিজ্ঞানের ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। পথ পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল। এবার মহামানবদের আদর্শকে সামনে রেখে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো তারা।

আগে থেকে চীনে লেখার প্রথা উদ্ভাসিত হয়েছিল। পণ্ডিতেরা গাছের পাতায়, মাটির ফলকে এবং কচ্ছপের খোলে লিখতেন। ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখে রাখার সুষ্ঠু মাধ্যমে খুঁজতে গিয়ে সাইলুন নামে এক ব্যক্তি আবিষ্কার করলেন কাগজকে। প্রকৃতপক্ষে কাগজ আবিষ্কার করেই চীনারা বিজ্ঞানের ইতিহাসে যুগান্তরের সূচনা করেছে। কেননা এমন একদিন ছিল, যেদিন পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ কাগজের জন্য ধর্ণা দিয়েছিল চীনের দোরে। এবং চীনাদের আবিষ্কারের জন্যই মানুষ তার মনোভাবকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হলো।

প্রযুক্তি বিদ্যায় চীনের জুড়ি সে আমলে পৃথিবীর কোন দেশ ছিলনা বলা চলে। ওরাই প্রথম লোহা ঢালাই করে এবং চুম্বকের গুণাবলী নির্ণয় করে। ৬২০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তারা পোরসিলেন আবিষ্কার করায় ব্যবসার পথও সুগম হয়েছিল। বহু বিদেশী ছুটে আসতো পোরসিলেনের জিনিস কেনার জন্য। উক্ত সময়কালে তারা আবার হস্তচালিত এক চাকার গাড়ি এবং যন্ত্রচালিত নৌকার আবিষ্কার করেছিল।

বারুদ তৈরির পদ্ধতিও চীনাদের আবিষ্কার। তাই ওরাই প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণে সমর্থ হয়েছিল তারা বারুদ পুরে হাউই তৈরী করতো এবং সেই হাউইকে যুদ্ধে ব্যবহার করতো ক্ষেপনাস্ত্র হিসাবে। এখনও শোনা যায়, হাউইর সাহায্যে তারা আকাশে ওঠার পরিকল্পনাও করেছিল।

চীনারা প্রথমে চুম্বকের গুণগুলি আবিষ্কার করেছিল বলে ওরাই প্রথম তৈরি করেছিল দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। একাদশ শতাব্দীর দিকে তারা যন্ত্রটিকে সঙ্গে

নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করতো। পরে ওদেরই কাছ থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নাবিকেরা দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের নির্মাণ কৌশল আয়ত্ত করে।

খ্রীষ্টীয় ৫৯০ অব্দ থেকে ৯০৬ অব্দ পর্যন্ত চীনে সুই ও তাং নামক দুটি রাজবংশ রাজত্ব করে। এই দুই রাজবংশের আমলে চীনে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্র চূড়ান্তভাবে প্রসারিত হয়েছিল। আবার তাং যুগের সম্রাট তাই সুং-এর রাজত্বকাল চীনের ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। ঐ সময় চীনাদের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পড়ায় ভারতের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। স্বদেশের বিজ্ঞান, সেই সঙ্গে ভারতীয় গণিত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও জ্যোতি-বিজ্ঞান চীন লাভ করে পর্যটকদের মাধ্যমে। ফলে সেখানে নতুনভাবে বিজ্ঞান অনুশীলনের কাজ শুরু হয়। তবে বিজ্ঞানের কোন নতুন তথ্য এসময় তারা আবিষ্কার করতে পারেনি। সাহিত্যেই রেখেছে কৃতিত্বের স্বাক্ষর। বিশ্বকবির সম্মানে ভূষিত চীনের তিন মহাকবি লী-পো, তু-ফ, প্যো-চুই ঐ সময়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাং রাজবংশের শেষের দিকে চীনে মুদ্রণ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। কিন্তু আবিষ্কারকের নাম পাওয়া যায় না। যে সময় চীনে ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার হয়েছিল এবং বড় বড় হস্ত চালিত কারখানাও স্থাপিত হয়েছিল।

তাং রাজত্বের পরে চীনে বিজ্ঞানচর্চায় ভাটা পড়ে। এমনকি সাহিত্য, দর্শন, ও শিল্পেও সূচিত হয় নৈরাজ্য। পরবর্তী সুং রাজাদের রাজত্বের সময়ে শেষ রাত্রির প্রদীপের তেলের মত বিজ্ঞানচর্চাটা যে অল্প স্বল্প বিদ্যমান ছিল তাও তাতারদের আক্রমণে একরকম লুপ্ত হয়ে গেল। অবশেষে চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণ চীনের বুকে আঘাত করলো প্রচণ্ডভাবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গতিপথটা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল বলা যেতে পারে। অবশ্য মঙ্গোল সেনাপতি কুবলাই খাঁ চীনে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার পর চেষ্টা করেছিলেন চীনের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু সে সময় চীনাদের জড়তা কাটাতে কাটতেই কুবলাই খাঁর আমল শেষ হয়ে যায়। সেই থেকে সেও আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো গভীর ঘুমে। মধ্যযুগে বিজ্ঞানচর্চার যে ধারাটি চীনে শুরু হয়েছিল সেটি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে গেল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তারপর একটানা প্রায় পাঁচশ বছর শীতঘুমের মত আচ্ছন্ন থেকে জেগে উঠেছে এই বিংশ শতাব্দীতে।

ভারতবর্ষের বিজ্ঞান—বৈদিক যুগে বিজ্ঞান গবেষণার কাজ আরম্ভ হয়েছিল আর্যঋষিদের হাতে—সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও উল্লেখ করা হয়েছে, আর্যরা সঙ্গে করে এনেছিলেন এক উন্নত বিজ্ঞানকে। কিন্তু লেখার পক্ষপাতী না থাকায় এবং ধর্মীয় আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় পরবর্তীকালে বিজ্ঞানে ভালভাবে গবেষণা হয় নি। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ ও ৫ম শতাব্দীতে অনুশীলনের

কাজ শুরু হয় এবং প্রাচীন আর্য ঋষিরা বিশেষতঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে সব মৌলিক তথ্য আহরণ করেছিলেন সেগুলি সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা চলে। এই কাজে তৎকালীন গান্ধার দেশে তক্ষশিলা নামক বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রচেষ্টা সর্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। দেশের বড় বড় পণ্ডিতরা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। ভারতের নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়ে রচনা করেছিলেন বহু মূল্যবান পুস্তক। আছাড়া জ্যোতি-র্বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান এবং ধাতু বিদ্যাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তক্ষশিলারই প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে জোয়ার আসে। সেখানকার কৃতী ছাত্রদের মধ্যে পাননি, চানক্য, জীবক প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। অনেকের মতে সুশ্রুত এবং পতঞ্জলিও সেখানকার ছাত্র ছিলেন। যাই হোক পরবর্তী কালে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে বিরাট বিপ্লব এসেছিল তার পুরোধাঃ ছিলেন সুশ্রুত ও জীবক। আর উন্নত ধাতুবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যাকে সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন মহর্ষি পতঞ্জলি এবং প্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্র প্রণেতা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চানক্য। তবে এঁরা সবাই ছিলেন সংগ্রাহক। নিজস্ব আবিষ্কার বড় একটা কারুর ছিল না।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতাব্দী থেকে ভারত লৌহশিল্পে উন্নতি লাভ করে। তৎকালীন ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র গ্রীকদের চেয়েও উন্নতি ছিল। প্রমাণ স্বরূপ মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন কয়েক ধরণের অস্ত্র। আর চিকিৎসাবিজ্ঞানও গ্রীস অপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিল। কেননা ঐ আলেকজাণ্ডারই নিজ সৈন্যদলে নিয়োগ করেছিলেন ভারতীয় চিকিৎসকদের।

পরবর্তী রোমান আমলেও ভারতের প্রস্তুত ওষুধ ও লৌহদ্রব্যের চাহিদা যথেষ্ট ছিল। সেই কারণেই রোম ভারতের সঙ্গে বানিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সে সময় রোমের বিখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী "প্লিনি" দুঃখ করে বলেছিলেন, ভারত থেকে ভেষজ ও বিলাসী নরনারীর প্রসাধন সামগ্রী সংগ্রহ করতে কোটি কোটি স্বর্ণ মুদ্রা ভারতে চলে যাচ্ছে। এ ছাড়াও ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে গোলমরিচ, চন্দনকাঠ, নীলরঙ, গজদন্ত, কাপড় ও বাঘ রোমে রপ্তানি হতো। এমন ও কথিত আছে, ভারতীয় রেশম, জরিদার বস্ত্র ও মসলিন না হলে রোমের অভিজাত নরনারীর বেশ বিন্যাস সম্পূর্ণ হতোনা। রোমানরা পার্থিয়া জয় করেছিল একমাত্র ভারতের বাণিজ্যপথ মুক্ত রাখার জন্যই। ভারতের এ সময়কার উন্নত লৌহ নিষ্কাশন প্রণালী ও রসায়নবিদ্যা চানক্য ও পতঞ্জলির লেখা থেকে পাওয়া যায়। পতঞ্জলির লৌহশাস্ত্র ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সে যুগের দুটি উল্লেখযোগ্য দলিল।

মৌর্য বংশের পতনের পর কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে বহু বিদেশী

ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রায় একশ বছরেরও অধিককালে গ্রীক শাসন চলে। তারপর আক্রমণ করে পারদ, শক, ইউচি প্রভৃতি যাযাবর জাতি। এই সময়টা ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাসে অবক্ষয়ের যুগ। অবশেষে ইউ-চি জাতির একটি শাখা কুষাণরা ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কণিষ্কের আমলে পুণরায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। প্রকৃত পক্ষে মধ্যযুগের বিজ্ঞানচর্চা কণিষ্কের আমলে আরম্ভ হয়েছিল এবং এর স্থিতিকাল খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর কাল। এই যুগটিই ভারতবর্ষের ইতিহাসে গৌরবময় যুগ রূপে চিহ্নিত করা হয়।

কণিষ্কের সময় দুজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর আর্বিভাব হয়েছিল। একজন চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষি চরক এবং অপরজন প্রসিদ্ধ রাসায়ণবিদ নাগার্জুন। মহর্ষি চরক একখানি আয়ুর্বেদ সংহিতা রচনা করেছিলেন। ঐ সংহিতা গ্রন্থটি চরক সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। চিকিৎসা বিষয়ক এমন গ্রন্থ সেকালে পৃথিবীর কোন দেশেই রচিত হয়নি। অসুখের বিবরণ ও চিকিৎসাবিধি যে ভাবে চরক সংহিতায় বর্ণিত হয়েছে তা দেখলে আজকের উন্নত বিজ্ঞান ও বিস্ময় বোধ না করে পারেনা। প্রচুর ভেষজের গুণাগুণও বর্ণিত হয়েছে উক্ত সংহিতায়। তাই মধ্যযুগে চরক সংহিতাকে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার জন্য একটা হিড়িক পড়ে গেছিল। আজও পৃথিবীর যেখানে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে অনুসরণ করা হয় সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে চরক সংহিতাকে। অবশ্য সুশ্রুত সংহিতাও পৃথিবীর সভ্য দেশগুলির দৃষ্টি ঐ সময়টা আকর্ষণ করেছিল। তবে সুশ্রুত সংহিতা ছিল মূলতঃ শল্য চিকিৎসা সমন্ধীয় পুস্তক। রসায়ন-বিজ্ঞানী নাগার্জুন সে যুগের আর একটি বড় বিস্ময়। তিনি একাধারে ছিলেন রসায়নবিদ ও চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ। প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষে রসায়ন-বিজ্ঞানে গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে নাগার্জুনের হাতেই। তিনি পারদ গন্ধক ঘটিত কতকগুলি যৌগিকের আবিষ্কর্তা। পারদ সম্বন্ধে এমন মূল্যবান গবেষণা নাগার্জুনের পূর্বে পৃথিবীর কোন দেশ করেনি। কতকগুলি ধাতুভস্ম প্রস্তুতি তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের আমলে বিজ্ঞান আরও উন্নতি লাভ করে। এই সময় আবির্ভূত হন আর্যভট্ট ও বরাহমিহির। দুজনে ছিলেনই অঙ্ক শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। আর্যভট্ট রচিত আর্যভটীয় ও বরাহমিহির রচিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা সে যুগের দুখানি অমূল্য বিজ্ঞানশাস্ত্র। এগুলিও বহু বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং এঁদের উভয়কে সমসাময়িক সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে করা হয়ে থাকে।

গুপ্ত যুগে ধাতু শিল্প ছিল অতি উৎকৃষ্ট। দিল্লীতে যে তৎকালে প্রস্তুত

চন্দ্ররাজের (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের) লৌহস্তম্ভটি আছে তাতে এখনও মরিচা পড়েনি। তাছাড়া বীজগণিত, পাটীগণিত, কৃষিবিদ্যা ও আবহবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণাও সেই সময় হয়েছিল। মনে হয় সেই সময় ভারত সিমেন্ট জাতীয় এক ধরনের পদার্থ আবিষ্কার করেছিল।

গবেষকদের মতে গুপ্তযুগই ভারতীয় সভ্যতার স্বর্ণ যুগ। এই সময় কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চরম বিকাশ ঘটেছিল। আর নাগরিকের জীবনে সমৃদ্ধি, উদার ধর্মমত, পরমত সহিষ্ণুতা, ভারতীয়দের সুনীতি-সুরুচি ও সৌন্দর্য-বোধ সারা বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছিল। তাই এই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল পশ্চিমের বিশাল রোম সাম্রাজ্য থেকে পূর্বে শ্যাম কম্বোজ পর্যন্ত।

গুপ্ত রাজবংশের পতনের (৫০০ খ্রীষ্টাব্দে) পরও ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা পুরোদমে চলেছিল। বিশেষতঃ হর্ষবর্ধনের আমলে প্রতিষ্ঠিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সে সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে। পরে পালযুগে বিক্রমশীলা ও তদন্ত পুরী নামক আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যদিও নালন্দার গৌরব অল্প হ্রাস পাওয়ায় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল তবুও দেশ বিদেশ থেকে তখনও নালন্দায় পড়াশোনা করার জন্য বহু ছাত্রের আগমন হতো। মোট কথা, সমসাময়িক সময়ে এতবড় এবং এত বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর অপর কোন দেশে ছিল না।

উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে বৌদ্ধ শাস্ত্র ও বৌদ্ধ দর্শন প্রধান শিক্ষানীয় বিষয় থাকলেও বিজ্ঞান অবহেলিত হয়নি। ধাতুবিদ্যা, রসায়ন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সব কিছুই শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং এর বিবরণী থেকে জানা যায়, সে সময় নালন্দায় ভেষজ বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন আচার্য বাগভট। এই বাগভটের লেখা আয়ুর্বেদ শাস্ত্র জনপ্রিয়তায় চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতার প্রায় সমকক্ষ হয়েছিল।

গণিতে সে সময় ভারতের সমকক্ষ কোন দেশ ছিল না। আর্যভট্টের পরে ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরাচার্য ও ভাস্করাচার্য গণিতের নানা শাখায় উদ্ভাবন করেছিলেন। বিশেষতঃ ভাস্করাচার্য মধ্যযুগের ভারতবর্ষের একটি বড় বিস্ময়। নিউটনের পাঁচশ বছর পূর্বে তিনি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন এবং চন্দ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি কলমবিদ্যা বা ক্যালকুলাসের প্রয়োগ করেছিলেন। এই মহাপ্রতিভাধর ভাস্করাচার্যই মধ্যযুগের ভারতবর্ষের শেষ অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁর পরে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অন্ধকার যুগ নেমে এসেছিল প্রায় আটশ বছর পরে। সেই অন্ধকার একটু-একটু করে পাতলা হয়ে আজ ঊষার আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

ভারতের আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

পতঞ্জলি (খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতক) লৌহ শাস্ত্রকার ও রসায়ন বিজ্ঞানী। পতঞ্জলি রচিত পুস্তকটির নাম লৌহশাস্ত্র। লৌহ ও ইস্পাত নির্মান পদ্ধতি তিনিই প্রথম বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীর অপর কোন প্রাচীন গ্রন্থে ইস্পাত প্রস্তুত প্রণালীর উল্লেখ নেই।

প্রথম আর্যভট্ট (জন্ম ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) প্রসিদ্ধ অঙ্কবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। কোপার নিকাস-গ্যালিলিওর হাজার বছরেরও আধিককাল পূর্বে ইনি পৃথিবীর আহ্নিকগতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। বিশুদ্ধ গণিতেও আর্যভট্টের অবদান আছে।

বৌদ্ধ চরক (খ্রীষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দী) রচিত পুস্তক চরক সংহিতা। কতকগুলি উদ্ভিদের ভেষজ গুণের আবিষ্কর্তা। ইনিই প্রথম সুসংবদ্ধভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনা করেছিলেন। তাই চরক সংহিতা পৃথিবীর সকল দেশ অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। এমন সৌভাগ্য পৃথিবীর খুব কম পুস্তকেরই হয়েছে। উইলিয়ম হার্ভের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মনুষ্যদের রক্ত সঞ্চালনের কথা ব্যক্ত করেছিলেন চরক।

ব্রহ্মগুপ্ত (আবির্ভাবকাল-আনুমানিক ৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ। এঁর রচিত ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত ও চরক সংহিতার মত নানা দেশে সমাদৃত হয়েছিল। ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের পদ্ধতি ব্রহ্মগুপ্তই আবিষ্কার করেছেন।

বরাহমিহির (জন্ম-আনুমানিক ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে) মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতি-বিজ্ঞানী ও আবহতত্ত্ববিদ। বিজ্ঞান সম্মত পঞ্জিকা প্রস্তুত এঁর অক্ষয় কীর্তি। আজও ভারতের পঞ্জিকা বরাহমিহিরের নীতিকেই অনুসরণ করে।

নাগার্জুন (খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী) প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ ও চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইনিই প্রথম ধাতু, ধাতুভস্ম ও পারদ-গন্ধক ঘটিত কজ্জলী ব্যবহার করেন। ভারতে রসায়ন চর্চার পথিকৃত।

শ্রী ধরাচার্য (আবির্ভাবকাল-আনুমানিক দশম শতাব্দীর শেষভাগ) প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ। দ্বিঘাত সমীকরণের সূত্রের আবিষ্কর্তা। বীজগণিতের আজও শ্রী ধরাচার্যের প্রণালী নামে বিখ্যাত। শ্রী ধরাচার্যই প্রথম পাটীগণিত থেকে বীজগণিতকে পৃথক করেন।

ভাস্করাচার্য (জন্ম-আনুমানিক ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে) অভিকর্ষের নিয়ম

আবিষ্কারক। ক্যালকুলাসের আবিষ্কর্তা। ভাস্করাচার্যের মত প্রতিভাধর বিজ্ঞানী পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন।

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অবনতির কারণ—আর্যদের বর্ণাশ্রম ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অভ্যুত্থান এককালে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে দিয়েছিল। পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে ভেসে গেল দেশ। নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়ে, নতুন উদ্দীপনায় পুনরায় শুরু হল বিজ্ঞানচর্চা। কালক্রমে এই ধর্মেও এসে গেল গোঁড়ামি এবং সংস্কার। ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মও বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে গেল আর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুণরায় হল উত্থান। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে মধ্যযুগে ভারতবর্ষে একদল টীকাকারের উদ্ভব হয়। তাঁরা কেবলমাত্র বেদ, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতির মূল্যায়ণ করতে প্রবৃত্ত হলেন কিন্তু বিজ্ঞানের ধারে পাশে গেলেন না। তাঁদের মধ্যেও বোধ হয় ছিল গোঁড়ামি। পরাশর, ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণ মানুষের মন ও শরীর উভয়ের দোষকে দূরীভূত করার জন্য ধর্মচিন্তা এবং বিজ্ঞান চিন্তা দুই চিন্তাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মনকে গ্লানি মুক্ত করার জন্য রচনা করেছিলেন ধর্মপুস্তক, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য রচনা করেছিলেন আয়ুর্বেদ পুস্তক, ধর্মানুষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়ে পালন করার জন্য রচনা করেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান। মোট কথা জ্ঞানের সব শাখাতেই তাঁরা করেছিলেন বিচরণ। তাঁরা মনে করতেন, সব বিষয়ে শিক্ষালাভ না করলে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিকাশ হলে পণ্ডিতেরা আসল নীতি থেকেই দূরে থাকলেন। প্রাচীন ঋষিদের নামই ভাঙ্গিয়ে গেলেন আর সম্ভব-অসম্ভব কাহিনী জাল বিস্তার করে সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলেন। ধর্মের চেয়ে সংস্কার বড় হলো। আর্য ঋষিদের মূল বক্তব্য হলো বিকৃত। যে অহিংসা, প্রেম, মৈত্রী ও একেশ্বর বাদ সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের ছিল মর্মবাণী, কালক্রমে তাঁদের সেই বাণী নিয়োজিত হলো স্বার্থে, বিভেদ সৃষ্টি করলো মানুষে মানুষে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের কোন বিরোধ নেই। কিন্তু গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে সে পছন্দ করেনা। তাই বিজ্ঞান লক্ষ্মী পুণরায় হলেন চঞ্চলা। সকলের অগোচরে পরিত্যাগ করলেন প্রাচ্যের মন্দির।

মানুষে মানুষে জাতিগত ও পেশাগত বিভেদ জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনাশের মূল কারণ। যখনই যে দেশ প্রেম, অহিংসাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর রচনা করেছে তখনই সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সুযোগ বুঝে এগিয়ে এসেছে হানাদাররা। চালিয়েছে অবাধ হত্যা ও লুণ্ঠন। পরিশেষে কায়েম হয়েছে বিদেশী শাসন। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। দীর্ঘকাল

ধরে এই জাতিটির স্রোতপথে একটু একটু করে পলি জমা হচ্ছিল। কিন্তু সেদিকে কেউ তাকায়নি। শতধা বিছিন্ন ভারতবর্ষ ভেবেছিল দিন এমনিই যাবে। কিন্তু টের পেয়েছিল বিদেশীরা। শুরু হলো নতুন ধর্মে দীক্ষিত এবং নব বলে বলীয়ান মুসলমানদের আক্রমণ। তবুও দেশীয় রাজন্যবর্গের তথা দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের চোখ খুললো না। পরস্পরের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি নিয়ে ব্যস্ত থাকলো। জাতিগত ঐক্যের কথা একবারও কারুর মনে উদিত হল না। গজ কচ্ছপের যুদ্ধ হয়েছিল আর গরুড় অপ্রত্যাশিত ভাবে লাভ করেছিল তার ঈপ্সিত খাদ্য। তেমনই পৃথ্বিরাজ আর আর জয়চন্দ্রের গৃহযুদ্ধে মহম্মদ ঘুরী পাকা ফলের মত টুপ করে পেড়ে নিলেন দিল্লীর সিংহাসন। সেই থেকে আরম্ভ হল ভারতের বুকে মুসলমান শাসন।

বিদেশী শাসকদের কাছে ভারতীয় মাত্রই ছিল বিধর্মী। আর বলা বাহুল্য বিধর্মীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তাদের কাছে অবহেলায় সামগ্রী হয়ে দাঁড়ালো। দেশে যেখানে যত ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মন্দির, পুস্তকাগার সবই নির্বিচারে করলো ধ্বংস। সহস্র সহস্র বছর ধরে রচিত ভারতের বিশাল পুস্তকের ভাণ্ডার অগ্নিদেবতার ক্ষুন্নিবৃত্তি করলো। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি একরকম তারাই ঘটালো। অবশ্য রোমানরা যেমন গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ঠিকমত অনুধাবন করতে পারেনি, ঠিক সেইভাবে ভারতে আগত বিদেশী শাসকবর্গ ভারতীয় চিন্তাধারা ও ভারতীয় উন্নত বিজ্ঞানকে আদৌ উপলব্ধি করতে পারে নি। ওঁদের দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল সঙ্কীর্ণ। কেবলমাত্র রাজ্য জয়, হত্যা, লুণ্ঠন, ক্ষমতার প্রতি লোভ, এই ছিল বেশির ভাগ সম্রাটের আদর্শ। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার কথা কেউ আমল দেননি। আর হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে তেমন চেষ্টা করা হয় নি। যদি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে কোন সম্রাট একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রবর্তন করতেন, দেশী-বিদেশী যে কোন ভাষাকে যদি শিক্ষার বাহন করতেন তাহলে অবশ্যই ভারতের লুপ্ত গৌরব অচিরে ফিরে আসতো, জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হতো। আটশ বছর ধরে ভারতকে ঘুমিয়ে থাকতে হতো না।

অবশ্য এদেশের হিন্দুদেরও যে দোষ নেই-একথাও বলা যায় না। তারাও মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সুনজরে দেখেনি। তাদের ভাষা, তাদের সাহিত্য, তাদের শিল্পের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করেনি আদৌ। বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি করে শম্বুকের মত সন্তর্পনে চলাফেরা করতো এবং জীবনমরণ পণ করে কেবল প্রাচীন শাস্ত্র গুলিকে আঁকড়ে পড়েছিল। নতুন যা কিছু আবিষ্কার সবই ছিল তাদের কাছে খারাপ আর পুরাতন মাত্রই ভাল—এই দৃষ্টি ভঙ্গিই

হিন্দুদের কবর রচনা করছে। স্বচ্ছ দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে পুরাতনকে সামনে রেখে যদি নতুনের মূল্যায়ন করতে যত্নবান হতো তাহলে ভারতের অতি উচ্চস্তরের বিজ্ঞানের আজ এই হাল হতো না। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দের তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর থেকে ১৭০৭ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু এবং তারপরে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ণ পর্যন্ত একটানা ভারতের চরম দুঃসময়ের ইতিহাস। ভারতবাসীর মোহনিদ্রা ভাঙ্গলো ঐ সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই। সে আর এক অধ্যায়।

আরবের বিজ্ঞানচর্চা

এককালে আরবও ছিল পণ্ডিতদের দেশ। কিন্তু মনুষ্য সভ্যতা কতকটা পাহাড়ী নদীর মত। যখন তার যাত্রা শুরু হয় তখন সে থাকে উদ্দাম। সবরকমের বাধাকে তুচ্ছ করে কেবল এগিয়েই যায়। আর যখন সে সমতল ভূমিতে অবতরণ করে তখন অতিক্ষুদ্র বাধা ও তার গতিপথকে ব্যাহত করে। চলার পথও অনেক হারিয়ে ফেলে। যত রকমের জঞ্জাল এসে জড় হয় গতিমুখে। তখন কোন নদীর আর সাগরে যাওয়া হয় না। আবার কেউ বা বহু বক্রপথ অতিক্রম করে অবশেষে সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়।

একদিন আরবেরও হয়েছিল এই একই অবস্থা। দীর্ঘকাল পরে তাদের মধ্যেও জমেছিল জঞ্জাল। বুঝিবা চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলেছিল তার স্রোতধারাকে। ঠিক সেই দুঃসময়ে বিরাট এক প্লাবনকে বহন করে আনলেন মহাত্মা হজরত মোহম্মদ। এতকাল ধরে যে পলি জমেছিল, কয়েক বছরের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল। আরব খুঁজে পেল তার পথ।

৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মযুদ্ধে মক্কার হয় পরাজয় এবং ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদ করলেন দেহরক্ষা। তাঁর বাণী সঞ্জীবণী মন্ত্রের মত আরবের সমস্ত জড়তাকে করলো বিনাশ। যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলো আরববাসী। চোখের সামনে ভেসে উঠলো তাদের পুর্ব পুরুষদের ছবি। খ্রীষ্টজন্মের বহু আগে তাদের দেশের বণিকরা ও বাণিজ্যের জন্য গমন করতো সুদূর মিশর ও ভারতবর্ষে। সে সব জায়গা থেকে বহে এনেছিল বিজ্ঞান ও দর্শনকে। সুষ্ঠ লেখার পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছিলেন এ দেশের পণ্ডিতবর্গ। কিন্তু আজ?

মোহম্মদের মহামন্ত্র জপ করতে করতে আরব ব্রতী হলো জ্ঞান সাধনায়। বুঝতে পারল নিজের দৈন্য। প্রথমেই তাদের দৃষ্টি পড়লো উন্নত গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের দিকে। এ বিষয়ে আরবের কয়েকটি উপজাতির দানই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কথিত আছে, সীমান্তবর্তী আরব উপজাতীয়রা বাইজেন্টাইন রাজ্যের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছিল। "উমায়াদ" নামক আরবের আর এক উপজাতির কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েছিল সিরিয়ার সরকারী কাজকর্মে এবং আরও কিছু যোগ দিয়েছিল রোমের সৈন্য বাহিনীতে। ওদের সঙ্গেই প্রথম গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় হয়। তাদের মধ্যে যাঁরা পণ্ডিত ছিলেন তাঁরা গ্রীক ভাষা শিক্ষা করে গ্রীক বিজ্ঞানকে নিজের দেশে প্রচার করেন এবং কিছু কিছু বইও স্বদেশে আনয়ন করেন। তাঁদের দেখা দেখি আরও বহু পণ্ডিত গ্রীসে গমন করেন সেখানকার দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার জন্য।

কিছুদিন পরে অর্থাৎ হজরত মোহম্মদের দেহরক্ষার প্রায় ত্রিশ বছর পরে একটা বড় সুযোগ এসে গেল আরবীয়দের। শিক্ষানুরাগী উমায়াদরা সিরিয়া অধিকার করে সেখানে মুসলিম শাসনব্যবস্থা কায়েম করলেন। রাজধানী স্থাপন করলেন দামাস্কাসে। জাতিকে গঠন করার জন্য রাজধানী দামাস্কাসে গড়ে তুললেন একটা বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেদিন তারা মোহম্মদের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি না হলে জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হয় না এবং জাতির মেরুদণ্ডও শক্ত হয় না। তাই দেশের যেখানে ছিলেন যত জ্ঞাণী গুণী তাঁদের সবাইকে আমন্ত্রন করা হলো দামাস্কাসে। দেখতে দেখতে ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দামাস্কাস জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার একটা বড় কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ালো।

দামাস্কাসের এই গৌরব কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হল না। ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আব্বাসিদরা দামাস্কাস অধিকার করলেন, এবং শাসন কেন্দ্রকে স্থানান্তরিত করলেন বাগদাদে। দামাস্কাসের গৌরব সূর্য অস্তমিত হল বটে। তবে আব্বাসিদরা জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা বন্ধ করলেন না। দামাস্কাসের চেয়েও বড় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করলেন বাগদাদে এবং দামাস্কাস থেকে সমস্ত পণ্ডিতকে ধরে এনে বসালেন বাগদানের শিক্ষায়তনে।

বাগদাদের দ্বিতীয় খলিফা আলমনসুরের রাজত্বকালে বাগদাদের শিক্ষাকেন্দ্রটি আরও উন্নতি লাভ করে। আলমনসুরের প্রচেষ্টায় এবার বিদেশ থেকেও বহু পণ্ডিতকে আনা হয় এখানে অধ্যাপনা ও গবেষণার জন্য। প্রকৃতপক্ষে আলমনসুরের চেষ্টায়ই আরবে প্রথম বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়।

আরব্য উপন্যাসে যাঁর নাম অমর হয়ে আছে, সেই "হারুন অল্ রসিদ" ছিলেন বাগদাদের আব্বাসিদ বংশের তৃতীয় খলিফা। তাঁর রাজত্বকালেই পণ্ডিতেরা আরবের সুবর্ণযুগ রূপে চিহ্নিত করে থাকেন। ৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ

পর্যন্ত মাত্র ২৪ বছর তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি যা আরবকে দিয়ে গেছেন তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অত্যন্ত সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মভীরু ও প্রজা বৎসল এই মহলে সম্রাট বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করার জন্য প্রথমে প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রগুলিকে সংগ্রহ করেন। পরে দেশীয় ভাষায় সেগুলিকে অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করেন বহু সংখ্যক পণ্ডিত। পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন "সংঘ" নামে জনৈক ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। তিনি চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতাকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

হারুণ অল রসিদের পরবর্তী খলিফা অর্থাৎ বাগদাদের চতুর্থ খলিফা "আলমামুন"ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনিও অনুবাদ করেছিলেন বহু গ্রীক ও ভারতীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র। এই উদ্দেশ্য তিনি নিয়োগ করেছিলেন "হনয়ান ইবন ইশাক" নামে জনৈক পণ্ডিতকে। ইশাক প্রসিদ্ধ গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানী গেলেনের চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকগুলি এবং টলেমীর কয়েকটি জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের পুস্তক আরবী ভাষায় অনুবাদ করে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হন। তাঁর পুত্র ইশাক ও ভ্রাতুষ্পুত্র হুবায়াস অনুবাদ করেছিলেন ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং হিপ্পোক্রাতেশের লেখা একাধিক চিকিৎসাশাস্ত্র। আলমামুনের সময়ই আরবের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আলখাওয়া রিজমি ভারতীয় অঙ্কশাস্ত্রগুলিকে অনুবাদ করে গণিতে গবেষণার পথকে সুগম করেন।

আলমামুন বিদেশী গ্রন্থগুলিকে কেবলমাত্র অনুবাদ করিয়ে ক্ষান্ত হননি, বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার পথকে উন্মুক্ত করেন। বাগদাদে স্থাপন করেছিলেন আকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। আল ফারখানি নামে জনৈক জ্যোতির্বিজ্ঞানী উক্ত কেন্দ্রটি পরিচালনা করতেন। তিনি একজন বড় গণিতজ্ঞও ছিলেন। কথিত আছে, তাঁরই উৎসাহে আলখাওয়া বিজলী রচনা করেছিলেন "অল জেবর ওয়াল মোকাবালা" নামক বীজ গণিতের গ্রন্থটি। অ্যালজেবরা বা বীজগণিত—এই নামটি এসেছে তাঁরই গ্রন্থটির নাম থেকে।

উপরোক্ত তথ্যগুলি প্রমাণ করে, আরবের বিজ্ঞানচর্চার জোয়ার আসে অনুবাদের মাধ্যমে। তবে একথাও সত্য যে, যাঁরাই অনুবাদক ছিলেন তাঁরাই স্ব স্ব বিষয়ে এক একজন মহাপণ্ডিত। তাই তাঁরা কেবলমাত্র অনুবাদ করে ক্ষান্ত হননি, গবেষণার দ্বারা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সেই হিসাবে এঁদের অনুবাদক বললে, এঁদের প্রতিভার প্রতি অসম্মানই প্রকাশ করা হবে। তাছাড়া জাতীয় জাগরণের দিনে অনুবাদের মাধ্যম গ্রহণ ছাড়া কোন উপায় থাকে না। বিদেশী জ্ঞান ভাণ্ডারকে দেশের সবার সামনে উন্মুক্ত করার ঐ

একটি মাত্রই উপায়। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। তাই দেখা যায় ইউরোপের রেনাসাঁস এসেছিল অনুবাদের মধ্য দিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্যের দেশগুলিও পুনর্জাগরিত হয়েছিল বিদেশী গ্রন্থগুলিকে অনুবাদের মাধ্যমে লাভ করে।

সেকালে আরবে একদল দার্শনিকেরও আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের, দর্শনেও স্থান পেয়েছিল বিজ্ঞান। গ্রীক দার্শনিকদের মত এঁরাও পার্থিব বস্তু, পরমাণু বিশ্বজগৎ প্রভৃতি আলোচনা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলফারথানি, আল বাটানী ও থাবিট ইবন কুরা, গণিতজ্ঞ আলথাওয়া রিজমী এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ইবন সিনহা ও আলরাজির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলরজিকে তার সমসাময়িক সময়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসাবে সম্মান দান করা হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে আরবে বিজ্ঞান চর্চা স্তিমিত হয়ে পড়ে। অবশেষে দ্বাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানচর্চা একরকম বন্ধ হয়ে যায়।

কেবল গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র নয় কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রেও আরব যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। কথিত আছে, সম্রাট হারুণ অল রসিদ বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ মধ্যযুগে ফ্রাঙ্ক রাষ্ট্রের অবিস্মরণীয় রাজা শার্লমানকে যে সব উপহার পাঠিয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে একটি যন্ত্রচালিত ঘড়ি ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আর আরবে বিজ্ঞানচর্চা হয়নি। প্রাচ্যের ভারতবর্ষের মত সেও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

ইওরোপের অন্ধকার যুগে বিজ্ঞান

(খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী)

গ্রীসে রোমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও গ্রীক সভ্যতার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তি ঘটেনি। যেন ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল-আলোর প্রকাশ পাচ্ছিল না একটুও। তারপর গথ, হুন, ভ্যাণ্ডাল, জার্মান প্রভৃতি বর্বর জাতির আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যেরও একদিন পতন হল। সেই থেকে আরম্ভ হল একটানা যুদ্ধবিগ্রহ। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা হল বিঘ্নিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা একরকম ঐখানেই বন্ধ হয়ে গেল।

অপর দিকে দেশ অবরিত যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অবশেষে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেন ও ভূমধ্য সাগরের উপকূলভাগে মুর'দের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একরকম কোণঠাসা হয়ে পড়লো সমগ্র ইওরোপ ভূখণ্ড। বলাবাহুল্য, সে সময় ইওরোপের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। রাজ্যময় অরাজকতা যখন তখন বৈদেশিক আক্রমণ—সমস্ত দেশটিই যেন রসাতলে গেল। ইওরোপের ইতিহাসে সে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগের দিন।

সেই দুর্যোগের দিনে ইওরোপিয় সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন ধর্মযাজকেরা। তাঁরা দেশের মানুষকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন ঈশ্বর পুত্র যীশুর মহান বাণী। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সর্ব-প্রথম উগ্র ও অত্যাচারী জার্মানীদের মধ্যে এল কিছুটা পরিবর্তন। যীশুর মহামন্ত্র কানে প্রবেশ করতেই মন্ত্রমুগ্ধ বিষধরের মত ফনাটা সঙ্কুচিত করলো। তখন ধর্মযাজদের নেতা ছিলেন পোপ তৃতীয় লিও। একদিন ফ্রাঙ্ক রাষ্ট্রের রাজা পার্লমানকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করে তাঁর উপরেই অর্পণ করলেন খ্রীষ্টধর্ম রক্ষার ভার।

মধ্যযুগের অন্ধকারে ঐ শার্লমানই হচ্ছেন এক ক্ষীণ আলোক বর্তিকা পোপের গুরু দায়িত্বকে তিনি পালন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। বর্বর জাতিগুলিকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য নিয়োগ করলেন সর্বশক্তি। গ্রীসে ও রোমের লুপ্ত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার জন্য নিয়োগ করলেন বহু পণ্ডিতকে। রাজধানী আকেন নগরীকে গড়ে চললেন রোমের অনুকরণে। নাম দিলেন নতুন রোম।

সেদিন খ্রীষ্টান জগতের পতন রুখে ছিলেন শার্লমান। কিন্তু পরের দিকে ফল বিশেষ ভাল হয়নি। রাজনীতির ক্ষেত্রে শার্লমানের আমল থেকে পোপ এবং ধর্মযাজকদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে। "চার্লস"-এর আমল পর্যন্ত ছিল পোপ ও সম্রাটের সদ্ভাব। পরের দিকে সে সদ্ভাবটুকু আর থাকল না। একাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ হল বিরোধ। আর সর্বনাশা সেই বিরোধই ইউরোপের নিমজ্জিত করলো ধর্মান্ধতার পঙ্ক পল্বলে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার যে ক্ষীণ আভাসটুক শার্লমানের সময় থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তা এবার হারিয়ে গেল।

প্রকৃতপক্ষে ঐ একাদশ শতাব্দী থেকেই ইওরোপে আরম্ভ হয় ধর্মান্ধতা ও সামন্ত তান্ত্রিকের যুগ। এই সময় থেকে সম্রাট ও পোপের মধ্যে প্রভুত্ব নিয়ে আরম্ভ হয় বিরোধ। বহু আগে থেকে অর্থাৎ রোমান আমল থেকে ইওরোপে

উদ্ভব ঘটেছিল ভূমিদাস প্রথা ও সামন্ততন্ত্রের। অভিজাত সম্প্রদায় ঐ সামন্তদের অধীনে থাকতো ভূমিদাসরা এবং সৈন্য সামন্তরা। তাই সামন্তরাই ছিল রাজার শক্তি। যখন পোপ ও সম্রাটের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হল, তখন ধর্মবিশ্বাসের ফলে কিছু কিছু সামন্ত পোপকে সমর্থন জানালো। ফলে শক্তিশালী হয়ে সম্রাটের মত পোপ সেচ্ছাচারী হয়ে উঠলেন। আরও পরে পোপের চেষ্টায় অধিক সংখ্যক সামন্ত পোপের অনুগামী হওয়ায় পোপের ক্ষমতা সম্রাটের শক্তির প্রায় সমতুল হয়ে পড়লো। আর তখনই প্রকাশ পেল ধর্মযাজকদের প্রচণ্ড সেচ্ছাচার ও ধর্মের নামে গোঁড়ামি।

সেই অবসরে ধর্মযাজাকরা শিক্ষাটাকেও কুক্ষিগত করে ফেললেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় শিক্ষায়তনের পরিবর্তে গীর্জাগুলিই পরিণত হল এক একটি শিক্ষাকেন্দ্র। বিদ্যাবিতরনের ভার গ্রহণ করলেন ধর্মযাজকরাই। শিক্ষার্থী যারা আসতো, তাদের হাতে কোন পুস্তক দেওয়া হতো না। ধর্ম সম্বন্ধে কেবল উপদেশ প্রদান করা হতো। আর শোনানো হতো ধর্মীয় আবরণে আচ্ছাদিত কতকগুলি কাল্পনিক কাহিনী। যার উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মের নামে মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার সেই কাহিনী গুলির মূলে কারও সন্দেহ প্রকাশের উপায় ছিল না। কাহিনীগুলির মূলে সন্দেহ প্রকাশের অর্থ ছিল চার্চের অবমাননা। কোন ব্যক্তি টুঁ শব্দ করলেই কঠোর শাস্তি লাভ করতো। চার্চ কাউকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলে তার মৃত্যুতে কেউ শোক প্রকাশ করতে পারতো না। তাকে কবর দেওয়ার জন্য লোক পাওয়া যেত না, জনজীবনকে যেন একেবারে স্থবির করে রেখে দিয়েছিলেন তৎকালীন ইওরোপের পুরোহিত সম্প্রদায়।

পুরোহিতদের আবার সবচেয়ে বেশি রাগ ছিল বিজ্ঞানচর্চার উপর। বোধ হয় তাঁদের ধারণা হয়েছিল, দেশের কারিগর ও শিল্পী সম্প্রদায় বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে যদি কোন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় তাহলে ঐ যন্ত্রের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবে। অর্থ এলেই মানুষ নিয়ম ভঙ্গ করবে ঐ একই কারণে বিদেশে নৌকাযোগে বাণিজ্য করতে যাওয়াও তাঁরা পছন্দ করত না, বানিজ্যক রুখবার জন্য তাঁরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে প্রচার করতেন, ঈশ্বরের আদেশে সমুদ্রে বিচরণ করে ভুত-প্রেত ও দৈত্য-দানবরা। তাদের ইচ্ছানুসারে সমুদ্রে সৃষ্টি হয় ঝড় তুফান আর জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় দেশ। সমুদ্রবক্ষে নৌকা ভাসিয়ে গমন করলেই তাদের শান্তি বিঘ্নিত হবে এবং রুষ্ট হয়ে জীবনহানি সম্পদহানি ঘটাবে।

মানুষ বিশ্বাস করেছিল এ সব কথা। বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য সব কিছুই ওঁদের কৃপার একেবারে রসাতলে গমন করেন। আকাশের বিদ্যুৎ আকাশে

লুকিয়ে থেকে মানুষের দিকে মুখব্যাদান করতো, কেটলির ফুটন্ত জল থেকে বাষ্প মুক্ত হয়ে হতাশ মনে আকাশে মিশে যেতো, কয়লা পেট্রোলিয়াম ও ধাতব আকরিকগুলি পাতালপুরীতে বন্দী জীবন যাপন করতো—সেদিকে কোন খেয়াল ছিল না কারুর। অদৃষ্টের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসেরজন্য কোন মানুষকে সেদিন চিকিৎসা করা হতো না। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিনা চিকিৎসায় নিয়তির কোলে আশ্রয় গ্রহণ করতো। একরকম দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল এই ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার সমগ্র ইওরোপ মহাদেশটাই যেন সরে দাঁড়িয়েছিল ইতিহাসের পটভূমিকা থেকে। তাই ঐতিহাসিকগণ ইওরোপের ঐ সময়টাকে নাম দিয়েছেন ইওরোপের অন্ধকার যুগ।

তবে খুঁটিনাটিভাবে হিসাব করলে এ যুগেও বিজ্ঞানের কিছু কিছু অবদান চোখে পড়বে। যদিও পরিমাণে নিতান্তই অল্প। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছিল তাদের মধ্যে চাকা লাগানো লাঙ্গল ও গম ভাঙ্গার যন্ত্রই প্রধান। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বায়ু চালিত পেষাই কলের প্রর্বতন হয়। কয়েকজন বিজ্ঞানীরও নাম পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে প্রোক্লাস (৫ম শতাব্দী), ষ্টিফানাস (৭ম শতাব্দী), ক্যালিনিকাস (৭ম শতাব্দী), বীড ও অ্যালকুইন (৮ম শতাব্দী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভবিষ্যতের বিজ্ঞানচর্চার বীজ নিহিত হয়েছিল এই সময়। অন্ধকার যুগের শেষের দিকে ফরাসী পণ্ডিত অবিলার্ড প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় রূপান্তরিত হয় প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইতালিতেও স্থাপিত হয়েছিল বলোনা নামে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের যে অপ্রতিহত জয়যাত্রা সুরু হয়েছিল তার মূলে ছিল ঐ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অবদান।

আরও একটি কথা উল্লেখ না করলে নয়। ইওরোপের ধর্মান্ধতার যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসপত্রের চাহিদা মেটাতে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়েছিল কুটির শিল্পের উপর। তাই দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছিল কুটির শিল্পের অগ্রগতি। তার ফলও হয়েছে সুদূর প্রসারী। পরবর্তীকালে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে এই ইউরোপ ভূখণ্ডেই এসেছিল শিল্প-বিপ্লব।

ইওরোপের পুনর্জাগরণ

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী

১। জাগরণের পশ্চাতে—দীর্ঘকাল অন্ধকার বিবরে কালযাপন করার পর একরকম চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইওরোপে আসে জাগরণ। এই জাগরণ আবার এসেছিল দুজন পুরোহিতের মাধ্যমেই। একজন সন্ন্যাসী রোজার বেকন, আর একজন ইতালির বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক পেত্রার্ক। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম রোজার বেকনই পোপের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন "একমাত্র আলোকবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।" তাঁর ঘোষণা শুনে শিউরে উঠেছিল সমগ্র ইওরোপ।

রোজার বেকন ছিলেন ইংলণ্ডের লোক। ইওরোপের নবজাগরণের পথিকৃত তাঁকে বলা হয় না। পণ্ডিতদের মতে ইওরোপের নবজাগরণ বা রেনাসাঁস এসেছিল সর্বপ্রথম ইতালিতে—পুরোহিত পেত্রার্কের হাত দিয়ে। পেত্রার্কই প্রথম ইওরোপের প্রাচীন ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় গ্রীক ও রোমের লুপ্ত সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলার পুনরুদ্ধার করা হয়। বিজ্ঞান চর্চারও সূত্রপাত করেন তিনিই। তবে মূলতঃ তিনি ছিলেন দার্শনিক ও কবি।

পেত্রার্কের পর ইতালির আর একজন বাস্তববাদী মহাশিল্পীর নাম করতে হয়। তিনি হচ্ছেন, বিশ্বসাহিত্যের অনন্য সৃষ্টি "দেকামেরণ" নামক গল্প আখ্যায়িকার লেখক বোক্কাশিও। যে সময় একমাত্র ধর্মমূলক গ্রন্থ লেখা এবং পড়া ছাড়া আর সব কিছুই ছিল নিষিদ্ধ, সেই যুগেই পেত্রার্ক এবং বোক্কাশিও জনসাধারণকে উপহার দিলেন তৎকালীন সমাজের নিখুঁত ও বাস্তব চিত্র। সেদিন হতচকিত হয়ে গেল ইওরোপের মানুষ। এতদিনে যেন নতুন করে চিন্তা করতে শিখলো তারা।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খেয়ালী জার্মান শিল্পী গুটেনবার্গের মুদ্রনযন্ত্র আবিষ্কার ইওরোপের নবজাগরণের মূলে আর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এতদিনে অতীতের চিন্তাবিদদের লেখা জনসাধারণের সহজলভ্য হলো। খ্রীষ্টের বাণী থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুই প্রকাশিত হলো। সেগুলি দেখে ইওরোপ কেবল মুগ্ধই হলো না—আপন প্রতিবিম্বটাও ভালভাবে লক্ষ্য করলো।

সে সময় ইতালিতে আর একটি বিস্ময়কর প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে। তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। একধারে তিনি ছিলেন চিত্রকর, ভাস্কর, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে ইউরোপে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে একদিন এসেছিল প্রচণ্ড আলোড়ন। তিনি নিজেও ছিলেন বহু যন্ত্রপাতির আবিষ্কর্তা। ভিঞ্চির মত মাইকেল এঞ্জেলো এবং রাফেলের ও ইতালির রেনাসাঁসের মূলে আছে যথেষ্ট অবদান। অথচ এঁরা দুজনেই ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রকর। এঁদের অঙ্কিত চিত্রগুলি আজও বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের বস্তু।

তারপর ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ৭০ বছরের বৃদ্ধ কোপারনিকাস তখন মৃত্যু-শয্যায়। তাঁর লেখা একটি পুস্তক পোপ তৃতীয় পলের হাতে তিনি পড়তে চমকে উঠলেন বাইবেলকে অস্বীকার করে কোপারনিকাস লিখেছেন "সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে না; পৃথিবীই ঘুরছে সূর্যের চারদিকে।" প্রবল সাড়া পড়ে গেল ধর্মাধিকরণদের মধ্যে। কিন্তু কোপারনিকাস তখন জাগতিক হিসাব-নিকাশের বাহিরে। তাঁকে শাস্তি প্রদান করতে না পারায় আরও ক্রুদ্ধ হলেন পোপ। বার বার তাঁকে অভিশাপ প্রদান করে ক্ষান্ত হলেন না, তাঁর বইখানাও বাজেয়াপ্ত করলেন।

কোপারনিকাসের পর এল গ্যালিলিওর কাল। তিনিও ঘোষণা করলেন সেই এক কথা—"সূর্য ঘোরে না, পৃথিবীই ঘোরে।" এবার যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো পুরোহিত সম্প্রদায়ের। ধর্মবিরুদ্ধ কথা প্রচার করছেন বলে রাজদ্বারে তাঁকে অভিযুক্ত করা হল। চরম শাস্তির ভয় দেখিয়ে গ্যালিলিওর কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া হল, তিনি যা বলেছেন সবই ভুল—একমাত্র বাইবেলের কথাই অভ্রান্ত।

জোর করে গ্যালিলিওর মুখ বন্ধ করা হলেও জনসাধারণের মধ্যে একটা সন্দেহ দেখা দিল। কেন একই কথা বার বার শুনতে হচ্ছে তাদের? তাছাড়া গ্যালিলিও যে দূরবীনের সাহায্যে সবাইকে দেখিয়েছেন সূর্য পরিক্রমারত গ্রহদের আকার? তিনি আরও প্রমাণ করেছেন, পৃথিবী আকাশের গ্রহদের মতই গোলাকার।

গ্যালিলিওর আবিষ্কারগুলির ফল হল সুদূরপ্রসারী। তাঁর আবিষ্কার থেকে ইওরোপের মানুষ প্রথম বুঝতে পারে, পৃথিবী গোলাকার এবং তিনভাগ স্থান অধিকার করে আছে কেবল জল-জল আর জল। সেখানে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানবের ভয় নেই।

ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি অশরীরী আত্মার রুদ্ররোষ নয়। এগুলি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক

ব্যাপার। জেগে উঠলো ইওরোপের দুঃসাহসী নাবিককুল। "সপ্তডিঙা" সাজিয়ে বাণিজ্যের কারণে পাড়ি দিল দূর বিদেশে। বাণিজ্যের দ্বারা লক্ষ্মীকে করলো বন্দী। শুরু হল নবজাগরণ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর এই নবজাগরণের যুগ থেকেই ইওরোপীয়দের মানসিক জগতে এসেছিল নানা পরিবর্তন। একদিকে চলতে থাকে গ্রীক ও রোমান যুগের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার এবং অপরদিকে আরম্ভ হয় বর্তমান সমাজের পটভূমিতে নতুন সৃষ্টির কাজ। ফলে ইওরোপ দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত গ্লানিকে মন থেকে মুছে ফেলে যুক্তিবাদী হয়ে উঠলো। ঐ যুক্তিবাদী মন নিয়ে আশেপাশের বস্তুরাশির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়েই বরণ করে নিল বিজ্ঞানকে। তারই পরোক্ষ ফলশ্রুতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পর আবিষ্কার।

২। ভৌগোলিক আবিষ্কার—ইওরোপে বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে ভৌগোলিক আবিষ্কারগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রধানতঃ দুটি কারণে ইওরোপীয়দের মধ্যে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল। প্রথম কারণ, জেরুজালেমের অধিকার নিয়ে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে কয়েকটি ধর্মযুদ্ধে বা ক্রুসেডে যোগদান করতে গিয়ে ইওরোপীয়রা প্রত্যক্ষ করেছিল প্রাচ্যের ঐশ্বর্যকে। ঐ ঐশ্বর্য তাদের প্রলুব্ধ করেছিল বলে ব্যবসা বাণিজ্যের চিন্তা মাথায় এসেছিল। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয়দের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য অনেকখানি নির্ভর করতে হতো প্রাচ্যের উপর। যানবাহনের অসুবিধা, দস্যু তস্করের ভয় ইত্যাদিকে তুচ্ছ করেও তারা স্থলপথে প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চালাতো। অবশ্য সরাসরি নয়। ইতালির ভেনিস, জেনোয়া, মিলান, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি নগরের বণিকেরা আরবীয় বণিকদের মাধ্যমে চালাতো ব্যবসা। কিন্তু তুর্কীরা কনস্তান্তিনোপল অধিকার করে নিলে সেই ব্যবসার পথ একরকম বন্ধই হয়ে গেল। তখনই তাদের দৃষ্টি পড়ে সমুদ্রের উপর।

ইতিমধ্যে ইওরোপীয় বিজ্ঞানীরা পথ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন, পৃথিবীর সবদেশের সঙ্গে জলভাগ যুক্ত এবং পৃথিবীটা গোলাকার। জর্জ পূর্বাম, জোহানস মূলার ওয়ালদার পুর্বের জুলিয়ান ক্যালেণ্ডারকে সংশোধিত করেছিলেন এবং প্রস্তুত করেছিলেন কতকগুলি নৌপঞ্জিকা। আকাশের নক্ষত্রদের সম্বন্ধে একাধিক মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছিলেন আলব্রেখট ডুরার। চীনাদের কাছ থেকে লাভ করেছিল সমুদ্রে দিগ্‌ নির্ণয় করার যন্ত্র। এবার সত্য সত্যই দুঃসাহসী হয়ে উঠলো তারা।

সমুদ্র যাত্রার জন্য প্রথম উৎসাহ প্রদর্শন করেছিল পর্তুগীজ নাবিকেরা। তারা প্রায়ই জিব্রান্টার প্রণালী অতিক্রম করে আফ্রিকার উপকূলবাসী মূরদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ করতো। ফলে আফ্রিকার উপকূলবর্তী অন্যান্য দেশের প্রতি তাদের কৌতূহল জাগরিত হয়েছিল। তাছাড়া ভারত মহাসাগরের মসলা দ্বীপপুঞ্জ থেকে আরবীয় বণিকরা মসলা সংগ্রহ করে ইওরোপীয়দের বিক্রি করে প্রচুর লাভবান হতো বলে পর্তুগীজরা সরাসরি মসলা দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করে। তাছাড়া মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনীর একখানি পাণ্ডুলিপি জনৈক পর্তুগীজ রাজবংশীয় ব্যক্তির হাতে পড়ায় তিনি প্রাচ্যের ঐশ্বর্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং নিজেই সামুদ্রিক অভিযানে বহির্গত হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্তুত করেন কয়েকটি মূল্যবান মানচিত্র ও নক্সা। আর ঐ কারণে পর্তুগীজদের পক্ষে সমুদ্রে অভিযান চালানো সহজ হয়ে উঠে।

অভিযানকারীদের উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কার করা। প্রথমে বার্থালিমিউ ডিয়াজ নামে এক দুঃসাহসী নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ঘুরে ভারতে আসার জন্য সমুদ্রযাত্রা করেন। কিন্তু ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার দক্ষিণ সীমান্তে এক অন্তরীপে উপনীত হওয়ার পর প্রবল ঝড়ের জন্য আর অগ্রসর হতে পারলেন না। দুঃখিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন সেখান থেকে। অন্তরীপটির নাম রেখে এলেন ঝটিকা অন্তরীপ।

বার্থালিমিউ ডিয়াজ সেদিন দুঃখিত হলেও খুশি হলেন তৎকালীন পর্তুগালের রাজা। কারণ, এ পর্যন্ত কোন ইওরোপীয় নাবিক এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেন নি। তাঁর যেন মনে হল, এবার সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে অবশ্যই পৌছানো যেতে পারে। পর্তুগালের রাজা তখন "ঝটিকা অন্তরীপ" নামটি বাতিল করে নাম রাখলেন "উত্তমাশা অন্তরীপ" বা কেপ অফ্ গুড হোপ।

দশবছর কেটে গেল। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই পর্তুগালের রাজার নির্দেশে এবার লিসবন থেকে ভারতের দিকে যাত্রা করলেন ভাস্কোডাগামা নামে এক অসমসাহসিক নাবিক। প্রায় দশমাস কাল ক্রমাগত জাহাজ চালিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে তিনি অবতরণ করলেন কালিকট বন্দরে। পর্তুগালের রাজার অনুমান সত্য হল এবং সেই থেকে ভারতবর্ষের দ্বার পাশ্চাত্যের কাছে মুক্ত হল।

পর্তুগীজরা যখন সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে স্পেনের নাবিকরাও উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল। পৃথিবী গোল—এই বিশ্বাসের উপর

নির্ভর করে জেনোয়া নিবাসী ক্রিস্টোফার কলম্বস ভাস্কোডাগামার আগেই ভারতে আসার জন্য স্পেনের পক্ষ থেকে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তিনি একটি দ্বীপে অবতরণ করে ধারণা করে নিয়েছিলেন তিনি ভারতবর্ষই অবতরণ করেছেন। কিন্তু তিনি যে একটি নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন একথা মৃত্যুর পুর্বেও জানতে পারেননি।

ভাস্কোডাগামা ও কলম্বসের আবিষ্কারের কথা দেখতে দেখতে সারা ইওরোপে ছড়িয়ে পড়লো। আর সাজ সাজ রব পড়ে গেল চতুর্দিকে। অপরদিকে নব আবিষ্কৃত রাজ্যগুলির অধিকার নিয়ে স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ওদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার মানচিত্রে আটলান্টিক মহাসাগরকে একটি রেখা দিয়ে ভাগ করে স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে ভাগ করেছিলেন। পশ্চিমভাগ লাভ করলো স্পেন এবং পূর্বভাগ লাভ করলো পর্তুগাল। এর ফলে নবাবিষ্কৃত আমেরিকা থাকলো স্পেনের অধিকারে আর উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে এশিয়া এবং মসলা দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি পেল পর্তুগাল। ঐ বিভাগ করায় স্পেনের বিশেষ কিছু সুবিধা না হওয়ায় স্পেন ক্ষুণ্ণ হলো, কিন্তু পোপের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারল না। তখন বাধ্য হয়ে তাকে অন্য উপায় চিন্তা করতে হল।

স্পেনীয় সরকারকে অধীনে সে সময় কাজ করতেন ম্যাগেলান নামক এক পর্তুগীজ নাবিক। স্পেনের পক্ষ থেকে আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে ভারতে আসার জন্য তিনিই প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তাঁর আগ্রহকে স্বাগত জানালেন স্পেনের রাজা। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাগেলান পাঁচটি জাহাজ নিয়ে যাত্রা করলেন ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে। একই উদ্দেশ্য কলম্বসেরও ছিল। কিন্তু পৃথিবীর আয়তন সম্বন্ধে তাঁর সঠিক ধারনা ছিল না। তাই আমেরিকার পশ্চিম উপকূলকে ভারতবর্ষ মনে করে ভুল করেছিলেন। ম্যাগেলান কিন্তু সে ভুল করলেন না। আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ধরে যেতে যেতে একদিন একটি প্রণালীতে এসে উপস্থিত হলেন। এই প্রণালীটি আজও ম্যাগেলান প্রণালী নামে খ্যাত। অতঃপর উক্ত প্রণালী ত্যাগ করে আরও অগ্রসর হতে লাগলেন পশ্চিমদিকে। এবার দৃষ্টিগোচর হল এক স্থির, শান্ত ও অতলান্ত মহাসমুদ্র। সমুদ্রের এই রূপ দেখে ম্যাগেলানই নামকরণ করলেন "প্রশান্ত মহাসাগর"।

কতদিন কেটে গেল। তবুও ম্যাগেলান ধৈর্য হারালেন না। একদিন সত্য সত্যই দৃষ্টিগোচর হল কতকগুলি দ্বীপ। আনন্দিত ম্যাগেলান দলবল সহ অবতরণ করলেন। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের নামানুসারে দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ করলেন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

দ্বীপপুঞ্জে জনবসতি ছিল এবং তাদের রাজাও ছিলেন। ম্যাগেলান রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর। রাজার হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে এক সর্দারের হাতে প্রাণ হারালেন। দুঃখিত হলেন রাজা। ম্যাগেলানের সঙ্গী-সাথীদের প্রচুর মসলা এবং খাদ্যদ্রব্য দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন স্বদেশে। তারা ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, সর্বশেষে আটলান্টিক মহাসাগর ঘুরে ফিরে এল স্পেনে। ভূ-প্রদক্ষিণ করার কৃতিত্ব অর্জন করে ম্যাগেলান অমর হয়ে রইলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

মার্কো পোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত, কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার, ভাস্কোডা-গামার ভারতে আগমন, ম্যাগেলানের ভূ-প্রদক্ষিণ—সারা ইওরোপের বুকে প্রবলভাবে সাড়া তুললো। এবার বেরিয়ে পড়লো ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার ও ইংরাজ বণিকগণ। তাঁদের কৃতিত্বের জন্যই পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের প্রায় সব দেশের সঙ্গে স্থাপিত হল যোগাযোগ। বিষময় ফলও কিছু কিছু লাভ হল। নব আবিষ্কৃত ভূমিখণ্ডে স্বীয় অধিকার স্থাপনের অভিপ্রায়ে ইওরোপের সমস্ত রাজশক্তি সপ্তদশ শতাব্দী থেকে লিপ্ত হল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। এই সংগ্রামই বিশ্বের ইতিহাসে "ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের সংগ্রাম" নামে পরিচিত।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্য ইওরোপে যে সাড়া পড়েছিল তাতে চরমভাবে উন্নতিলাভ করেছিল নৌবাহ বিজ্ঞান। অবশ্য এ বিষয়ে স্পেন ও পর্তুগালের বিজ্ঞানীদের বিশেষ কোন অবদান নেই। মহত্তর অবদান রেখেছেন ইতালি, ইংলণ্ড, জার্মানী ও নেদারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা। তাঁদের প্রথম আবিষ্কার, সমুদ্রে জাহাজের অবস্থিতি নির্ণয়। তবে নৌবিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয় ইংরাজ বিজ্ঞানী গিলবার্টের চুম্বক কম্পাসের দ্বারা অক্ষাংশ নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কারের পর থেকে। তারপর সেই সময় জন নেপিয়ার আবিষ্কার করেন লগারিদম্। এবার বড় বড় গুণ ভাগ করা সহজ হওয়ায় নাবিকদের অনেক সুবিধা হয়।

অতঃপর বিজ্ঞানীরা নাবিকদের প্রয়োজনে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য যত্নবান হন। সরকারও এই কাজে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। এই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের গ্রীনউইচ শহরে ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এখানকার অধিকর্তা নিযুক্ত হন জন ফ্লেমষ্টেড। সুদীর্ঘ ৪৪ বছর কাল ধরে চাঁদের গতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি কতকগুলি তালিকা প্রস্তুত করেন। ঐ তালিকাগুলির দ্বারাই প্রথম দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কিন্তু ফ্লেমষ্টেডের পদ্ধতিটি ত্রুটিমুক্ত ছিল না। সেই কারণে

দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের গবেষণা অব্যাহত থাকে। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীশ্চিয়ান হাইঘেনস পেণ্ডুলামের সাহায্যে সময় ঠিক করে দ্রাঘিমা নির্ণয়ের জন্য একটি ক্রনোমিটার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু জাহাজের দোলায় পেণ্ডুলাম সঠিক সময় নির্দেশ করতে না পারায় সমুদ্রে ক্রমোমিটার যন্ত্রটিও কার্যকরী হল না। তখনই ফরাসী সরকার ও বৃটিশ সরকার উভয়েই সমুদ্রে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কারকের জন্য মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী টোবায়েস মেয়ার স্থির নক্ষত্রপুঞ্জের তুলনায় চাঁদের অবস্থান নির্ণয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলি অপেক্ষা মেয়ারের পদ্ধতি ত্রুটিহীন হওয়ায় তিনি পুরস্কার লাভ করেন। অবশেষে ইংলণ্ডের জন হারিসন এবং ফ্রান্সের পিয়েরে লিয়র পৃথক পৃথকভাবে নিখুঁত ক্রনোমিটার যন্ত্র প্রস্তুত করার পর দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের সমস্ত অসুবিধা দূরীভূত হয়। তাই অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা নির্ণয় পদ্ধতি সমুদ্র যাত্রার প্রত্যক্ষ ফল।

৩। ইওরোপের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান—সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইওরোপে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে প্রবল আলোড়ন আসে তার মূলে তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিষ্ঠান-গুলির মাধ্যমে বিজ্ঞানী বা একদিকে যেমন নিজেদের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদান করার সুযোগলাভ করেছিলেন, অপরদিকে তেমনই নতুন প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল।

প্রথমে ইংলণ্ডের কথা ধরা যেতে পারে। সেখানকার "গ্রেশাম" কলেজে ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জন উইল্‌কিন্‌স নামে একজন উৎসাহী বিজ্ঞানী ইংলণ্ডের তরুণ বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠন করেন "ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি" নামে একটি বিজ্ঞান সংস্থা। কতকগুলি রাজনৈতিক কারণে উক্ত সংস্থার কাজকর্ম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞান সংস্থা ভালভাবে কাজকর্ম আরম্ভ করে।

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয় বিখ্যাত রয়েল সোসাইটি। দ্বিতীয় চার্লসের আমলে গঠিত এটি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। এই সোসাইটিই বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে উক্ত সোসাইটি সদস্যদের "ফেলো"-এই সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করার রীতি প্রচলন করেন।

ইওরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশে যথা, রোম, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইতালিতে অনুরূপ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। তবে কতকগুলি সংগঠন দীর্ঘকাল

স্থায়ী হতে পারেনি। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে রোমে "একাডেমিয়া ডি লিন্সি" নামে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল সেটি মাত্র ২৯ বছর স্থায়ী হয়েছিল। মহামতি গ্যালিলিও ছিলেন উক্ত সংস্থাটির সঙ্গে জড়িত। রোমের পরে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে "একাডেমিয়া ডেল সিমেন্টো" নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এটিও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত "প্যারিস একাদেমি অফ সায়েন্স"। ফরাসী বিপ্লবের পর উক্ত সংস্থাটির কার্যক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হয় এবং লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির মতই সুনাম অর্জন করে।

সে সময় জার্মানিতেও কয়েকটি সংস্থা গড়ে উঠেছিল। তবে কোন সংস্থাই স্থায়ী হতে পারেনি। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে লাইবনিটস এর প্রচেষ্টায় বিখ্যাত "বার্লিন একাদেমি" স্থাপিত হলে জার্মানীর বিজ্ঞানীরা উক্ত একাদেমির মাধ্যমে ভাল-ভাবে গবেষণা চালাতে সক্ষম হন। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে "সেন্ট পিটার্সবার্গ একাদেমি" স্থাপিত হলে জার্মানীর বিজ্ঞান ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

পরের দিকে আরও কিছু কিছু বিজ্ঞান সংস্থা গঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও হয়ত অনেক হবে। কিন্তু লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি, ফ্রান্সের প্যারিস একাদেমি অফ সায়েন্স এবং বার্লিন একাদেমির সুনাম কোনকালেই নষ্ট হবে না। ঐ সব সংস্থার সঙ্গে বিদেশীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত ভারতের প্রায় ১৮ জন বিজ্ঞানী রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ডি. এন. ওয়াদিয়া, পঞ্চানন মাহেশ্বরী, মেঘনাদ সাহা, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, শ্রীনিবাস রামানুজন, শিশির কুমার মিত্র প্রমুখ বিজ্ঞানীরা একদিকে যেমন রয়েল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন অপরদিকে তেমনই আর ও বহু বৈদেশিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

৪। শিল্পবিপ্লব—বাণিজ্য ও নৌচালনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা ছিল সেগুলি দূরীভূত হওয়ায় প্রাচ্যের দেশগুলি ইওরোপের হাতের মুঠায় এসে গেল। যদিও এ বিষয়ে স্পেন ও পর্তুগাল সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল তবুও ফলটা ভোগ করেছিল ইংরাজেরাই। তারা প্রথম থেকে কুটীর শিল্পে ছিল উন্নত। এবার এশিয়ার দেশগুলি এবং আমেরিকা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে নিজের দেশে গড়ে তুললো শিল্পের পর শিল্প। তাছাড়া সে সময় ইংরাজরা লাভ করেছিল অসাধারণ প্রতিভাধর কয়েকজন বিজ্ঞানীকে। তাঁরাই শিল্প উৎপাদনের সহায়ক নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে বিপ্লব এনেছিলেন।

এই শিল্পের প্রয়োজনেই কয়লাখনিগুলিকে ঠিকমত ব্যবহার করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। সেও এক ইতিহাস।

আগে শিল্পক্ষেত্রে জ্বালানী হিসাবে কাঠকেই ব্যবহার করা হতো। কিন্তু ইংলণ্ডে যেভাবে শিল্পের প্রসার ঘটলো তাতে কাঠ আর সহজলভ্য হলো না। তখনই শিল্পপতিদের দৃষ্টি পড়লো কয়লার উপর। কিন্তু খনির উপর স্তরের কয়লা বার করা যত সহজ ছিল, ভেতর থেকে কয়লা উত্তোলন তত সহজ ছিল না। সব চেয়ে বড় বাধা হলো খনি থেকে জল সরানো। ফোর্স পাম্পের ব্যবহার অবশ্য পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। কিন্তু খুব গভীর থেকে জল তোলা ফোর্স পাম্পেরও ছিল সাধ্যের বাহিরে। কারণ, এই জাতীয় পাম্প দ্বারা জলকে নিষ্কাশিত করতে হলে দরকার হতো প্রচুর শক্তি। তাই প্রথমে উক্ত বিষয়ে ঘোড়াকে কাজে লাগানো হয়েছিল। কথিত আছে, ইংলণ্ডের কোন কোন কয়লা খনি থেকে জল নিষ্কাশনের কাজে পঁচিশটি তারও বেশি ঘোড়াকে ব্যবহার করা হতো।

এই অসুবিধা কিছুটা দূরীভূত করেন ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন থমাস স্যাভেরি ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ষ্টীম পাম্প তৈরি করে খনি থেকে জল নিষ্কাশনের কাজ অনেকটা সহজ করে দিলেন। তারপর "থমাস নিউকোমেন" আবিষ্কার করেন "এ্যাটমোসফেরিক ষ্টীম ইঞ্জিন"। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইওরোপের প্রায় সব খনিতে উক্ত ইঞ্জিনকে ব্যবহার করে জল নিষ্কাশন করা হতো। অবশেষে জেমস ওয়াট নতুন ধরনের ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করার পর কয়লা উত্তোলনের কাজ খুবই সহজসাধ্য হয়ে উঠে।

এবার জ্বালানী এবং কাঁচামাল কোনটিরই অসুবিধা হলোনা। তার উপরে ইংলণ্ড স্থাপন করেছিল জাতীয় ব্যাঙ্ক। ঐ ব্যাঙ্ক সরকার থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাইকে ঋণ দান করতো। তাই একদিকে যেমন উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটলো অপরদিকে তেমনই গড়ে উঠলো বিরাট বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান। খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের কাজ পূর্বেই সম্ভব হয়েছিল, এবার আবিস্কৃত হল সূতাকাটার যন্ত্র, কলের তাঁত, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, লৌহ গলাবার ইঞ্জিন, ইস্পাত প্রস্তুতি প্রভৃতি অনেক কিছু। বাষ্প শক্তিকে কাজে লাগানোর ফলে শিল্পের আর কোন অসুবিধা রইলনা। একটা ইঞ্জিন একশটা মানুষের কাজ একাই সম্পন্ন করলো। ইংলণ্ডে দেখা দিল শিল্প বিপ্লব।

শিল্প বিপ্লব প্রধানতঃ বস্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে এসেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ইংলণ্ডের আর্দ্র জলবায়ু ছিল বস্ত্রশিল্পের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে "জন কে" আবিষ্কার করেন দ্রুতগামী মাকু, ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হারগ্রীবস আবিষ্কার করেন একসঙ্গে আট গাছা সূতা কাটার যন্ত্র। আর ঠিক সেই সময়ই "আর্ক রাইট" উদ্ভাবন করলেন জল দ্বারা চালিত যন্ত্র ওয়াটার ফ্রেম।

এবার মানুষকে তাঁতে আর হাত লাগাতে হল না। যন্ত্রই চালালো তাঁতকে। সর্বশেষে জেমস ওয়াট যখন বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করলেন তখন আর কোন সমস্যা থাকলো না। বস্ত্রশিল্পে এলো যুগান্তর।

জেমস ওয়াটের ইঞ্জিন অপরাপর শিল্পকেও করলো সমৃদ্ধ। এবার ইংরাজদের, উপনিবেশগুলি থেকে জাহাজযোগে আসতে লাগলো রাশিরাশি কয়লা এবং লোহা পাথর। রবার্ট ফুলটন নামে এক বিজ্ঞানী নৌকার সঙ্গে বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে যুক্ত করে নৌকাকে দ্রুতগতি দান করলেন। পালতোলা জাহাজের কালও শেষ হয়ে এল। অপরদিকে জর্জ ষ্টিফেনসন বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রস্তুত করলেন রেল ইঞ্জিন। দূরত্বকে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করা হলো। তবে এই সমস্ত আবিষ্কারের পশ্চাতে আছে জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন। তাই শিল্প বিপ্লবের প্রধান নায়ক হিসাবে জেমস ওয়াটকে ধরা যেতে পারে।

মানুষ অল্পে সন্তুষ্ট হতে চায় না। যা তার থাকে, তার চেয়ে অনেক-অনেক বেশি সে লাভ করতে চায়। ঠিক সেই অবস্থাই হল ইংলণ্ডের। তারা চাইলো আরও বেশি উন্নতি। বহু প্রতিভাকেও নিয়োগ করা হলো। জেমস ব্রিণ্ডলির পরিকল্পনায় প্রতিটি শহরের চারদিকে আধুনিক প্রণালীতে খাল খনন করা হলো। বাষ্পচালিত নৌকা যোগে এলো প্রচুর কাঁচামাল। স্থলপথে কারখানার কাছে সেগুলিকে বহন করে নিয়ে চললো রেল ইঞ্জিন। আর তখনই ইংলণ্ড সারা বিশ্বের কারখানায় পরিণত হয়ে গেল।

শিল্প সমৃদ্ধ হওয়ায় পৃথিবীর সমস্ত দেশের তুলনায় ইংলণ্ডের আর্থিক কাঠামো অনেক বেশি সুদৃঢ় হয়েছিল। যার জন্য স্বয়ং নেপোলিয়ানকেও হিমসিম খেতে হয়েছিল ইংলণ্ডের কাছে। কঠোর নির্দেশ জারি করেও ইংলণ্ডের শিল্পদ্রব্যের আমদানি বন্ধ করতে পারেননি। ফলে তাঁকে নিজেকেই এগিয়ে আসতে হয়েছিল ফ্রান্সে শিল্পের প্রসারের জন্য।

সেদিন বুদ্ধিবলে ইংলণ্ড বিজ্ঞানলক্ষ্মীকে বন্দিণী করেছিল বলেই সে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিচিত হয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সে গড়ে তুলে-ছিল আপন উপনিবেশ। তাই এককালে বলা হতো, "ব্রিটিশ রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না।" অর্থে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে পারলেই শক্তি বাড়ে এবং বুদ্ধিও বাড়ে। যার জন্য কি বিজ্ঞানে, কি শিল্পে, কি সাহিত্যে ইংলণ্ডই সেদিন লাভ করেছিল চরম উৎকর্ষ। তাদের কাছ থেকেই প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্যের দেশগুলো অনেক পরে ওদের মারফতই লাভ করেছে নবযুগের উপকরণ। যে প্রাচ্য একদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের

পীঠস্থান রূপে পরিচিত হয়েছিল, বিজ্ঞানে উন্নতভাবে গবেষণা চালিয়ে সেই প্রাচ্যকে সে করলো পদানত। একটানা শোষণের ফলে প্রাচ্যকে অন্তঃসারশূন্য করে নিজের দেশকে শিল্পে সম্পদে ভরিয়ে তুললো। পুরাতন জীর্ণ সংস্কার গুলিকে ছিন্ন করে মধ্যযুগে ইওরোপই প্রথম বেরিয়ে এসেছিল। ইওরোপীয় সভ্যতার মাতৃস্বরূপিণী যে সর্বগ্রাসী গ্রীক সভ্যতা-তার ভালটুকুই সে শ্রদ্ধার-সঙ্গে গ্রহণ করেছিল আর যে গুলি ভাল মনে করেনি তাদের সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছিল। এককথায় পুরাতনকে ভিত্তি করে রচনা করেছিল আধুনিক বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ইমারত। কিন্তু প্রাচ্য তখনও কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কেবল পুরাতনকে নিয়েই চর্বিতচর্বন করছিল। তাছাড়া শিক্ষা থেকেও অনেকদূরে সরে দাঁড়িয়েছিল তারা। তাই তার ভাগ্যে জুটেছে অপরিসীম দুঃখ, লাঞ্ছনা ও ক্লেশ।

৫। **বিজ্ঞানের অগ্রগতি**—ইওরোপে বিজ্ঞানের রাজ্যে যে আলোড়নও এসেছিল প্রকৃতপক্ষে তার সূচনা হয়েছিল পিসাবিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলির হাতে। আধুনিক বলবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। পেণ্ডুলাম ঘড়ি, থার্মোমিটার, দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি বহু জিনিসের আবিষ্কর্তা। সপ্তদশ শতাব্দীতে অপরাপর যাঁদের অবদানকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় মহাবিজ্ঞানী নিউটনকে। বিজ্ঞানের রাজ্যে তিনি এক মহাবিস্ময়। মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ সূত্রের আবিষ্কারক এবং অস্ত্রশাস্ত্রের কয়েকটি শাখার উদ্ভাবক। পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান তাঁরই হাতে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই দুইজন অমিত প্রতিভাধর ছাড়া ও বহু বিজ্ঞানী সেদিন গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং রেখেও গেছেন স্থায়ী কীর্তি। তাঁদের মধ্যে স্থানাঙ্ক জ্যামিতির সৃষ্টি করেছেন ফ্রান্সের রেনি দেকার্ত সম্ভাব্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা ফেরমা ও পাস্কাল, চুম্বকের গুণাগুণ আবিষ্কর্তা, গিলবার্ট, ধূমকেতু সম্বন্ধে সঠিক তথ্যের আবিষ্কারক এডমণ্ড হ্যালি, উদ্ভিদ কোষের আবিষ্কারক রবার্ট হুকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আছেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জন রে, শারীর তত্ত্ববিদ উইলিয়ম হার্ভে, জীবাণুতত্ত্ববিদ ভ্যান লিউয়েন হোয়েবা, জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহান কেপলার, গণিতজ্ঞ অ্যাল-ফেন্সে বোরেলি ও লাইবনিটস এবং অসামান্য প্রতিভাধর বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল প্রভৃতি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞানে প্রযুক্ত হয় বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। এই শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন যন্ত্রবিদ জেমসওয়াট, হারগ্রীভস, জর্জ ষ্টিফেনসন। জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিলেন ডি. এলেমবার্ট, ল্যাগরাঞ্জ

ল্যাপলাস, গস, জেমস ব্রাডলি, উইলিয়ম হার্শেল, ইম্যা মুয়েলকাণ্ট, থমাস রাইট ও লিজেণ্ডার। এই শতাব্দীতে রসায়নবিজ্ঞানও তার নিজের পর্বটি খুঁজে পায়। যাঁরা এ বিষয়ে যুগান্তকারী অবদান রেখে গেছেন তাঁরা হলেন জোসেফ ব্লাক, হেনরি ক্যাভেণ্ডিস, জোসেফ প্রিস্টলী, শীলে, হামফ্রে ডেভি, এণ্টনি ল্যা ভোসিয়ার, চার্লস প্রভৃতি। তড়িৎ বিজ্ঞানকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন লুইগি গ্যালভানি, আলেকসান্দ্রো ভোল্টা, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জোহন মিশেল ও কুলম্ব। ডাক্তার জেনার এই শতাব্দীতেই আবিষ্কার করেন বসন্তের টীকা। চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূত্রপাত করেন তিনি। থার্মোমিটার, ষ্টীম ইঞ্জিন, বেলুন, সুতোবোনার কল প্রভৃতি এই শতাব্দীর আবিষ্কার। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়েছে এই সময়ই।

উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান একটানা অগ্রগতির ইতিহাস। বহু আবিষ্কারক এই শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছেন। এবং অসংখ্য যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে আলোকপাত এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। তাছাড়া আলো, বিদ্যুৎ, চুম্বক, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র, ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা-সর্বক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে বৈপ্লবিক অবদান। এযুগে আবির্ভূত উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীদের মাত্র কয়েকজনের নাম করা হলো।

রসায়ন বিজ্ঞানে বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করেছেন, গেলুসাক, অ্যাভোগেড্রো, ডালটন, বার্জিলিয়াস, থমসন, মিতশার্লি, ডুলং, পেটিট, ক্যানিজারে, মেণ্ডালিয়ভ, বুনসেন, ক্রুকস, র‍্যালে, র‍্যামজে, মোসলে, কুরি দম্পতি, বেকারেল ও রাদারফোর্ড। বিদ্যুৎ ও চুম্বক বিজ্ঞানে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন অ্যাঁপেয়ার, উরস্টেড, ওহম, সিবেক, ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল, হুইটস্টোন, কারশফ, ফিটজারাল্ড, হার্টজ। চিকিৎসা জগতে বিপ্লব এনেছেন, লুইপাস্তর, কোথ, বেহরিং, রোনাল্ড রস, পাভলভ প্রভৃতি বহু বিজ্ঞানী।

উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির সংখ্যাও অগণ্য! সেগুলির মধ্যে ষ্টীম লকোমোটিভ, ষ্টীমবোট, সেফটি ল্যাম্প, স্টেথিস স্কোপ, তড়িৎচুম্বক, দেয়াশলাই, ডায়নামো, টেলিগ্রাফ, বাইসাইকেল, মেসিনগান, টরপেডো, ডিনামাইট, টাইপরাইটার, টেলিফোন, সেলুলয়েড, ফোনোগ্রাফ, ইলেকট্রিক বাল্ব, মাইক্রোফোন, ফাউণ্টেনপেন, ফটোগ্রাফি, মোটর সাইকেল, ডিজেল ইঞ্জিন, সাবমেরিন, রেডিও, এক্সরে প্রধান।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের পরিধি অভাবনীয়ভাবে বেড়ে চলেছে। মানুষের সভ্যতাও হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান নির্ভর। ষ্টীম ও বিদ্যুতের যুগ

অতিক্রম করে আজ মানুষ সম্মুখীন হয়েছে পরমাণুর যুগের। সহস্র সহস্র গবেষক পৃথিবীর অজস্র গবেষণাগারে গবেষণারত। বিজ্ঞান অদূর ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আজ মানুষের মনে কেবল সেই চিন্তা। এই শতাব্দীতে মানুষ মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে, এই শতাব্দীতে মানুষ পরিচয় পেয়েছে পরমাণুর ধ্বংসাত্মক ও কল্যাণকর উভয়রূপ। পৃথিবীর উপরের আয়নমণ্ডলের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে, উদ্‌ঘাটন করেছে বিশ্বের রহস্য। পৃথিবীর বেশিরভাগ দুরারোগ্য ব্যাধিকে নির্বাসিত করে এবং উন্নত শল্যচিকিৎসার সাহায্যে অকালমৃত্যুকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। অপরদিকে প্রাকৃতিক বহু জিনিসকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করে স্রষ্টার উপরও হস্তক্ষেপ করেছে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী এবং আবিষ্কারের সংখ্যা দুচার কথায় বলে শেষ করা যায়না। বিজ্ঞানীদের নাম পুস্তকের শেষে প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁদের আবিষ্কারগুলি বর্ণনা করা হয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে। এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলির মধ্যে পড়ে উড়োজাহাজ, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ট্যাঙ্ক, রেডার, আয়ানো স্কোপ, টেলিভিসন, রকেট, সাইক্লোট্রন প্রভৃতি বিস্ময়কর যন্ত্র, পেনিসিলিন স্টেপটোমাইসিন প্রভৃতি অ্যান্‌টি বায়োটিক এবং কতকগুলি জটিল জৈব যৌগের বিশ্লেষণ ও জীবকোষের পরিচয় পাঠ। পারমাণবিক চুল্লী এই শতাব্দীর আর একটি অবিস্মরণীয় অবদান।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্যের জাগরণ

১। **জাপান**—প্রথম থেকে জাপানের সমাজব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। দেশে রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকলেও রাজা বা মিকাডোর কোন ক্ষমতা ছিলনা। কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রী বা সোগান ছিলেন দেশের সর্বেসর্বা। ঐ প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকতো সামন্তরা আর সামন্তদের অধীনে থাকতো সেনাবাহিণী। তাই ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্যই সামন্ত শ্রেণী ও সোগান উভয়ে ছিল অত্যাচারী। তথাপি জাপানীদের মধ্যে একটা বড় গুণ ছিল। দেশকে বড় ভালবাসতো তারা। নিজেদের মধ্যে তারা যাই করুক না কেন জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করতো না। অবশ্য তাদের শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ ছিল ছেলে-মেয়েদের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করান। ধর্মশিক্ষাও প্রদান করা হতো। তবে ধর্মের নামে কুসংস্কারকে প্রাধান্য দেয়নি। দেশপ্রেম, জাতীয়তা বোধ, সংস্কারমুক্ত মন, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, ধর্মজ্ঞান প্রভৃতি মনে হয়

বিজ্ঞানলক্ষ্মীর পরম প্রিয়। তাই সুদূর প্রাচ্যে জাপানের ডাকেই তিনি পাশ্চাত্যে অবস্থান কালেই আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সে শেষেরদিকে বিজ্ঞানে চরম উন্নতিলাভ করে। তাদের উন্নতির মূল সোপান ছিল দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ। জাপানের ইতিহাস প্রমাণ করে, জাতির চরম সর্বনাশের দিনে যদি জাতির মধ্যে দেশপ্রেম মুছে না যায় তাহলে সে জাতির উন্নতি অবশ্যই হবে। জয়যাত্রা তার অব্যাহত থাকবেই।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পর্যন্ত জাপান একরকম বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নই হয়েছিল। তবে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মত ইওরোপীয় বণিকরা তারও দ্বারে হানা দিয়েছিল সেই ষোড়শ শতাব্দীতেই। আর খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য আগমন করেছিলেন জেসুইট ধর্মযাজকগণ। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ প্রভৃতি অনেকেই এসেছিল বানিজ্যের জন্য। কিন্তু তাদের স্বার্থপর মনোভাব জাপানীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাদের ধারণা হয়েছিল, ওরা বাণিজ্যের নামে দেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়। তাই তাদের সংস্পর্শ থেকে মুক্তিলাভের জন্য রাজা জারি করলেন কঠোর আদেশ। সমস্ত ধর্মপ্রচারকদের জাপান ত্যাগ করতে বাধ্য করানো হলো এবং স্বধর্মত্যাগী জাপানীদের হত্যা করা হলো নৃশংসভাবে। সেদিন সে ভেবেছিল, এই ব্যবস্থার দ্বারা সে তার ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে চিরকাল অটুট রাখবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকেও হার মানতে হলো ঔপনিবেশিক শাসনের কাছে।

সুদীর্ঘ দুশ' বছরেরও অধিককাল পরে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ একদিন আমেরিকার নৌ সেনাপতি "কমোডর পেরী" এসে হাজির হলেন রাজ দরবারে। দাবী জানালেন, মার্কিন জাহাজ ও নাবিকদের ব্যবহারের জন্য একাধিক জাপানী বন্দর উন্মুক্ত রাখতে হবে। এবার পেরীর দাবীকে উপেক্ষা করতে ভয় পেল জাপান। তাঁর সঙ্গে আছে সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী ও আধুনিক সমরাস্ত্র। জাপান বুঝি ওদের সঙ্গে তুলনা করলো নিজেদের। তারপর ভয়ে মেনে নিল পেরীর দাবীকে।

আমেরিকা এবার জাপানের সঙ্গে চালালো অবাধ বাণিজ্য। তাদের দেখাদেখি ইংরাজ, রাশিয়া প্রভৃতিও সম্পাদন করলো বাণিজ্য চুক্তি। জাপান আর নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারলো না। শিকার হলো ঔপনিবেশিকদের।

কেটে গেল প্রায় পনেরটি বছর। বিদেশী বণিকদের কার্যপ্রণালীতে বিক্ষুব্ধ হলো জাপানের জনসাধারণ। সূচনা হলো এক আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের। দেশপ্রেমিক তরুণরা ছিল এই বিপ্লবের নেতা। কিছু কিছু সামন্তও যোগ দিলেন সেই বিপ্লবে। রাজা মুৎসুহিতোরও এ বিষয়ে সমর্থন ছিল। কারণ,

সোগান ও সামন্তদের স্বেচ্ছাচার তিনি পছন্দ করতেন না। সুযোগ পেয়ে মুৎসুহিতো তরুণদের সহায়তায় দেশের সামন্তদের ক্ষমতাচ্যুত করালেন আর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশও মানলেন না। অন্যদিকে জনগণের উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার করলেন আমূল পরিবর্তন। ইংরাজী ভাষাকে বাধ্যতামূলক করে ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করলেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার জন্য স্থাপিত হলো বিজ্ঞান গবেষণাগার এবং কিয়াটো ও টোকিওতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন পাশ্চাত্যের পাণ্ডিত্য মণ্ডলী। দেশের তরুণরা যাতে বিদেশে গিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করতে পারে তার-জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হলো এবং বুদ্ধিমান ছেলেদের উৎসাহিত করা হলো।

কেবল শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করে ক্ষান্ত হলেন না মুৎসুহিতো। বিদেশের সাহায্য নিয়ে কলকারখানায় ভরিয়ে দিলেন দেশ। বেকার সমস্যা থাকলো না। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ। আধুনিক সমরবিদ্যায় শিক্ষিত করা হলো জাপানের সেনাবাহিনীকে। ইংরাজের মত নৌবাহিনীকে উন্নত করার জন্য স্থাপন করা হলো জাহাজের কারখানা, পোতাশ্রয় প্রভৃতি।

দেখতে দেখতে জেগে উঠলো জাপান। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে করায়ত্ত করে মাত্র পঁচিশ বছরে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্ররূপে মর্যাদালাভ করলো। তারপর আরম্ভ হলো তার একটানা উন্নতির ইতিহাস। বিজ্ঞানের বলে সে যে কতখানি বলীয়ান হয়েছিল সে কথা প্রমাণ করে রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং বিগত দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ।

কারিগরি বিজ্ঞানে জাপানের মত উন্নত দেশ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়ও তার দান বড় কম নয়। বিশ্বের বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার জন্য ১৯৪৯ সালে হিডেকি যুকাওয়া এবং ১৯৬৫ সালে সিনিচেরো তমোনাগা এই দুই জাপানী বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

২। চীন—নিজের সভ্যতা ও কৃষ্টিতে চীন এতখানি গৌরববোধ করতো যে, সে নিজের রাজ্যকে "স্বর্গীয় রাজ্য" নামে অভিহিত করতো। মনে করতো, তাদের দেশের মত সুসভ্য দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। তাই বিভেদের সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে তারা ঘিরে রেখেছিল নিজেদের—ঠিক যেন প্রাচীনকালে তৈরি তাদেরই প্রাচীরের মত। বিদেশের সান্নিধ্য তাদের কাছে ছিল একেবারেই অসহ্য, বিদেশী মাত্রেই ছিল বর্বর আর বিদেশের শিক্ষা ও সভ্যতা

ছিল সম্পূর্ণ অবহেলার বস্তু। বিদেশী প্রভাব যাতে দেশের উপর না পড়ে সে বিষয়েও ছিল সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

এই গোঁড়ামি ও অহঙ্কারবোধই চীনের অধঃপতনের মূল কারণ হয়েছিল। তারা মনে করেছিল, তাদের দেশ যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছে তার চেয়ে বেশি আবিষ্কার কোন দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের দেশে যে ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে, এমন উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা পৃথিবীর কোন দেশে নেই। তাদের দেশের চেয়ে বড় পণ্ডিত পৃথিবীর কোন দেশে আবির্ভূত হয়নি এবং তাদের দেশের সাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এই কারণে ষোড়শ শতাব্দীতে যখন ইওরোপীয় বণিকরা এসে চীনে হাজির হলো তখন চীন সরকার কঠোর আদেশ জারি করলো তাদের উপর। অত্যাচার এবং অপমানও করলো তাদের। তথাপি সব রকমের অপমান সহ্য করে চীনে পড়ে রইল বিদেশী বণিকরা। শেষপর্যন্ত চীনের শূন্য আস্ফালন ধরা পড়লো বিদেশের কাছে। ইংরাজরা যুদ্ধ ঘোষণা করলো চীনের বিরুদ্ধে। ইতিহাসে ঐ যুদ্ধটি প্রথম অহিফেনের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। যুদ্ধে চীনারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলো। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট স্বাক্ষরিত হলো নানকিং এর সন্ধিচুক্তি। চীনের সুবিখ্যাত হংকং বন্দর ছেড়ে দিতে হলো ইংরাজদের, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রদান করতে হলো প্রচুর অর্থ। তাছাড়া ক্যান্টন, সাংহাই, নিংপো, অ্যাময় এবং ফুচো—এই পাঁচটি বন্দর বিদেশীদের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হলো। ধূলিসাৎ হলো চীনের দম্ভ। তবুও তাদের চোখ খুললো না। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হলো ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সঙ্গে। এই যুদ্ধই-দ্বিতীয় অহিফেনের যুদ্ধ। চীনারা এবারও শোচনীয়-ভাবে পরাজয় বরণ করলো। পুনরায় দুজনকেই দিতে হলো যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং এবার আরও কয়েকটি শহর হাতছাড়া হয়ে গেল। অসম্মানজনক বহু শর্তও তাকে মানতে হলো। তবু বিদেশীদের বিজ্ঞানকে অনুসরণ করতে আদৌ সচেষ্ট হলো না। ফল হাতে হাতেই ফললো। ধীরে ধীরে বিদেশীরা বিচ্ছিন্ন করতে লাগলো চীনের ভূভাগকে।

শেষ পর্যন্ত চরম আঘাত হানলো প্রাচ্যের ক্ষুদ্র জাপান। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিল লুচু দ্বীপপুঞ্জ। কেবল চীন নয়, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ সেদিন বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়েছিল জাপানের দিকে। মাত্র পঁচিশটি বছর আগে যে দেশের নাম কেউ জানতো না, সে দেশের এত শক্তি কোথায় ছিল?

চীন কিন্তু এত সহজে তার মনোভাব পরিবর্তন করলোনা। অতীতের

কঙ্কালটিকে নিয়ে তবুও নাড়াচাড়া করলো। অবশেষে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের সচিব "জন হে"র মুক্তদ্বার নীতি তার জীর্ণ ও ঘুণধরা কঙ্কালকখানাকে সম্পূর্ণরূপে কবর দিয়ে দিল।

এতদিনে সত্য সত্যই চোখ ফুটলো চীনাদের। প্রথম থেকেই তারা ছিল জাতীয়তাবাদী। দেশের চরম দুর্দিনে তারা ঐক্যবদ্ধ হলো। এবং বিদেশীদের অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের জন্য চারদিকে আরম্ভ হলো বিদ্রোহ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করলো। বহু বিদেশী এবং বিদেশী ধর্ম যাজককে হত্যা করলো বিদ্রোহীরা ধর্মান্তরিত চীনাদেরও তারা রেহাই দিল না। নির্মমভাবে তাদেরও করলো হত্যা। বিদেশী দূতাবাসগুলিকেও জ্বালিয়ে দিল। এবার প্রমাদ গণলো বিদেশী শাসক গোষ্ঠী। তারা সমবেত হয়ে বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হলো। তাদের সুশিক্ষিত সৈন্য বাহিনীদের কাছে মুক্তি সংগ্রামীদের হার মানলো। ব্যর্থ হয়ে গেল চীনের প্রথম গণঅভ্যুত্থান। তথাপি তাঁদের লাভ বড় কম হল না। প্রথমত আমেরিকা, ইংলণ্ড ও জার্মানী প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় চীন সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষা পেলো। দ্বিতীয়ত গণজাগরণ সূচিত হওয়ায় বিজ্ঞান লক্ষীর প্রিয় পরিবেশ রচনা করলো।

দেশের আপামর জনসাধারণ যখন জেগে উঠে তখন তাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যায়না। তাই একদিন বিদেশের প্রচণ্ড শক্তিকেও হার মানতে হলো। বিদ্রোহের মাধ্যমে একদিন চীনের জনসাধারণ মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঘটলো। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী নেতা "সান ইয়াৎ সেন" গঠন করলেন প্রজাতান্ত্রিক সরকার। তারপর থেকে চীনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যেমন ঘন ঘন পরিবর্তন এলো তেমনই বুঝতে পারলো, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আত্মসাৎ করা ছাড়া উপায় নেই। বিশেষতঃ সান ইয়াৎ সেনের সুযোগ্য শিষ্য "চিয়াং কাইশেক" বিদেশী ভাবধারায় পুষ্ট হয়েছিলেন। এতদিনে চীন দেশের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনা হল। বিজ্ঞান শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দান করা হল এবং স্থাপন করা হল বিজ্ঞান গবেষণাগার এবং কলকারখানা। বিদেশী সমরনায়কদের পরিচালনায় চীনে জাতীয় সামরিক বাহিনীও গঠিত হল। দেখতে দেখতে লুপ্ত গৌরব কিছুটা ফিরিয়ে আনলো চীন। তবে জাপান কিংবা পাশ্চাত্যের দেশগুলির মত বিজ্ঞানে এতখানি অগ্রসর সে হতে পারেনি। বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞানে ওরা কিছু কিছু স্থায়ী অবদান রাখতে পেরেছে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনের দুজন বিজ্ঞানী "সুংগু ডাও লেক্" এবং "চেন পিঙ ইয়াং" বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখার জন্য লাভ করেছেন নোবেল পুরস্কার।

৩। নিকট প্রাচ্য—সত্য কথা বলতে কি, প্রাচ্যের বেশিরভাগ দেশকে এককালে ইউরোপের কোন-না-কোন দেশের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হতে হয়েছিল। বিলাসী ও দুর্বল রাজশক্তি ছিল এর মূল কারণ। উনবিংশ শতাব্দীতেই প্রাচ্যে জনজাগরণ আরম্ভ হয় এবং সে জাগরণও এসেছিল পাশ্চাত্যের অনুকরণে। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসী বিদ্রোহই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চোখ খুলে দিয়েছিল। সেই থেকেই সাধারণ মানুষ কঠোর রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে সচেষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের চরম উন্নতিলাভ ঘটে সেই থেকেই। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সর্বস্তরের মানুষের শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ হয়েছিল বলেই উনবিংশ শতাব্দীর আগেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে অনেকখানি এগিয়ে গেছিল। প্রাচ্য তাদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিল নিজেদের দুর্বলতা। শেষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে প্রাচ্যেও বিপ্লব আসে। প্রথম বিপ্লব আসে সুদূর প্রাচ্য জাপানে, তারপর চীনে, তারপর তুরস্ক, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশে।

নতুন তুরস্কের স্রষ্টা হচ্ছেন মুস্তাফা কামাল পাশা। পরাজয়, অপমান, ও লাঞ্ছনা যখন তুর্কীজাতিকে গভীর হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল তখনই তাঁর আবির্ভাব। জাতির চরম অধঃপতনের দিনে তাঁর জাতীয়তাবাদী দল ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদকে পদচ্যুত করে সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে তিনি ভালভাবে পরিচিত হয়েছিলেন বলে প্রথমে তিনি শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য যত্নবান হন। পাশ্চাত্যের অনুকরণে কলকারখানা স্থাপন করেন এবং বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দেন। ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন বলেই কামাল পাশার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। অল্পদিনে তাঁর দেশও লাভ করলো বিজ্ঞান লক্ষ্মীর আশীর্বাদ। আর সঙ্গে সঙ্গেই তুরস্কের চেহারাটাও পরিবর্তিত হয়ে গেল।

প্রথম বিশ্বমহাসমরের পর পারস্যের অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। অনেক আগে থেকে এখানকার খনিজ তেলের লোভে মধু-সন্ধানী ভ্রমরের মত গুন্‌গুন্ করছিল বিদেশীরা। শেষে তাদের বিষাক্ত হুলের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিল পারস্যকে। অবশ্য পারস্যের স্বৈরাচারী ও দুর্বল "শাহ"-রাই ছিল এর জন্য দায়ী। জাতীয় সঙ্কট যখন চরমে পৌঁছায়, ধনুকের মত যখন জাতির মেরুদণ্ডটা বাঁকা হয়ে পড়ে তখনই আবির্ভাব ঘটে মহান জাতীয়তাবাদী নেতা "রিজাশাহ পহ্লবী"র। নবীন তুরস্কের অনুপ্রেরণায় জাতির চরম সঙ্কট-ময় মুহূর্তে তিনি রুখে দাঁড়ালেন। দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে দিলেন

দীক্ষা। দুর্বল রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠা করলেন গণতন্ত্রের। শেষে পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডারকে স্বদেশে বহে এনে নতুন করে গড়ে তুললেন পারস্যকে।

মিশরও ঘুমিয়ে পড়েছিল দীর্ঘকাল। বৈদেশিক আক্রমণ, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ তার অতীতের ভাবমূর্তিকে বিস্মৃত করিয়ে রেখেছিল। পুনরায় দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনেন সৈয়দ জগলুল পাশা। ইংরাজের কঠিন নাগপাশ থেকে দেশকে উদ্ধার করে বিজ্ঞান লক্ষ্মীকে তিনিও সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-চিন্তাকে সঞ্চারিত করলেন দেশবাসীর অন্তরে। মিশরও জেগে উঠলো। তবুও তিনি বৃটিশের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে পারেননি দেশকে। তাঁর মৃত্যুর পর "নাহান পাশা" তাঁর আরব্ধ কাজকে সুসম্পন্ন করেন।

৪। **প্রাচ্যের ভারতবর্ষ**—যেদিন গজনীর সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে জয়পাল প্রতিবেশী রাজাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং পরাজয়ের জালা নিবারণ করতে না পেরে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, সেইদিনই বিজ্ঞানলক্ষ্মী ভারত থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। সেদিনের সেই শতধা বিভক্ত ভারতবর্ষ—যার প্রতিবেশিদের মধ্যে কেবল লেগে থাকতো যুদ্ধ-বিগ্রহ, যার আকাশে বাতাসে সর্বত্র সঞ্চারিত হয়েছিল অর্থলিপ্সা ও রাজ্যলিপ্সা, যেখানে স্বৈরাচারী শাসনচক্রে কেবল নিষ্পেষিত হচ্ছিল সাধারণ মানুষ, বিস্মৃত হয়েছিল প্রেম-প্রীতি-অহিংসা, লেগে থাকতো দুর্ভিক্ষ ও মহামারী—বিজ্ঞানলক্ষ্মী আর সহ্য করতে পারলেন না। মনের দুখে সকলের অগোচরে তাঁর হাজার বছরের প্রিয় বাসভূমিকে পরিত্যাগ করে এগিয়ে গেলেন পাশ্চাত্যের দিকে। তাঁর বিদায় গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিদায়গ্রহণ করলেন যশোলক্ষ্মী ও সৌভাগ্যলক্ষ্মী। দুর্দিনের হল সূচনা। দিল্লীর রাজতক্তে কত রাজা, কত রাজবংশ এল আর গেল। বিলাসব্যসন, হত্যা ও নিষ্ঠুরতার ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হল শত শত বছর। কিন্তু ঐক্য স্থাপন করতে, পরস্পরের মধ্যে বিভেদ দূর করতে কিংবা উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির মেরুদণ্ডটাকে সুগঠিত করতে কেউ একবারও চিন্তা করলো না। তাই দেশে যখনই অল্প-স্বল্প শান্তি স্থাপিত হল, তখন কিছু কিছু শিল্প ও সাহিত্যের চর্চা হলেও বিজ্ঞান চর্চা হল না বা বিজ্ঞানচর্চার পরিমণ্ডলও কেউ তৈরি করলো না। হারিয়ে গেল ভারতবর্ষের সেই উন্নত বিজ্ঞান-চিন্তা।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ভারতবর্ষে আনাগোনা সুরু করলো বিদেশী

বণিক সম্প্রদায়। লুব্ধ দৃষ্টিতে বার বার তাকালো ঐশ্বর্যশালী এই দেশটার দিকে। কিন্তু কেন্দ্রের প্রবল রাজশক্তির দিকে লক্ষ্য করে মনের বাসনা মনে চেপে কেবল ব্যবসাই করতে লাগলো। আর হাজার রকমের চেষ্টায় দু-একটি বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করার অনুমতি পেল।

কেটে গেল আরও কতকাল। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের হল মৃত্যু। তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকায় ভারত-সিংহাসন নিয়ে আরম্ভ হল গোলযোগ। আর ঠিক তখনই কেন্দ্রীয় শাসকের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ঘোষণা করলেন স্বাধীনতা। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল ভারতবর্ষ। ইংরাজেরা যেন এই সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে ছিল। এবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো তারা। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর রণক্ষেত্রে ভারতের গৌরবসূর্য অস্তমিত হল।

আরম্ভ হল বিদেশীদের শাসন ও শোষণ। দেশে নেমে এল চরম দুঃসময়। আপন সভ্যতা ও কৃষ্টি সবই লুণ্ঠিত হল বিদেশীর পায়ের তলায়। পরিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষ যেন আপন মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে বরণ করলো দাসত্বকে। অবশ্য এজন্য দুঃখও বড় একটা কেউ অনুভব করেনি। ভেবেছিল, মহান ইংরাজ সুদূর সাগরপার থেকে এসে অতি কষ্টে ধরে রেখেছে ভারতবর্ষের হাল।

এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, ভারতবর্ষের এমনই ভাগ্য—সেই সুদূর অতীত থেকে এ-দেশে হানা দিয়ে চলেছিল বিদেশীর পর বিদেশী। পণ্ডিতদের মতে, সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টিকারী মানুষ এসেছিল বাহির (?) থেকে। আর্যদের মাতৃভূমি যে ভারতবর্ষ নয়—সেকথা আগেই বলা হয়েছে। আর্যদের পরে গ্রীক, পহ্লব, শক, কুষাণ, হুন, তুর্কী, পাঠান, মোগল প্রভৃতি যে সব রাজ-বংশ ভারতবর্ষ শাসন করে গেছে—তারা কেউই ভারতীয় নয়। তবে এরা ভারতবর্ষে এসেছিল এবং স্থায়ীভাবে বসবাসও করেছিল। দেশের সম্পদ থাকতো দেশে। কেবল সুলতান মামুদ, তৈমুর লঙ, নাদিরশাহ প্রভৃতির মত দুচারজন লুণ্ঠনকামী কিছু কিছু সম্পদকে তাদের দেশে বহে নিয়ে গেছিল। তবে সে সম্পদ ছিল সোনাদানা ও বহুমূল্য রত্ন পাথর। আর ইংরাজরা! সোনাদানা তো বটেই, কয়লা এমনকি লোহা পাথরকেও স্বদেশে বহে নিয়ে গেছে। তথাপি দেশের লোকের ঘুম ভাঙ্গেনি।

কিন্তু এক আশ্চর্য! যে পলাশীর যুদ্ধে ভারতের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল, তার ঠিক পনের বছর পরে এক অখ্যাত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করলেন রাজা রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩)। আরও আশ্চর্য! ভারতের শবদেহে সঞ্জীবনী

বাড়ি সিঞ্চন করে রেনেসাঁস বা নবজাগরণকে ডেকে আনলেন তিনিই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে রামমোহন বুঝতে পারলেন, ইংরাজী ভাষা শিক্ষা না করলে এদেশের মানুষ কিছুতেই জাগরিত হবে না। কোন-দিন ভঙ্গ হবেনা তার মোহনিদ্রা। তাই প্রথমেই তিনি যত্নবান হলেন ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য। দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, পাশ্চাত্যের উন্নত গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা প্রভৃতিকে আয়ত্ত করতে হলে একমাত্র ইংরাজী ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে। তাঁর সংস্কারমুক্ত মন আরও বুঝেছিল, হাজার হাজার বছর ধরে যে সব কুসংস্কারের বেড়াজাল ভারতবাসীকে আবদ্ধ করে ফেলেছে তাকেও না কাটালে জাতির উন্নতি কোনকালেই হবে না। তাই ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও কুসংস্কারগুলোকে বিতাড়িত করার জন্য একা সমগ্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করলেন। মৃদু হেসে বিজ্ঞানলক্ষ্মী তখনই একবার তাকালেন প্রাচ্যের এই ভারতবর্ষের দিকে। রামমোহনকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীতে এল ভারতের জাগরণ।

রামমোহন সেদিন জোরাল কণ্ঠে প্রচার করে ক্ষান্ত হননি, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য নিজব্যয়ে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে "অ্যাংলো স্কুল" নামে একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে দুজন বিদেশীরও নাম করতে হয়। তাঁরা হলেন মহামতি ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও। পাশ্চাত্য ভাবধারা ও শিক্ষা বিস্তারে এঁরা যা করে গেছেন তা ভারতের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ডেভিড হেয়ার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করেছিলেন হিন্দু কলেজ এবং ডিরোজিওর ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল "ইয়ং বেঙ্গল" নামে এক তরুণ সম্প্রদায়—যাঁদের চেষ্টায় ও যত্নে ভারতের জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল।

জাতির জাগরণের মূলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অবদানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি, কোন জাতি দীর্ঘকাল ধরে তার উন্নতিকে অব্যাহত রাখতে পারেনি। কালের গতিতে জাতীয় জীবনে দেখা দেয় জড়তা। কতকগুলো কুসংস্কারে আবদ্ধ করে ফেলে নিজেকে। যখন চরম দুর্দিন আসে, তখনই আবির্ভূত হন মাত্র একজন মহামানব। তাঁর অমৃতময়ী বাণী, সর্বসংস্কার মুক্ত মন, স্পর্শ করে জাতীয় জীবনকে। তখনই জেগে ওঠে জাতি। ভারতের চরম দুঃসময়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব তাই বাঞ্ছিতই ছিল। তিনি ভারতবাসীকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন গৌতমবুদ্ধের বাণী। মানুষকে বোঝালেন, জাতিভেদ ও বর্ণভেদ জাতির পতনের মূল কারণ।

ধর্মের নামে গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিলেন না। বললেন, সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করতে না পারলে ভারতবাসীর মুক্তির উপায় নেই। বিভিন্ন ধর্মমতের সম্বন্ধে বললেন, "সর্বধর্ম সত্য—যত মত তত পথ মাত্র।" ঠাকুরের ঐশীশক্তি সমস্ত মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করলো। মানুষ বিশ্বাস করলো, ঠাকুর স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার—তাঁর কথা মিথ্যা হতে পারেনা। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত গ্লানি এবার ধীরে ধীরে অপসারিত করে বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আগমনকে ত্বরান্বিত করলো।

এই প্রসঙ্গে আরও একজনের নাম করতে হয়। তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ব্রাহ্মণ সন্তান ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও কোন কুসংস্কার তাঁর মনে দানা বাঁধতে পারেনি। পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানকে দেশে বহন করে আনার জন্য ইংরাজী শিক্ষা প্রসারে যত্নবান হয়েছিলেন এবং বহু বিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সত্য কথা বলতে কি, সে সময় বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব না হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হতে হয়ত আরও একশ বছর কেটে যেত। শিক্ষা প্রসারের দ্বারা জাতীয় জাগরণকে ত্বরান্বিত করেছেন তিনিই।

ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীরও উদ্যোগ ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। ভাবটা যেন এই, পরাধীন জাতি—তাদের কেরাণী বিদ্যাই যথেষ্ট। বিজ্ঞান ওদের জন্য নয়। ভারতের প্রথম গণঅভ্যুত্থান সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার ভারতবাসীদের কিছু কিছু সুযোগ দান করলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারে আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করেনি। দেশে ইতিমধ্যে রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রবর্তন হয়েছিল, স্থাপিত হয়েছিল ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা কেন্দ্র। তবুও সে-সব জায়গায় উচ্চপদে ভারতীয়দের কোন অধিকার ছিল না। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং কেরাণী হিসাবেই কেবল দেশীয় লোকদের নিয়োগ করা হতো।

সরকারের ঔদাসীন্য দেখে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কয়েকজন ভারতীয় গভীরভাবে ব্যথা অনুভব করেন। তাঁদের একজন ছিলেন আচার্য মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি দেখলেন, এ-বিষয়ে সরকারকে অনুরোধ-উপরোধ করা একেবারে বৃথা। তাই নিজেই উদ্যোগী হলেন বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপন করতে। এ-বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, আবদুল লতিফ, ভিজিয়ানা গ্রামের জমিদার প্রভৃতি অনেকে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতীয় বিজ্ঞান সভা বা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান সেইদিনই উন্মুক্ত হল ভারতীয়দের কাছে। স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন এই গবেষণাগারে

গবেষণা করেই লাভ করেছিলেন নোবেল পুরস্কার। আজও পর্যন্ত ভারতের অন্য কোন গবেষণাগারের এখন সৌভাগ্য হয়নি। রমন ছাড়া আরও কয়েকজন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী এই গবেষণাগারে গবেষণা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে করিয়া মানিক্যম, শ্রীনিবাস কৃষ্ণান ও ডঃ মেঘনাদ সাহার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়।

পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে যে জোয়ার এসেছিল, তার মূলে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে আশুতোষের অবদান কোনদিনই ভারতের মানুষ ভুলতে পারবে না। আর সেদিন অমিত প্রতিভাধর বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছিল বলেই ভারতবাসীর মনে সাহস এসেছিল। ভারত এতদিনে বুঝতে পেরেছিল, বিজ্ঞানরাজ্যেও এদেশের লোক স্বচ্ছন্দভাবে পদচারণা করতে পারে।

ঋষিকল্প পুরুষ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অবদানের কোন তুলনা হয় না। বিজ্ঞানে তাঁর অবদান এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। তবে তাঁর কৃতিত্ব, তিনি নিজ হাতে গড়েছিলেন একদল তরুণ বিজ্ঞানীকে। ডঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী, ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু, ডঃ প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রমুখ মহান বিজ্ঞানী আচার্য রায়েরই একনিষ্ঠ সাধনার ফল। বস্তুতঃ ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রফুল্লচন্দ্রের অবদানের কোন তুলনা হয় না।

ভারতে তৎকালীন বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারে আর একজনের অবদানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশিষ্ট শিল্পপতি, টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল ওয়ার্কস-এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার জামসেদজী টাটা। শিক্ষা প্রসার ও বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি বহু অর্থ দান করেছিলেন। তাঁরই দানে পুষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করে বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স। ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই গবেষণাগারটির সম্মান অনেকখানি বর্ধিত করেছেন। জামসেদজীর আরও একটি বড় কীর্তি বোম্বাই-এর টাটা হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার স্কিম চালু করা। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামক প্রতিষ্ঠানটিও ভারতের বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। জাতীয় সরকারের উদ্যোগেই এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কলিকাতায় ডঃ মেঘনাদ সাহা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স" একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান গবেষণাগাররূপে পরিচিত।

উপরোক্ত গবেষণাগারগুলি ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত

গবেষণাগারের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতের বুকে বিজ্ঞানের যে বীজ বপন করেছিলেন আজ তা মহীরূহে পরিণত হয়েছে। ভারতের শত শত বিজ্ঞানী গবেষণায়রত আছেন বিভিন্ন গবেষণাগারে। তাঁদের মধ্যে আছেন বিশ্বের প্রথম সারির বহু বিজ্ঞানী। ভারত বিজ্ঞানে অনগ্রসর—একথা আজ আর কেউ বলতে পারবে না। কারিগরি-বিজ্ঞানে গ্রেটব্রিটেনের পরেই তার স্থান। পরমাণু বিষয়ক গবেষণায়ও সে পেছনে পড়ে নেই। ইচ্ছে করলে অনায়াসে দু-চারটে পরমাণু বোমাও তৈরি করতে পারে। কিন্তু বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের দেশ ভারত। সে চায় অহিংসা, শান্তি ও মৈত্রী। বিপজ্জনক পরমাণুবোমাকে নিষিদ্ধ করার জন্য দেশে দেশে জনমত গঠনের জন্য তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। বর্তমানে কারিগরি বিজ্ঞানের যে উন্নত সমারোহ মহাকাশ-বিজ্ঞান, তাতেও উল্লেখ-যোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। বিশ্বের বিজ্ঞানে অগ্রসর যে কোন জাতির মত সেও মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে চলেছে একের পর এক মহাকাশযান। তাছাড়া সৌরশক্তি সম্বন্ধে গবেষণায় পাশ্চাত্যের প্রায় সমকক্ষ।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভারতের স্থান এখন বহু উর্ধ্বে। এ-বিষয়ে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন স্যার ইউ. এন. ব্রহ্মচারী—কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কারের মাধ্যমে। ভারতসন্তান ডঃ ইয়েল্লেপ্রাগদা সুব্বা রাও (আমেরিকা প্রবাসী) অরিওমাইসিন, সুবামাইসিন প্রভৃতি বহু অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কর্তা। শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভারতীয় শল্যচিকিৎসকরা বিশ্বের সমস্ত দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। হৃৎপিণ্ড, চক্ষু, কিডনী প্রভৃতি মানবদেহের অত্যাবশ্যক অঙ্গগুলিকে অধিরোপন প্রণালীতে কৃত্রিমভাবে সংযোজিত করতে ভারতীয় শল্যচিকিৎসকরা আদৌ পশ্চাদ্পদ নন। ক্যান্সারের মত দুরারোগ্য ব্যাধি সম্বন্ধেও বহুজনে গবেষণা করছেন। ক্যান্সার অপারেশানের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করে আন্তর্জাতিক-খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন ডঃ সুবোধ কুমার মিত্র।

রসায়ন-বিজ্ঞানে ভারতের অবদানও বড় কম নয়। মারকিউরাস নাইট্রাইট নামক যৌগটির আবিষ্কর্তা হিসাবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ইলেক্‌ট্রোলাইট সম্বন্ধে গবেষণা ও ফিসারট্রপস পদ্ধতিতে তরল জ্বালানী উৎপাদনে ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ক্যাডমিয়াম ও দস্তার সঙ্কর প্রস্তুতিতে ডঃ পঞ্চানন নিয়োগী, কোলয়ডিয়েল রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, উদ্ভিদকোষ থেকে অ্যাস্করবিক অ্যাসিড নিষ্কাশনে ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ, জৈব যৌগের জটিল অণু সম্বন্ধে গবেষণায় টি. আর শেষাদ্রি, ম্যাগনেটো কেমিস্ট্রিতে ভাটনগর,

প্রভৃতি বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। সংশ্লেষণী পদ্ধতিতে বহু জটিল জৈব যৌগকে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা প্রস্তুত করার ক্ষমতা রাখেন। তেজস্ক্রিয় ধাতু সম্বন্ধেও বহু মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। দক্ষিণ ভারতের মোনাজাইট মৃত্তিকা থেকে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতুকে পৃথক করে কাজে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করছেন।

পদার্থবিজ্ঞানে ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ভারতের অবদান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। "রমন এফেক্ট"-এর জন্য স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন লাভ করেছেন নোবেল পুরস্কার, সূর্যরশ্মিকে বিশ্লেষণ করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন ডঃ মেঘনাদ সাহা, আয়নমণ্ডল সংক্রান্ত গবেষণায় বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন ডঃ শিশির কুমার মিত্র, মহাকাশের নক্ষত্র সম্বন্ধে গবেষণায় এস, চন্দ্রশেখর (আমেরিকা প্রবাসী) নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন, মেসন কণিকা সম্বন্ধে গবেষণায় প্রশংসা অর্জন করেছেন দেবেন্দ্রমোহন বসু, আলোকবিজ্ঞানে কে. এস. কৃষ্ণান, পরমাণুবিজ্ঞানে ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, বেতারতরঙ্গ ও মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণায় আচার্য জগদীশচন্দ্র, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ শিশির কুমার মিত্র ও ডঃ বিক্রম সারাভাই প্রভৃতির খ্যাতিও জগৎজোড়া। পরিসংখ্যানে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের অবদান সারা বিশ্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে। অঙ্কে শ্রীনিবাস রামানুজন এবং ভূতত্ত্বে ডি. এন ওয়াদিয়ার অবদানও বড় কম নয়।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে ও জীববিজ্ঞানে ভারত স্থায়ী কীর্তি স্থাপন করেছে। উদ্ভিদের সম্বন্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশন করেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। ছত্রাক বিজ্ঞানে ডঃ সহায়রাম বসু, জীবাশ্ম সম্বন্ধে গবেষণায় ডঃ বীরবল সাহাণী, গুপ্তবীজী উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণায় পঞ্চানন মাহেশ্বরী প্রভৃতির অবদান বিজ্ঞান কোনদিনই অস্বীকার করতে পারবেন না। ভারতসন্তান হরগোবিন্দ খোরানা (বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী) জীবকোষের গঠন নির্ভুলভাবে পাঠ করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

তবুও বলতে হবে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে যে বিজ্ঞানরথি অস্তমিত হয়েছিল সেটি আটশ বছরেরও অধিককাল পরে সবে উদিত হয়েছে ভারতের পূর্বাকাশে। মধ্যগগনে আসতে এখনও অনেক বিলম্ব। আজ তাই ভারতবাসীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বেড়ে উঠেছে অনেকখানি। যে বিজ্ঞান সচেতনতা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে দানা বেঁধেছে তাকে আরও সক্রিয় করার জন্য জাতিকে সচেষ্ট হতে হবে। বিজ্ঞানের উত্থান-পতনের ইতিহাস থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়

জাতীয়তাবোধ, দেশের অখণ্ডতা, সর্বপ্রকারের কুসংস্কার বর্জন, জাতীয় ঐক্য, প্রেম-প্রীতি-অহিংসা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীর বিকাশ এবং সর্বস্তরের মানুষের প্রতিভা নিয়োজিত না হলে বিজ্ঞানের উন্নতি হয় না। আরও প্রমাণিত হয়, জাতির অগ্রগতির একমাত্র ধারক ও বাহক হচ্ছে বিজ্ঞান। সেই আদিকাল থেকে দেখা যাচ্ছে, যখনই যে দল অথবা জাতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় প্রদান করেছে অথবা বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করেছে তখনই তার হয়েছে জয়জয়কার। বিজ্ঞান বিদায়গ্রহণ করলেই জাতি অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যা বিজ্ঞানচর্চার ঘোরতর পরিপন্থী তা আজও ভারত-বাসীর মনে সযত্নে লালিত হচ্ছে। সেই ঘৃণ্য জাতিভেদ ও উচ্চ-নীচ-ভেদাভেদ সেই ধর্মের নামে কতকগুলো গোঁড়ামি এখনও পরিত্যাগ করতে পারল না। একবার চিন্তাও করে না, জাতিভেদই আর্যসভ্যতার মত এতবড় সর্বগ্রাসী সভ্যতার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। দেশে রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ায় হাজার হাজার বছর বিদেশীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সব হারিয়ে সে আজ নিঃস্ব।

আজ বিংশ শতাব্দীতেও ভারতের শিক্ষিতের হারের কথা শুনলে লজ্জা বোধ হয়। বলতে দ্বিধা নেই, শিক্ষাটা আজ কতকগুলি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জাতির এক বিরাট অংশকে এখনও অস্পৃশ্য আখ্যায় ভূষিত করে রাখা হয়েছে, অভিজাতরা এখনও দরিদ্রের পাশে হাঁটতে লজ্জা বোধ করে, পেশাগত বিরোধ সর্বত্রই বিরাজমান। অনুরূপ পরিবেশ বিজ্ঞানচর্চার সুস্থ পরিবেশ নয়।

তার উপর আছে ধর্মীয় সংস্কার। প্রাচীন ভারতে ধর্ম ছিল চরিত্রগঠন ও মানবসেবার অঙ্গ। সেদিনের দেবতাদেরও দেখতে পাই সেবার জন্য মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতেন। দেবাদিদেব মহাদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি দেবগণ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে সমাজ শাসকগণ দেবতাকে সর্বশক্তিমান কল্পনা করে মানুষের মনে দেবতা সম্বন্ধে যে ভীতির ভাব সঞ্চার করেছিলেন এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সব দায়দায়িত্ব ঈশ্বরের উপর চাপিয়ে দিয়ে সবাইকে নিশ্চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন তার জের এখনও চলছে। ধর্ম অপেক্ষা ধর্মের আচারটা এখনও অনেকের কাছে বড়। পুরুষকার অপেক্ষা অদৃষ্টের প্রতি এখনও আমরা গুরুত্ব আরোপ করে চলেছি। ইহাকে সুন্দর করতে চেষ্টা না করে পরকাল নিয়ে এখনও মাথা ঘামাচ্ছি। আকাশের গ্রহদের প্রভাবকে এড়াতে ওদের ভক্তিভরে পূজা করে চলেছি। নিঃসন্দেহে এগুলি বিজ্ঞানচর্চার সুস্থ পরিবেশ নয়। বিজ্ঞানকে উন্নত করতে এ যুগের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও

মহাপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মত ও পথ দুইই বাৎলে দিয়েছেন। যে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন গ্রীসে সক্রেটিস, ভারতে গৌতমবুদ্ধ, চীনে কনফুশিয়াস, খ্রীষ্টান দুনিয়ায় যীশুখ্রীষ্ট—ইসলাম জগতে হজরত মোহম্মদ—সেই একই পথ। এঁদের মত ও পথকে অবলম্বন করে স্ব-স্ব দেশ সংঘবদ্ধ হয়ে যেমন বিজ্ঞানে প্লাবন এনেছিল, তেমনই ঠাকুরের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখে ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে দূরে সরিয়ে দিয়ে মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারলেই পুনরায় সুদিন আসবে।

বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান শাখার পরিচয়

রসায়ন বিজ্ঞান

প্রাচীন যুগের রসায়ন—বিজ্ঞানের উক্ত শাখাটিতে জড় পদার্থের গঠন, তার গুণ বা ধর্ম, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে তার পরিবর্তন এবং একটি জড়ের উপর অন্য জড় পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়া প্রভৃতি আলোচনা করা হয়। রসায়ন বিজ্ঞানের উৎপত্তি যে কবে—সে কথা আজ আর সঠিকভাবে বলার কোন উপায় নেই। অনেকের মতে বিজ্ঞানের এই শাখাটিরই জন্ম হয়েছিল প্রথমে। মানবসভ্যতার ইতিহাসের দিকেও তাকালে দেখা যায়, সেই আদিযুগে—যেদিন মানুষ যাযাবরের জীবনযাপন করতো সেদিন তার সম্পদ ছিল পশু। পশুর মাংস খেতো, দুধ খেতো, আবার দুধকে দইতে পরিণত করেও খেতো। তাছাড়া সেদিনও শিখেছিল পাকা পাকা মিষ্ট ফলের রসকে পচিয়ে মদ জাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত করতে। রসায়ন বিজ্ঞানের প্রথম অবগুণ্ঠন মোচন হয়েছিল এইভাবে।

ধাতুবিদ্যা অবশ্যই রসায়ন বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন যে-সব নির্দশন পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায়, খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় চারহাজার বছর আগে মানুষ তামা এবং সোনাকে কাজে লাগিয়েছিল। সেদিন মানুষ ভালভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতো না কিংবা বর্ণমালারও হয়ত সৃষ্টি হয়নি। তবে সেদিনের মানুষ তামা এবং সোনাকে কোন আকরিক থেকে নিষ্কাশন করতে পারেনি। মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া যেত বলেই কাজে লাগিয়েছিল। তামাকে ব্যবহার করেছিল অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও ঘর-গৃহস্থালীর জিনিসপত্র প্রস্তুতিতে এবং সোনাকে গ্রহন করেছিল মূল্যবান পদার্থ হিসাবে। মানব সভ্যতার সেই প্রথমস্তর—অর্থাৎ প্রস্তরযুগ থেকে তাম্রযুগে উত্তরণ।

মানুষের চাহিদার কাছে প্রকৃতির মুক্ত তামা যখন প্রায় শেষ হয়ে এলো তখন বাধ্য হয়ে তাকে খোঁজ করতে হলো তামা জাতীয় অন্য কোন পদার্থকে। তাদের অনুসন্ধিৎসার কাছে মাথা হেঁট করতে হল প্রকৃতিকে। মানুষ পুনরায় লাভ করলো টিন ও রূপা। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিনহাজার বছর আগে তামার সঙ্গে টিনকে মিশিয়ে প্রস্তুত করেছিল তামার সঙ্কর ব্রোঞ্জ।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও ধীরে ধীরে বেড়ে চলে। বিশেষতঃ ধাতুর উপযোগিতা থেকে নতুন নতুন ধাতু আবিষ্কারে হয় যত্নবান। সেদিন মানুষের হস্তপদ ছিল পাথরের মত শক্ত ও সুগঠিত। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়

শীত-গ্রীষ্ম কাবু করতে পারতো না, ক্ষুধা-তৃষ্ণায়ও কাহিল হতো না। বুকে তাদের ছিল অসীম সাহস এবং কর্তব্যে ছিল অত্যন্ত কঠোর। বুঝিবা তাদের মনোবলের কাছে পাহাড়ও দু ফাঁক হয়ে যেতো। তাই বিশ্ব প্রকৃতিকে বাধ্য হয়ে ধরা দিতে হয়েছিল। অর্পণ করতে হয়েছিল লোহা এবং সীসাকে।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খ্রীষ্টজন্মের এগারশ' বছর আগে প্রথম লোহা নিষ্কাশন করেছিল দোরীয় নামে এক বর্বর জাতি। তারপর লোহার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময় থেকেই আরম্ভ হয় লৌহযুগ।

লোহা আবিষ্কারের পরে মানুষ কিছু কিছু ধাতব আকরিককে কাজে লাগাতে আরম্ভ করে। সেগুলির মধ্যে হিঙ্গুল বা পারদের একটি অক্সাইড প্রধান। হিঙ্গুল ছাড়া অন্যান্য রঙ-বেরঙের আকরিকগুলিকে সংগ্রহ করে ধাতব ও মাটির পাত্রকে চিত্র বিচিত্র করতো। গুহাগাত্রে অঙ্কিত ছবিকে রঞ্জিত করতো। সেই থেকে নানাবিধ রঞ্জক পদার্থ আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছিল বলেও মনে হয়। যে বস্ত্র তারা বয়ন করতো তাকে রঞ্জিত করলো নানা রঙে। কাপড়কে আবার পরিষ্কার করার জন্য খুঁজে আনলো সাজি-মাটিকে। যারা সাজিমাটি পেলনা তারা বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও পাতার ছাই ব্যবহার করলো বস্ত্র পরিষ্কারের কাজে। রসায়ন বিজ্ঞানে রঞ্জক পদার্থ ও ক্ষারের আবিষ্কারকে কেউ কেউ আবার খ্রীষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগে স্থান দিতে চান। তাঁদের মতে সেসময়ে কাচও আবিষ্কৃত হয়েছিল।

কেউ কেউ মনে করেন, মিশরেই প্রথম প্রণালীবদ্ধভাবে রসায়নের চর্চা হয়েছিল। মিশর সেদিন রসায়ন শাস্ত্রকে বলতো কিমিয়া আর যাঁরা রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা করতেন তাঁদের বলতো কিমিয়াবিদ। পরবর্তীকালে আরব এই বিদ্যার নামকরণ করেছিল অ্যালকেমি। খ্রীষ্টজন্মের বহুপূর্বে চীনও রসায়ন চর্চা সুরু করেছিল।

প্রাচীন ভারতেও রসায়ন চর্চা হতো। কনাদ প্রভৃতি ঋষি পরমাণুর কথা বলে গেছেন। প্রাচীন আয়ুর্বেদ সংহিতাগুলিতে বহু গাছগাছড়ার রস থেকে উপক্ষার প্রস্তুত প্রণালীর বর্ণনা আছে, আর আছে বিভিন্ন ধাতু থেকে প্রাপ্ত ওষুধের কথা। সে যুগে "রস" বলতে ভারতে গাছগাছড়ার ছাল বা পাতাকে পেষণ করে যে তরল পদার্থ পাওয়া যেত তাকে উনানে জ্বাল দিয়ে ক্বাথ তৈরির পদ্ধতিকে বোঝাতো। খ্রীষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত মহর্ষি চরক জরা বা রোগ নাশক ওষুধের নাম রেখেছিলেন রসায়ন।

চরকের পরবর্তীকালে অন্যান্য সভ্যদেশগুলির মত ভারতেও কিমিয়াবিদ্যা

বা অ্যালকেমির প্রসারলাভ ঘটে। অ্যালকেমিস্টরা সিঁদুরকে দহন করে পারদ তৈরি করতেন এবং পারদ থেকে সোনা তৈরির ব্যর্থ প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল ধরে চালিয়েছিলেন। ভারতীয় গবেষকদের মতে, প্রাচীন ভারত নাকি পারদ থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য নামক দুটি মূল্যবান ধাতুকে প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু সেই পদ্ধতিকে আবিষ্কারকরা সম্পূর্ণরূপে গোপন রেখেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে নাগার্জুন সর্বপ্রথম ওষুধের জন্য পারদ-গন্ধক ঘটিত এক ধরনের যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নামকরণ করেছিলেন কজ্জলী। তাঁর আবিষ্কৃত অন্যান্য যৌগিক পদার্থের মধ্যে স্বর্ণসিন্দুর এবং রসসিন্দুর বা মকরধ্বজ নামক পারদের দুটি যৌগ প্রধান। সেদিন নাগার্জুন কিন্তু ওষুধে পারদ ও অন্যান্য ধাতুকে প্রয়োগ করার নাম দিয়েছিলেন রসায়ন। তাই "রসায়ন" কথাটি আজকের দিনের নয়। চরক ও নাগার্জুন ব্যবহৃত পরিভাষা। তাঁরা দুজনে ছিলেন স্ব স্ব কালের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ। চরক উদ্ভাবিত কাথ বা উপক্ষার প্রস্তুত প্রণালী আজও যেমন অব্যাহত আছে, তেমনই আয়ুর্বেদে নাগার্জুন আবিষ্কৃত পারদের যৌগিক-গুলির ব্যবহার কোনদিনই বন্ধ হবে না।

পণ্ডিতদের অনেকের মতে স্বর্ণপ্রসূ যে প্রাচীন গ্রীস—সেখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হলেও রসায়ন সম্বন্ধে তাঁরা এক-রকম নীরব ছিলেন। তাঁরা "হিন্দু রসায়নের" সংস্পর্শে আসার পরই রসায়ন চর্চা আরম্ভ করেন। এবং সভ্যতার শেষের দিকে আলেকজান্দ্রিয়ায় রসায়ন চর্চা শুরু হয়।

প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকরা ঈশ্বর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পৃথিবীর সমূহ বস্তুকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটি মূল পদার্থে বিভক্ত করেছিলেন। তাঁদের মতে পঞ্চভূতে গড়া এই পৃথিবী। এমনকি পৃথিবীর জীব এবং উদ্ভিদ জগৎও এর বাহিরে নয়। পরবর্তীকালে গ্রীক পণ্ডিতগণ মূল পদার্থরূপে মাটি, জল, বায়ু ও অগ্নিকে গণ্য করেছিলেন। কণাদ ও ডিমোক্রিটাস মনে করতেন, পদার্থের সুক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম কণা—যাকে ভাঙ্গা যায় না এবং গড়াও যায় না, তাকেই বলা হয় পরমাণু। প্রকৃতপক্ষে পরমাণুবাদের সূত্রপাত খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্বেই হয়েছে।

মধ্যযুগের রসায়ন—মধ্যযুগে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এক একদল রসায়নবিদের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের বলা হয় অ্যালকেমিস্ট বা কিমিয়াবিদ। কারও কারও মতে এঁরা সবাই ছিলেন তান্ত্রিক সাধু। এঁদের কাজ ছিল, বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার ছাল-পাতা এবং ধাতু ও ধাতব আকরিককে

নিয়ে গবেষণা করা। উদ্দেশ্য ছিল, লোহা প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় পরিণত করার উপায় আবিষ্কার। অর্থাৎ পরশমণির সন্ধান করা। দ্বিতীয় আর একটি প্রচেষ্টা ছিল তাঁদের। তাঁরা চেয়েছিলেন এমন একটি পদার্থ তৈরি করতে—যা খেলে মানুষ অমর হয়ে যাবে। এককথায় "অমৃত" আবিষ্কার করা।

পরশমণি এবং অমৃত, দুটির কোনটিই তাঁরা আবিষ্কার করতে পারেননি। কল্পনার বস্তু চিরকাল কল্পনার মধ্যেই থেকে গেছে। সেই থেকে প্রভাব বিস্তার করে আসছে আজও পর্যন্ত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তাঁদের কল্পনা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে—বিজ্ঞানকে নয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে, তাঁদের সেই কল্পনা রসায়ন বিজ্ঞানকে প্রাচীন স্তর থেকে একেবারে আধুনিক স্তরে এনে ফেলেছে। অমৃত এবং পরশমণির সন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা সেইদিনই প্রস্তুত করেছিলেন ফ্লাস্ক, বেসিন, ক্রুশিবল, বকযন্ত্র, ওয়াটার বাথ, স্যাণ্ডবাথ প্রভৃতি বহু যন্ত্রপাতি। তাছাড়া চোলাই করণ, পাতন, ঊর্ধ্বপাতন প্রভৃতি রসায়নের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিও তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে আমরা আরও লাভ করেছি সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, কোহল, ভিনিগার প্রভৃতির প্রস্তুত প্রণালী। তাই মধ্যযুগে রসায়নবিজ্ঞানে অ্যালকেমিস্টদের অবদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞান—আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে ইউরোপ ভূখণ্ডে। প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ শতাব্দীতেই প্রণালীবদ্ধ রসায়ন বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। এর আগে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপের কতকগুলি দেশে কিমিয়াবিদ্যার প্রসার ঘটেছিল। কথিত আছে, "আর্ণাল্ড অফ ভিল্লোনোভা" নাগার্জুনের মকরধ্বজের মত সর্বরোগহর একধরণের ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে "রেমণ্ডলুলি" এবং "বেকন" নামে দুজন কিমিয়াবিদ পরশপাথর তৈরি করেছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে। তাঁরা যে জিনিসটি আবিষ্কার করেছিলেন সেটিকে পারদে ফেলে দিলে স্বর্ণরেণু উৎপন্ন করতো। কিন্তু আসল জিনিসটি সম্বন্ধে কারও কিছু জানা নেই।

রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথম গবেষণা আরম্ভ করেন রবার্ট বয়েল। তিনিই সর্বপ্রথম গ্যাসের ভৌতধর্ম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষার প্রয়োগ করেন এবং সেই থেকে রসায়নের বিকাশ হয়। তারপরেই বস্তুর উপাদান, ধর্ম এবং অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ বিষয়ক বিদ্যাকেই রসায়ন নামে অভিহিত করা

হয়েছে। সর্বাধুনিক কালে রসায়ন বিজ্ঞান বলতে বোঝায়, যে বিজ্ঞান পদার্থের উপাদান ও গঠন, তাপ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে বস্তুর উপাদানগত স্থায়ী পরিবর্তন এবং দুই বা ততোধিক পদার্থের পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া বিক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে।

রসায়ন বিজ্ঞানকে প্রধান দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়। সেই বিভাগ দুটি হলো, অজৈব রসায়ন ও জৈব রসায়ন। বিভিন্ন জড় বস্তুর উপাদান, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান অজৈব রসায়নের এবং জীবজন্তু ও গাছপালা থেকে প্রাপ্ত বস্তু সংক্রান্ত আলোচনা জৈব রসায়নের অন্তর্ভুক্ত। খনি থেকে যে-সব জিনিস পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জৈব রসায়নের এবং ধাতু ও ধাতব আকরিকগুলি অজৈব রসায়নের আওতায় পড়ে।

অপরপক্ষে অজৈব রসায়নকে অকারবনিক রসায়ন এবং জৈব রসায়নকে কারবনিক রসায়নও বলা হয়। জীব ও উদ্ভিদের মূল উপাদান কারবন বলেই এই ধরনের নামকরণ। রসায়নের প্রধান এই দুটি বিভাগ ছাড়াও আরও কয়েকটি বিভাগ আছে। সেগুলির মধ্যে ভৌত রসায়ন, বৈশ্লেষিক রসায়ন ও ফলিত রসায়নই প্রধান। রসায়ন বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞান এই দুই বিজ্ঞানের সীমারেখায় পড়ে এমন সমূহ তত্ত্ব ভৌত রসায়নের অন্তর্গত। বৈশ্লেষিক রসায়নের বিষয়বস্তু হলো, বিভিন্ন ধাতুর অবস্থিতি নির্ণয়, পৃথকীকরণ প্রভৃতি। আর শিল্প উৎপাদন জনিত যে রসায়ন তাকেই বলা হয় ফলিত রসায়ন।

রসায়নের কয়েকটি ধারণার উৎপত্তি ও বিকাশ

জৈব পদার্থ—অতি প্রাচীনকালে মানুষ কতকগুলি জৈব যৌগিক পদার্থকে ব্যবহার করতো। সেদিন তারাও খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতো তেল, ঘি, মাখনকে। কেশে ও অঙ্গে সুগন্ধি লেপন করে প্রসাধনও সম্পন্ন করতো। সুগন্ধি পদার্থকে প্রস্তুত করতে সেদিন অবশ্য তারা রসায়নের দ্বারস্থ হয়নি। ফুলের রেণু, কুঙ্কুম, চন্দন, কস্তুরী প্রভৃতি প্রাকৃতিক জিনিসকে তারা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতো। জীবদেহ ও উদ্ভিদ দেহ থেকে এগুলি সংগৃহীত হত বলে সেইদিনই ওদের নামকরণ হয়েছিল জৈব পদার্থ। আর অতীতের মানুষ লবণ, ফটকিরি, চুন, অ্যাসিড, ক্ষার প্রভৃতিকে জড়বস্তু থেকে লাভ করতো বলে নাম দিয়েছিল অজৈব পদার্থ।

বহুদিন পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল, জৈব পদার্থগুলি প্রকৃত জাত। এ-

গুলিকে মানুষ কোনমতেই প্রস্তুত করতে পারে না এবং কোনকালে পারবে নাও। কলা, আম, কাঁঠাল, আনারস প্রভৃতি পাকলে সুগন্ধি ছড়ায়, প্রস্ফুটিত ফুল, লেবু, ইউক্যালিপটাসের মধুর ও মনমাতানো গন্ধ, জীবদেহের মূত্র, রক্ত প্রভৃতিকে কী মানুষ কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করতে পারে? এগুলি যে ঈশ্বরের অবদান!

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উক্ত ধারণার মধ্যে এল সামান্য পরিবর্তন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ল্যাভোসিয়ারই প্রথম জৈব যৌগকে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হলেন। তিনি জানালেন, জৈব যৌগের-উপাদানগুলির মধ্যে কারবন এবং হাইড্রোজেন নামক দুটি মৌলিক পদার্থ অবশ্য বিদ্যমান।

ল্যাভোসিয়ারের গবেষণা একাধিক বিজ্ঞানীকে উৎসাহিত করে। তাঁরাও এবার এগিয়ে এলেন জৈব যৌগকে বিশ্লেষণ করতে। শেষে তাঁরা জানতে পারলেন, জৈব যৌগে কারবন ও হাইড্রোজেন ছাড়াও নাইট্রোজেন, সালফার, অক্সিজেন, ফসফরাস প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ থাকতে পারে। তাঁরা যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, তা থেকে আরও ধরা পড়লো, পৃথিবীতে কারবন ও হাইড্রোজেন এবং কারবন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের দ্বারা গঠিত জৈব যৌগের সংখ্যাই সর্বাধিক। তবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত সমস্ত বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল, প্রাণশক্তি ব্যতীত জৈব যৌগ প্রস্তুত হতে পারে না।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ। জৈব রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। উইলার নামে ১৮ বছরের এক তরুণ বিজ্ঞানী গবেষণাগারে গবেষণা করতে করতে হঠাৎ একদিন লাভ করলেন "ইউরিয়া" নামক একটি জৈব যৌগ। এই ইউরিয়াকে পাওয়া যায় স্তন্যপায়ী প্রাণীর মূত্রে। অথচ উইলার লাভ করলেন অ্যামোনিয়াম সায়ানেট নামক একটি অজৈব বস্তুকে উত্তপ্ত করে। প্রথমে তিনি নিজেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। শেষে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, জৈব যৌগকেও মানুষ কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করতে পারে।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা সহজে স্বীকার করলেন না উইলারের কথা। বিজ্ঞানীদের সেদিন জোরালো যুক্তি ছিল, অ্যামোনিয়াম সায়ানেট অজৈব বস্তু হলেও উইলার অ্যামোনিয়াম সায়ানেটের উপাদান অ্যামোনিয়া ও সায়ানিক অ্যাসিড গ্রহণ করেছিলেন প্রাণীজগৎ থেকে। উইলার হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন ঐখানেই। তা সত্ত্বেও উইলারের পরীক্ষা প্রভাবিত করেছিল অনেককেই। তাঁরা এবার চেষ্টা করলেন, সম্পূর্ণ অজৈব যে যৌগ—তা থেকে জৈব পদার্থ তৈরি করতে। প্রথমে কৃতকার্য হলেন "কোলবে" নামে এক বিজ্ঞানী। ১৮৪৫

খ্রীষ্টাব্দে সংশ্লেষণী পদ্ধতিতে তিনি তৈরি করে ফেললেন অ্যাসিটিক অ্যাসিড। তারপর বার্থোলে কারবন ও হাইড্রোজেনকে যুক্ত করে তৈরি করলেন মিথেন গ্যাস। কোন কোন বিজ্ঞানী সন্ধান ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ অজৈব পদার্থকে যোগ করেও সুফললাভ করলেন। তথনই পরিবর্তিত হল প্রাচীন ধারণা। মানুষের এতদিনে বিশ্বাস হল, প্রাণশক্তির সাহায্য ব্যতীত জৈব যৌগগুলিকে প্রস্তুত করা সম্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে জৈব রসায়ন সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গবেষণা শুরু হয়। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, জৈব যৌগের আনবিক সঙ্কেত অজৈব যৌগের মত নির্দিষ্ট নয়। একই আনবিক সঙ্কেত দ্বারা বহু সংখ্যক জৈব যৌগকে প্রকাশ করা যায়। যেমন C_2H_6O সঙ্কেত দ্বারা দুটি, C_6H_{14} সঙ্কেত দ্বারা ৫টি, $C_{10}H_{18}O_3N$ সঙ্কেত দ্বারা ১৩৫টি জৈব যৌগকে নির্দেশ করে ইত্যাদি।

আবার কারবন পরমাণুগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে অতিকায় ও জটিল অণু গঠন করতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে ঐ অতিকায় ও জটিল অণুগুলিকে নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং এখনও সে গবেষণা অব্যাহত আছে। তাই বর্তমান শতাব্দীতে কৃত্রিমভাবে বহু জটিল অণুর সৃষ্টি করে বিজ্ঞানীরা শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছেন। কৃত্রিম রেশম, সেলুলয়েড, প্লাষ্টিক, টেরিলিন, নাইলন প্রভৃতি বস্তুর আবিষ্কার ঐ জটিল অণু সম্বন্ধে গবেষণার পরোক্ষ ফল। তাছাড়া মানুষ এখন কুইনাইন, নীলরঙ, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন, বহু ওষুধ-পত্র উদ্ভিদের কাছ থেকে গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করছে। এখন দেখা গেছে, সব রকমের জৈব যৌগকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব—এমনকি প্রোটিনকেও।

জৈব যৌগ সম্বন্ধে গবেষণা চিকিৎসা ক্ষেত্রেও যুগান্তর আনয়ন করেছে। পেনিসিলিন ও অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক জৈব রসায়নেরই অবদান। তাই বলা যেতে পারে, জৈব রসায়ন সংক্রান্ত গবেষণা মানুষের অকাল মৃত্যুকেও রুদ্ধ করেছে। কৃত্রিমভাবে বিজ্ঞানীরা এমন সব খাদ্যও প্রস্তুত করেছেন—যার সামান্য অংশ গ্রহণ করলেই শরীরের প্রয়োজনীয় আমিষ, শর্করা ও স্নেহজাতীয় পদার্থ ও ভিটামিন সরবরাহ করতে পারে। অধিক খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

বর্তমানে আবার প্রাণের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে মানুষ জীবকোষের মধ্যে আবিষ্কার করেছে কতকগুলি জটিল জৈব যৌগকে। সেগুলিকে নির্ভুলভাবে পাঠ করে জেনে নিয়েছে জীবনের রহস্য। সেই জৈব যৌগগুলির

অধিকাংশকে আবার কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করতেও সক্ষম হয়েছে। তাই আজ প্রাণ বিজ্ঞানের সঙ্গে জৈব রসায়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছে। মানুষ এখন আশা করছে, অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র জীবকোষ তৈরি করতে সক্ষম হবে না—গবেষণাগারে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবশিশুকেও সম্পূর্ণ কৃত্রিমভাবে উৎপাদন করবে।

মিশ্র ও যৌগিক পদার্থ—পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে কিমিয়াবিদরা পরশপাথর খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থতা বরণ করেছিলেন। সোনা, রূপা, তামা, টিন, লোহা, পারদ, গন্ধক প্রভৃতি পদার্থগুলিকে নিয়ে দীর্ঘকাল তাঁরা গবেষণা করেছিলেন বলে সেই সময়ই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, এই পদার্থগুলিকে ভাঙ্গলে বা বিশ্লেষণ করলে কেবল ঐ পদার্থ ছাড়া অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না। তাই ঐ পদার্থগুলির তখনই তাঁরা নামকরণ করেছিলেন মূল পদার্থ। আরও তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, পৃথিবীতে মূল পদার্থের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এদের দুটি, তিনটি বা তারও অধিক সংখ্যায় যুক্ত হয়ে অসংখ্য বস্তু তৈরি করেছে। অর্থাৎ পৃথিবীর যে বিশাল বস্তুজগৎ—তার মূলে আছে মাত্র কয়েকটি মূল পদার্থ।

প্রকৃতপক্ষে মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থের ধারণা ঐ কিমিয়াবিদরা প্রদান করেছিলেন। তবে তাঁদের আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থের সংখ্যা খুব বেশি নয়। আমাদের অতি পরিচিত কতকগুলি ধাতুকেই মাত্র তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। বর্তমানে আমরা একশ' তিন-এর মত মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছি। তাদের মধ্যে স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায় হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন এবং হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন প্রভৃতি কয়েকটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমেত মোট ১১টি গ্যাসীয় পদার্থ। ব্রোমিন ও পারদ—এই দুটি মাত্র তরল পদার্থ, বাকি ৯০টি কঠিন পদার্থ। ঐ ৯০টির মধ্যে আবার সবগুলিকে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। অনেকগুলিকে বর্তমান শতাব্দীতে প্রস্তুত করা হয়েছে সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে।

যৌগিক পদার্থ এবং মিশ্র পদার্থ সম্বন্ধে ধারণাও গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগে অ্যালকেমিস্টদের মধ্যে। সেকালে তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, দুই বা ততোধিক পদার্থ একে অপরের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে মিশে গেলেও যদি তাদের স্ব স্ব ধর্ম বজায় থাকে তাহলে তাকে বলা হয় মিশ্র পদার্থ। ওরা মিশে গিয়ে যদি সম্পূর্ণ নতুন ধর্মবিশিষ্ট কোন পদার্থ উৎপন্ন করে তাহলে তাকে বলা হয় যৌগিক পদার্থ। মোটামুটিভাবে মিশ্র পদার্থ ও যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে সেদিনের ধারণা আজও চলে আসছে।

দহন—পদার্থের দহন সম্পর্কে প্রাচীন আমল থেকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ধারণা বিজ্ঞানীদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। আজকের চোখে সেইসব ধারণাগুলি হাস্যাস্পদ বলে মনে হতে পারে। তবুও বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে প্রাচীন ভুল তত্ত্বের অবদানও কিছু কম নয়। কারণ, বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি তত্ত্বকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে একাধিক মূল্যবান তথ্য। বিশাল রোম সাম্রাজ্য যেমন একদিনে গড়ে উঠেনি, তেমনই আজকের বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ইমারতীও একদিনে অথবা এক আধ বছরে গঠিত হয়নি। তার মূলে আছে সহস্র সহস্র বছরে উদ্ভাবিত বহু তথ্য। সেগুলির মধ্যে অবশ্যই কিছু কিছু ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল। তবে যুক্তি কিছু ছিল। তা না হলে সেটি বৈজ্ঞানিক তথ্যরূপে আখ্যা লাভ করতো না।

অপরদিকে বিজ্ঞানের এমন কিছু কিছু সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে—যে সত্যগুলির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল কতকগুলো ভুল সিদ্ধান্তের উপর। বস্তুর দহন-সংক্রান্ত তথ্যগুলি তাদের মধ্যে অন্যতম।

প্রাচীনকালে বিজ্ঞানের কোন শাখাই যখন পুষ্ট হয়নি এবং মানুষ যখন বাস্তব পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ব্যতীত কেবল মনগড়া কাহিনীকে খাড়া করে ব্যাখ্যা করতে চাইতো তখন ধারণা করেছিল, কাঠ পুড়লে তার ভেতর থেকে প্রেতাত্মা বেরিয়ে আসে। ফলে কাঠটা ছাইতে পরিণত হয়ে যায়। দহন সম্বন্ধে অ্যারিস্তোতলের মত ছিল, প্রত্যেক দাহ্য বস্তুর উপাদান ছাই ও আগুন। দহনের ফলে আগুনটা বেরিয়ে আসে আর অবশেষ রূপে পড়ে থাকে ছাই।

অ্যারিস্তোতলের মতবাদই দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে "জন বেকর" নামে এক বিজ্ঞানী আগুন সম্বন্ধে একটা নতুন মতবাদ প্রচার করলেন। তিনি বললেন, দাহ্য বস্তুর মধ্যে এমন এক উপাদান আছে—যা বস্তুকে জ্বলতে সাহায্য করে। বেকরের এই মতবাদকে সমর্থন করে "স্টাল" নামে এক বিজ্ঞানী ফ্লোজিস্টন মতবাদ প্রচার করলেন। তিনি বললেন, দাহ্য বস্তুর মধ্যে যে উপাদানটি জ্বলতে সাহায্য করে সেটির নাম ফ্লোজিস্টন। ফ্লোজিস্টনকে দেখা যায় না, এমনকি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভবও করা যায় না। অগ্নিশিখার আকারে যখন বেরিয়ে আসে তখনই আমরা দেখতে পাই। তিনি আরও ঘোষণা করেন, ফ্লোজিস্টনের পরিমাণ সব পদার্থে সমান থাকে না। কয়লা, তেল প্রভৃতি দাহ্য বস্তুতে এর পরিমাণ সর্বাধিক। সোনা, রূপা, লোহা প্রভৃতি ধাতব পদার্থে এর পরিমাণ নিতান্তই অল্প। কাঠকে পুড়িয়ে ফেললে যে অবশেষটুকু পড়ে থাকে সেটি ফ্লোজিস্টনহীন বস্তু বা ছাই। ফ্লোজিস্টন অপসারিত হওয়ার পর বস্তুর ওজন সর্বক্ষেত্রেই কম হবে।

প্রায় দেড়শ বছর ধরে ফ্লোজিস্টন ভূত বিজ্ঞানীদের ঘাড়ে ভর করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞানী ল্যাভোসিয়ারের প্রচেষ্টায় ঐ ভূতটা নেমে যায়। তিনি টিন, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ধাতুকে বাতাসে পুড়িয়ে যে ছাই পেয়েছিলেন তাকে ওজন করে হতভম্ব হয়ে গেছিলেন সেদিন। সর্বক্ষেত্রেই দেখেছিলেন মূলবস্তু অপেক্ষা ছাইর ওজন বেশি। ল্যাভোসিয়ারের দেখাদেখি শীলে এবং প্রিস্টলীও পরীক্ষাগুলি করেছিলেন। তাঁরাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেন, বায়ুতে কোন পদার্থের দহনের সময় বায়ুর অক্সিজেন ঐ পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়। ধাতুতে যুক্ত হলে ধাতব অক্সাইড গঠিত হয় বলে ওজন বেড়ে যায় এবং কাঠ, কয়লা প্রভৃতি দাহ্য বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হলে বস্তুতে অবস্থিত কারবন ও হাইড্রোজেন, কারবন ডাই অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প নামক দুটি অদৃশ্য গ্যাস উৎপন্ন করে। ঐ গ্যাসগুলি উৎপন্ন হয়ে বায়ুতে মিশে যায়। ফলে যে ছাই পড়ে থাকে তার ওজন কম হয়।

ল্যাভোসিয়ার, শীলে এবং প্রিস্টলীর দহন সম্বন্ধে প্রদত্ত তত্ত্ব এখনও স্বীকার করা হয়।

পরমাণু—গ্রীক ডিমোক্রিটাস ও ভারতীয় মনীষী কণাদ সর্বপ্রথম বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর অন্তিম কণাকে পরমাণু নাম দিয়েছিলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী জন ডালটনই দার্শনিকদের পরমাণুবাদকে সংশোধিত করে সুস্পষ্টরূপ দান করেন। তিনি যে মতবাদটি প্রচার করেন সেই মতবাদটি বিজ্ঞানে 'পরমাণুবাদ' নামে প্রসিদ্ধ। এইমতে বিশ্বের প্রতিটি পদার্থ অসংখ্য ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা দিয়ে গঠিত। অর্থাৎ কোন পদার্থকে ক্রমাগত ভাঙতে থাকলে এমন একটি অবস্থায় আনবে যখন আর তাকে ভাঙা যাবে না। পদার্থের সেই অন্তিম কণাকে ডালটন নাম দিয়েছিলেন পরমাণু। তিনি আরও বলেছিলেন, প্রতিটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা ওজনে ও ধর্মে এক এবং বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা ওজনে ও ধর্মে বিভিন্ন। মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলো বিভিন্ন অনুপাতে যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ গঠন করে।

ডালটনের পরমাণুবাদ বিজ্ঞানীরা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরের দিকে দেখা গেল, পরমাণুবাদ পদার্থ জগতের সব তথ্য ব্যাখ্যা করতে পারে না। তখনই প্রবর্তিত হয় অনুবাদ। অণুবাদের যিনি স্রষ্টা—তিনি ইতালির প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী অ্যামদেও অ্যাভোগেড্রো। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম উল্লেখ করেন, মৌলিক অথবা যৌগিক পদার্থের অন্তিম কণা পরমাণু নয়—অণু। পদার্থের গুণ বা ধর্ম কেবলমাত্র অণুর মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। অণুকে ভাঙলেই পাওয়া যাবে পরমাণু। এই অবস্থায় মূল পদার্থের ধর্ম বজায় থাকে না।

ডালটন ও অ্যাভোগেড্রোর পরমাণুবাদ ও অনুবাদ দুটিকেই বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে এসেছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানীরা ক্যাথডরশ্মি সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণাকালে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা লক্ষ্য করেন। তারপরে বেকারেল, কুরি দম্পতি প্রভৃতির গবেষণার ফলে আত্মপ্রকাশ করে ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি কতকগুলি তেজস্ক্রিয় ধাতু। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন, আলো অথবা অন্ধকারে সর্বাবস্থায় এদের দেহ থেকে এক ধরণের রশ্মি নির্গত হয়। আবার কিছুকাল এইভাবে রশ্মি নির্গমনের পর ধাতুটি সাধারণ ধাতু সীসাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এতদিনে বিজ্ঞানীরা পরমাণুকে নিয়ে পুনরায় ভাবতে শুরু করেন এবং পুরোদমে আরম্ভ হল গবেষণা। সেই গবেষণা থেকে রাদারফোর্ড সন্ধান পেলেন ধনাত্মক কণার, জে. জে. টমসন আবিষ্কার করলেন ঋণাত্মক কণা ইলেকট্রন, জেমস চ্যাডউইক আবিষ্কার করলেন নিস্তড়িৎ কণা নিউট্রন। রাদারফোর্ড প্রভৃতি বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে এতদিনে প্রকাশ পেল, পরমাণু অবিভাজ্য কণা নয়। তার মধ্যস্থলে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রকে পিণ্ডাবদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করে প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কণিকা এবং নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে পরিভ্রমণরত ইলেকট্রন। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে আরও প্রকাশ পেয়েছে বহু তথ্য। কত মৌলিক কণিকাও আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু পরমাণু সম্বন্ধে গবেষণা আজও অব্যাহত আছে। হয়ত ভবিষ্যতে আরও বহু তথ্য আবিষ্কৃত হবে।

রসায়ন বিজ্ঞানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার

সোনা ও তামা—খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দেরও আগে।

টিন, ব্রোঞ্জ ও রূপা—খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের পরে।

লোহা—খ্রীঃ পূঃ ১১০০ অব্দের দিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু হয়।

সালফার ডাই অক্সাইড ও সালফার—প্রাগৈতিকহাসিক যুগের আবিষ্কার। হোমারের বর্ণনায় গন্ধকের উল্লেখ আছে। সেকালেও সালফারের ধোঁয়া জীবাণুনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হতো। বলাবাহুল্য ঐ ধোঁয়াটি সালফার ডাই অক্সাইড।

সালফিউরিক অ্যাসিড—অ্যালকেমিস্টরা ফেরাস সালফেট নামক আকরিকটিকে পাতিত করে প্রথমে উক্ত অ্যাসিডটি তৈরি করেছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস। যেহেতু ফেরাস সালফেটের প্রাচীন নাম গ্রীন ভিট্রিয়ল।

তাই অ্যাসিডটিকে তখন বলা হতো ভিট্রিয়লের তেল। ঐ একই পদ্ধতিতে আরবের রসায়ন বিজ্ঞানী জবির ইবন হাইয়ানও অ্যাসিডটিকে তৈরি করেছিলেন।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড—মধ্যযুগে কিমিয়াবিদদের অবদান।

পারদ—আবিষ্কর্তা মধ্যযুগের কিমিয়াবিদরা। পারদের সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞানী নাগার্জুনের নাম জড়িত।

বোরিক অ্যাসিড—রোমান আমলের আবিষ্কার। সেকালে মৃৎশিল্পে ঐ অ্যাসিডটিকে ব্যবহার করা হতো।

নাইট্রিক অ্যাসিড—সোরা, হীরাকস বা ফেরাস সালফেট ও ফটকিরিকে একসঙ্গে পাতিত করে আরবীয় বিজ্ঞানী জবির ইবন হাইয়ান প্রথম প্রস্তুত করেছিলেন।

কাচ—খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দেরও পূর্বের আবিষ্কার।

কাগজ—১০৫ খ্রীষ্টাব্দে সাইলুন নামে এক চীনা প্রযুক্তিবিদ আবিষ্কার করেন।

বারুদ—খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনারা আবিষ্কার করে।

পোরসিলিন—৬২০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে আবিষ্কৃত হয়।

অ্যামোনিয়া—অ্যামোনিয়ার সঙ্গে মানুষের প্রাচীনকাল থেকে পরিচয়। মধ্যযুগে উটের মল পুড়িয়ে অ্যামোনিয়া তৈরি করা হতো।

ইস্পাত—খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময়ে ভারত আবিষ্কার করেছিল।

উপক্ষার প্রস্তুতি—খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে ভারতের আবিষ্কার।

ঢালাই লোহা—খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে চীন আবিষ্কার করে।

পারদ-গন্ধক ঘটিত যৌগ—খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ভারতীয় বিজ্ঞানী নাগার্জুন আবিষ্কার করেন।

সাল অনুযায়ী কতকগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আবিষ্কার

১৬৩০—ভন হেলমণ্ট কর্তৃক কারবন ডাই অক্সাইড আবিষ্কৃত হয়েছে।

১৬৪৮—জার্মান বিজ্ঞানী গ্লবার প্রথম সালফিউরিক অ্যাসিড ও লবণকে একত্রে উত্তপ্ত করে হাইড্রোক্লোরিক অম্ল তৈরি করেন। অবশ্য উক্ত নামকরণটি বিজ্ঞানী ডেভির।

১৬৫০—আইরিশ বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল গ্যাসসূত্র আবিষ্কার করেন।

১৬৬৪—রবার্ট বয়েল অ্যাসিডের ধর্ম বিশ্লেষণ করেন।

১৬৬৬—লেমারি নামে এক বিজ্ঞানী সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করেন।

১৬৬৯—জার্মানবিজ্ঞানী ব্রাণ্ড ফসফরাস আবিষ্কার করেন।

১৬৮০—রবার্ট বয়েল বৃহদায়তন পদ্ধতিতে ফসফরাস প্রস্তুত করেন।

১৬৯৫—নেথানিয়েল গ্রু ইপসামের খনিজ জল থেকে ইপসাম সল্ট আবিষ্কার করেন।

১৭০৭—বিজ্ঞানী ষ্টিফেন রসায়নাগারে হাইড্রোক্লোরিক অম্ল তৈরি করেন।

১৭৫৪—ইংরাজ বিজ্ঞানী জোসেফ ব্লাক কারবন ডাই অক্সাইডের ধর্ম সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন।

১৭৬৬—ইংরাজ বিজ্ঞানী হেনরি ক্যাভেনডিস ছিবড়ে দস্তা ও পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিডের সংযোগে রসায়নাগারে হাইড্রোজেন প্রস্তুত করেন।

১৭৬৯—ইথিলিন আবিষ্কৃত হয়েছে।

১৭৭১—সুইডিশ বিজ্ঞানী শীলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করেন।

১৭৭২—(১) শীলে মারকিউরিক অক্সাইডকে উত্তপ্ত করে অক্সিজেন প্রস্তুত করেন।

(২) প্রিস্টলী কারবন ডাই অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করেন।

১৭৭৪—(১) ফরাসী বিজ্ঞানী অ্যান্টনী লরেন্স ল্যাভোসিয়ার বস্তুর নিত্যতা সূত্র প্রমাণ করেন। (২) শীলে ক্লোরিন গ্যাস প্রস্তুত করেন।

১৭৭৭—(১) ল্যাভোসিয়ার সালফারের ধর্ম সম্বন্ধে আভাস দেন এবং প্রমাণ করেন বায়ুর উপাদানগুলির মধ্যে অক্সিজেন একটি। (২) শীলে হাড় থেকে ফসফরাস প্রস্তুত করেন।

১৭৮১—ক্যাভেন্ডিস প্রমাণ করেন যে, জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগ।

১৭৮৫—ফরাসী বিজ্ঞানী বার্থোলে প্রমাণ করেন যে, অ্যামোনিয়া গ্যাসটি নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের যৌগ।

১৭৯২—(১) ইংরাজ বিজ্ঞানী চার্লস হোপ ষ্ট্রনসিয়াম আবিষ্কার করেন। (২) জার্মান বিজ্ঞানী রিখটার মিথোতুপাত সূত্র আবিষ্কার করেন।

১৭৯৮—ফরাসী বিজ্ঞানী প্রাউস্ট স্থিরানুপাত সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮০৩—(১) ইংরাজ বিজ্ঞানী জন ডালটন দ্বারা গুণানুপাত সূত্র আবিষ্কৃত হয়। (২) ইংরাজ বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভি ক্যালসিয়াম আবিষ্কার করেন।

১৮০৭—ডেভি বিগলিত কষ্টিক সোডাকে তড়িৎদ্বারা বিশ্লিষ্ট করে

সোডিয়াম নামক ধাতুটি আবিষ্কার করেন।

১৮০৮—(১) ফরাসী বিজ্ঞানী জোসেফ লুই গে-লুসাক গ্যাস আয়তনিক সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করেন। (২) ডেভি অবিশুদ্ধ ম্যাগনেসিয়াম প্রস্তুত করেন। (৩) থেনার্ড হাইড্রোজেন পার অক্সাইড প্রস্তুত করেন।

১৮১০—(১) ডেভি ক্লোরিণ গ্যাসের "ক্লোরিন". নামকরণ করেন (২) হোলকার যে পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করেন সেই পদ্ধতির অনুকরণে লেড চেম্বার পদ্ধতি হয়েছে।

১৮১১—ইতালিয় বিজ্ঞানী অ্যামদেও অ্যাভোগেড্রো অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৮১২—ফরাসী বিজ্ঞানী কুর্তোয়া আয়োডিন আবিষ্কার করেন।

১৮১৮—ডেভি পটাসিয়াম আবিষ্কার করেন।

১৮২৫—ইংরাজ বিজ্ঞানী জেনি ওয়াকার দেয়াশলাই আবিষ্কার করেন।

১৮২৬—ব্যালার্ড ব্রোমিন আবিষ্কার করেন।

১৮২৮—জার্মান বিজ্ঞানী উইলার কর্তৃক কৃত্রিমভাবে ইউরিয়া আবিষ্কৃত হয়।

১৮২৯—উইলার তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ফসফরাস প্রস্তুত করেন।

১৮৩৩—ইংরাজ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে তড়িৎ বিশ্লেষণের সূত্রাবলী আবিষ্কার করেন।

১৮৩৬—ডেভি রসায়নাগারে অ্যাসিটিলিন গ্যাস প্রস্তুত করেন।

১৮৩৯—মার্কিন বিজ্ঞানী জি, গুডইয়ার ভালকানাইজড রবার প্রস্তুত করেন।

১৮৪৫—ইংরাজ প্রযুক্তিবিদ অ্যাসপডিন পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট প্রস্তুত করেন।

১৮৪৮—আইরিশ বিজ্ঞানী টমসন তাপমাত্রার পরম স্কেল প্রবর্তন করেন।

১৮৫৬—স্যার এইচ, বেসিমার (ইংরাজ) বেসিমার কনভার্টার আবিষ্কার করেন।

১৮৫৮—স্ট্যানি সলাও ক্যানিজারো (ইতালী) পারমাণবিক ওজন নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

১৮৬৬—আলফ্রেড বার্নাড নোবেল (সুইডিশ) ডিনামাইট আবিষ্কার করেন।

১৮৬৯—ডিমিট্রি ইভানোভিচ মেণ্ডালিয়ভ (রাশিয়া) পর্যায়সারণীর প্রস্তাব করেন।

১৮৭০—জোহন ডাব্লু হেয়াট (মার্কিন) সেলুলয়েড আবিষ্কার করেন।

১৮৮৩—সোয়েন (ইংরাজ) রেয়ন আবিষ্কার করেন।

১৮৮৬—(১) চার্লস মার্টিন হল (আমেরিকা) অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের আধুনিক পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। (২) হেনরি ময়সাঁ (ফ্রান্স) ফ্লোরিন প্রস্তুত করেন। ঐজন্য ১৯০৬ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

১৮৮৭—আর হেনিয়াস (সুইডিশ) তড়িৎ বিয়োজন বাদ প্রকাশ করেন। ঐজন্য তিনি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৮৯৩—হফম্যান (অষ্ট্রিয়া) কোক ওভেন আবিষ্কার করেন।

১৮৯৫—জলের তৌলিক গঠন নির্ণয় করেন মোরলে।

১৮৯৬—অ্যাণ্টনি হেনরি বেকারেল (ফ্রান্স) ইউরেনিয়াম লবনের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন।

১৮৯৮—(১) র‍্যামজের দ্বারা কতকগুলি নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কৃত হয়। (২) পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার করেন মাদামকুরী ও পিয়েরেকুরী।

১৯০১—কেমিক্যাল ডায়নোমিকসের সূত্র আবিষ্কারের জন্য জে, এইচ, ভণ্টহফ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। (নেদারল্যাণ্ড)

১৯০২—সুগার ও পিউরিন আবিষ্কারের জন্য এমিল ফিসার নোবেল পুরস্কার পান। (জার্মানী)

১৯০৩—তেজস্ক্রিয় পদার্থের রশ্মি বিকিরণের সময় যে হিলিয়াম উৎপন্ন হয়, এই সত্যটি প্রমাণ করেন উইলিয়ম র‍্যামজে ও ফ্রেডরিক সোডি (উভয়ে ইংরাজ)।

১৯০৪—র‍্যামজেকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৯০৭—(১) সেল ফ্রি ফার্মেনটেশন পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য বুকনার (জার্মানী) নোবেল জয়ী হন।

(২) এল, এইচ, ব্যাকল্যাণ্ড (মার্কিন) ব্যাকেলাইট আবিষ্কার করেন।

১৯০৮—তেজস্ক্রিয় পদার্থের গুণাবলী আবিষ্কারের জন্য আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (ইংরাজ) নোবেল পুরস্কার পান।

১৯১০—ডঃ রবার্ট (জার্মান) জল মৃদুকরণের পারমুটিট পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

১৯১৩—(১) ফ্রেডরিক সোডি (ইংরাজ) "গ্রুপ ডিসপ্লেসমেণ্ট ল" নামক সূত্রটি প্রবর্তন করেন। (২) হেনরিথ ডেভিড বোর (ডেনমার্ক) পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করেন।

১৯১৪—যৌলের পারমাণবিক সংখ্যা নির্ণয় করেন মোসলে (ইংরাজ)।

১৯১৫—বোরের পারমাণবিক মডেলের উন্নত রূপ দেন সোমারফিল্ড (জার্মান)।

১৯১৮—অ্যামোনিয়ার বাণিজ্যিক পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য ফ্রিটজ হেবার (জার্মান) নোবেল পুরস্কার পান।

১৯১৯—সমস্থানিক যৌলের সঠিক ভর নির্ণয় করেন উইলিয়ম অ্যাসটন (ইংরাজ)।

১৯২২—মাস স্পেকটোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য এফ, ডব্লু, অ্যাসটন (ইংরাজ) নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

৯২৫—কলয়েড দ্রবণ সম্পর্কে তথ্য আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন রিচার্ড জিগমণ্ডি (জার্মান)।

১৯২৮—গাইগার ম্যুলর কাউন্টার নামক কণাসন্ধানী যন্ত্র আবিষ্কার করেন হানস্ গাইগার ও ডব্লু-ম্যুলর (উভয়ে জার্মান)।

১৯৩০—নাইলন আবিষ্কার করেন ক্যারুর্থাস (মার্কিন)।

১৯৩১—ভারী জল ও ভারী হাইড্রোজেন আবিষ্কার করেন হারল্ড ক্লেটনউরি (মার্কিন)।

১৯৩২—নিউট্রন আবিষ্কার করেন জেমস চ্যাডউইক (ইংরাজ)।

১৯৩৪—ফ্রেডরিক জোলিও ও ইরেন জোলিও কুরি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন (ফ্রান্স)।

১৯৩৫—মেসন কণিকা আবিষ্কার করেন য়ুকায়ুয়া (জাপান)।

১৯৪০—জি, টি, সিবার্গ ও ই, এম, ম্যাকমিলান (উভয়ে মার্কিন) নেপচুনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম আবিষ্কার করেন।

১৯৪৪—(১)"আমেরিকান" নামক তেজস্ক্রিয় যৌল প্রস্তুত করেন সিবার্গ ও, আর, এ, জেমস (মার্কিন)। (২) ভারী নিউক্লিয়াস বিভাজন পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য অটোহাম (জার্মান) নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৪৯—কালিফোর্নিয়ান ও বার্কেলিয়ান আবিষ্কৃত হয়। (২) কেমিক্যাল থারমোডায়নামিকস এর সূত্র আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান উইলিয়ম এফ, জায়েনকুর্থ (মার্কিন)।

১৯৫৩—আইনস্টাইনিয়াম নামক কৃত্রিম যৌলিক পদার্থটির আবিষ্কার হয়।

১৯৫৪—(১) ফের্মিয়াম নামক কৃত্রিম যৌলিক পদার্থটির আবিষ্কার হয়। (২) ক্যামিক্যাল বণ্ড ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে তথ্যাবলী আহরণের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন সি, পাউলিং (মার্কিন)।

১৯৫৭—ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার থেকে মেণ্ডালিভিয়াম

নামক কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলটি আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হয়।

১৯৫৮—প্রোটিন অণুর গঠন আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান ফ্রেডরিক স্যাংগার (ইংরাজ)।

১৯৬০—(১) তেজস্ক্রিয় কারবন-১৪ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন উইলার্ড, এফ, লিবি (মার্কিন)। (২) নোবেলিয়াম নামক কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলটির আবিষ্কার হয়।

১৯৬৫—জটিল জৈব যৌগের সংশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন রবার্ট বি, উডওয়ার্ড (মার্কিন)।

১৯৬৬—অণুর ইলেকট্রনীয় গঠন তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন রবার্ট এস, মূলিকেন (মার্কিন)।

১৯৭২—এনজাইমের পারমাণবিক গঠন আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয় তিন মার্কিন বিজ্ঞানী বি, আনফিনসেন, স্ট্যানফোর্ড মুর ও উইলিয়ম এইচ, স্টাইনকে।

১৯৭৪—অতিকায় রাসায়নিক অণু আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন পল, জে, ফ্লোরি।

১৯৮০—জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং এর উপর উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব আহরণের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন পল বার্গ, ফ্রেডরিক স্যাংগার ও ওয়ালটার গিলবার্ট।

পদার্থ বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের যে শাখাটি আজকের দিনে আমাদের কাছে পদার্থ বিজ্ঞান নামে পরিচিত—সেটি এককালে প্রাকৃতিক দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই প্রাচীনকালে গ্রীক ও ভারতীয় দার্শনিকগণ জড় জগতের কোন কোন দিক পর্যবেক্ষণ করতেন। পরীক্ষার মাধ্যমে কিছু কিছু তত্ত্বেরও প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন তাঁরা। তারপর সেই তত্ত্বগুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন সম্পূর্ণ গাণিতিক নিয়মে। কিন্তু তাঁদের কোন প্রচেষ্টাই দর্শনের বাহিরে ছিল না। তাই সেকালে দর্শনের যে অংশে জড় জগতের বস্তুরাশি সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা হতো সেই অংশটিকে বলা হতো প্রাকৃতিক দর্শন।

সেই বিস্মৃত অতীতে—যেদিন মানুষ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিল সেইদিনই পদার্থবিদ্যার তথা মানবসভ্যতার সূত্রপাত বলতে হবে। তাপশক্তিকে দৈনন্দিন

কাজে ব্যবহার করে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকের গৌরব অর্জন করেছিল। পদার্থবিদ্যার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার চাকা। খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে সুমেরীয়রা চাকা ব্যবহার করতো এমন নজিরও পাওয়া যায়। এই থেকে ধরে নেওয়া অসঙ্গত নয় যে, সেই অজ্ঞাত অতীতে মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে ঘর্ষণের ফলে গতি ব্যাহত হয়। তাই ঘর্ষণকে উপেক্ষা করার জন্যই আবিষ্কার করেছিল চাকাকে।

তারপর গত হয়ে গেছে শ'শ' বছর। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে আবিষ্কার করেছিল অনেক কিছু। সেদিন তাদের আবিষ্কারের মূলে ছিল কেবলমাত্র প্রয়োজন। তাই সেই সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় ও সিন্ধু সভ্যতার যুগে প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে বিজ্ঞানের সব শাখারই উদ্ভব হয়েছিল কিন্তু সে শাখা-গুলির কোন সুস্পষ্ট রূপ ছিল না। সেদিন তারা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তৈরি করতো অস্ত্র, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা পূরণের জন্য ঘর গৃহস্থালির নানা জিনিস, নদী পারাপার হওয়ার জন্য নৌকা ইত্যাদি কত কি! তাছাড়া দিন-মাস-বছর ইত্যাদি হিসাব করতে তারা লক্ষ্য করতো আকাশের জ্যোতিষ্কগুলোকে, আপন সঞ্চিত দ্রব্যের হিসাব রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল সুষ্ঠুভাবে গণনার উপায় ঠিক করতে, রোগব্যাধির কবলমুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিল উদ্ভিদের ভেষজগুণ আবিষ্কার করতে। তাই বলা যায়, সেদিন বিজ্ঞানের সমূহশাখা মিশে একাকার হয়েছিল। বিজ্ঞানের কোন্ শাখা কবে যে উৎপন্ন হয়েছে তার কাল নির্দেশ করা কখনওই সম্ভব নয়। ধরা যেতে পারে পদার্থ বিজ্ঞানেরও জন্ম হয়েছে—সেই সুদূর অতীতে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে।

গ্রীকদের সময়ে পদার্থ বিজ্ঞান—প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, শুদ্ধ পদার্থ বিজ্ঞান চর্চা গ্রীক আমলেও শুরু হয়নি। ঐ শাস্ত্রটা তাঁদের প্রকৃতি দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে ঐ প্রকৃত দর্শনের ভেতর দিয়েই তাঁরা পদার্থ বিজ্ঞানের প্রায় সবগুলি শাখায় পদচারণা করেছিলেন এবং প্রতি শাখায় কিছু কিছু মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছিলেন।

প্রথম যে দার্শনিকের দর্শনে পদার্থবিদ্যার পরিচয় লাভ করা যায়—তিনি খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত পণ্ডিত থেলস। কথিত আছে, তিনি আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান করতে পারতেন এবং কতকগুলি মূল পদার্থের কল্পনা করেছিলেন। থেলসই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিলেন, ঘর্ষণের ফলে তড়িৎ সঞ্চার হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত মহামতি পিথাগোরাসই শব্দবিজ্ঞানের

প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এবং তাঁর শিষ্যমণ্ডলী যন্ত্রসঙ্গীতের স্বর লহরীর সঙ্গে তারের দৈর্ঘ্যের অনুপাত নির্ণয় করেছিলেন—এমন একটি কিংবদন্তী আছে।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে দার্শনিক শ্রেষ্ঠ অ্যারিস্তোতল প্রথম গতি সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। তিনিই প্রথম গতিকে সরলগতি, বৃত্তাকার গতি এবং উভয়ের মিশ্রিত গতি—এই তিন ভাগে ভাগ করেন। ঐ শতাব্দীতে আলোক সম্বন্ধে গবেষণা করেন প্রখ্যাত জ্যামিতিবিদ ইউক্লিড। তিনি প্রথম প্রমাণ করেন—আলোক সরলরেখায় চলে। আলোক বিজ্ঞানে তাঁর দ্বিতীয় মতটি পরিত্যক্ত হয়েছে। সে মতটি ছিল, আলোক চক্ষু থেকে নির্গত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত আর্কিমিদিস পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময় স্বরূপ। পদার্থ বিজ্ঞানের "তাত্ত্বিক" ও "ফলিত" উভয় দিকই সমৃদ্ধ হয়েছে আর্কিমিদিসের হাতে। তিনি প্রথম জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও প্লবতা আবিষ্কার করেন। ঐ কারণে তাঁকে উদস্থিতিবিদ্যার জনক বলা হয়। ঔদক স্ক্রু দ্বারা জলকে উপরে তোলার উপায় উদ্ভাবন, লিভারের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা, ক্যাটাপুল্ট (Catapult) আবিষ্কার—পদার্থ বিদ্যায় তাঁর অক্ষয় কীর্তি। ঐ শতাব্দীর আর একজন গ্রীক বিজ্ঞানী স্টেসিবিয়াস প্রথম জলঘড়ির আবিষ্কার করেছিলেন এবং বায়ুর চাপকে কাজে লাগিয়ে পাম্প ও নিক্ষেপক অস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত টলেমি দীর্ঘকাল আলোক বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞানের ঐ শাখায় তাঁর অবদানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আলোক প্রতিসরণের একটি সূত্র তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এবং তাঁরই লেখায় সমতল, উত্তল ও অবতল এই তিন ধরণের দর্পনের উল্লেখ আছে।

টলেমির পরে হীরো নামে এক প্রযুক্তিবিদের গ্রীসে আবির্ভাব হয়। পদার্থ বিজ্ঞানে তিনিও রেখে গেছেন অবিস্মরণীয় অবদান। বাষ্পীয় টারবাইনের তিনিই আবিষ্কারক। হীরো বহুকাল আলোক ও বাতাসকে নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং আবিষ্কার করেছিলেন বাতাসের স্থিতিস্থাপক গুণটি।

রোমান আমলে একজন মাত্র পদার্থবিদের পরিচয় পাওয়া যায়। তার নাম ভিট ভিয়াস। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন কম্পনের ফলে শব্দের সৃষ্টি হয়।

মধ্যযুগের পদার্থ বিজ্ঞান—মধ্যযুগে পদার্থ বিজ্ঞান চর্চা শুরু করেন আরবীয়রা। আরবের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ইবন অল্‌হয়থাম আলোকবিদ্যার কতকগুলি তথ্যের প্রথম জ্যামিতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। চক্ষু ও

আমাদের দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে তিনিই প্রথম গবেষণা করেছিলেন এবং যে সব মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছিলেন সেগুলি এখনও আলোক বিজ্ঞান স্বীকার করে আসছে। লেন্সের বিবর্ধন এবং বায়ুমণ্ডলের প্রতিসরণ ক্ষমতাও হয়থামের আবিষ্কার।

মধ্যযুগে ইউরোপে পদার্থ বিজ্ঞান চর্চা হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রোজার বেকনের দ্বারা। আলোক প্রতিফলন সূত্রের আবিষ্কর্তা তিনি। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, লেন্স দিয়ে এমন একটি যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব—যার দ্বারা দূরের জিনিসকে স্পষ্টভাবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু দূরবীন তিনি আবিষ্কার করতে পারেননি।

রোজার বেকনের পর লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়। তাত্ত্বিক দিক থেকে তিনি আলোক তরঙ্গবাদের সমর্থক এবং আলোক প্রতিফলনের একটি সূত্রের আবিষ্কারক। ফলিত পদার্থবিদ্যায় তাঁর অবদানই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন কতকগুলি যুদ্ধাস্ত্র এবং জলশক্তির দ্বারা চালিত কতকগুলি যন্ত্রপাতি। বিমান ও হেলিকপটার নির্মাণের স্বপ্নও তিনি দেখেছিলেন।

ভিঞ্চির পর আসে গ্যালিলিওর কাল। আর্কিমিদিসের মত গ্যালিলিও-ও এক মহাবিস্ময়। বিজ্ঞানের বহু শাখায় তিনি স্বচ্ছন্দভাবে পদচারণা করেছিলেন। তবে পদার্থ বিজ্ঞানেই তাঁর দান সর্বাধিক। প্রথম গ্যালিলিওই বায়ুপূর্ণ থার্মোমিটার প্রস্তুত করেন। পেণ্ডুলামের নিয়মগুলি তাঁরই আবিষ্কার। বলবিদ্যা ও স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন দ্বার উদ্ঘাটন করেন। তাছাড়া তিনিই প্রথম প্রদান করেন সরণ ও ত্বরণের সংজ্ঞা। উদস্থিতিবিদ্যায় বস্তুর নিমজ্জনের সূত্রও গ্যালিলিও আবিষ্কার করেন। সত্য কথা বলতে কি, আর্কিমিদিস-গ্যালিলিও এবং গ্যালিলিওর পরবর্তীকালে আবির্ভূত নিউটন—এই তিনজন তিনটি বিস্ময়। বিজ্ঞান ওঁদের প্রতিভাকে লাভ করতে না পারলে এত দ্রুত অগ্রসর হতে পারতো না।

সে-সময় আরও কয়েকজন বিজ্ঞানীর অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মধ্যে জানসেন, ফর্টিন, রবার্ট হুক, গিলবার্ট, ব্লেইজ পাস্কাল প্রভৃতির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। জানসেন যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেন। ফর্টিন আবিষ্কার করেন বায়ুর চাপমান যন্ত্র বা ব্যারোমিটার। অবশ্য ফর্টিনের নামের সঙ্গে টরিসেলির নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। অন্যান্যদের মধ্যে গিলবার্ট চুম্বক বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন, বাতাসের স্থিতিস্থাপক গুণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন হুক, পাস্কাল

উদস্থিতিবিদ্যার একটি বিশেষ সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং অটো-ভন-গেরিক আবিষ্কার করেন বায়ুশোষক যন্ত্র।

নিউটনের যুগ—বিজ্ঞানের ইতিহাসে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত সময়কে পণ্ডিতেরা "নিউটনের যুগ" রূপে চিহ্নিত করে থাকেন। পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই যুগটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে বিজ্ঞানের সব শাখাই এই সময়ে যথেষ্ট পুষ্টি লাভ করে। তারপর বিভিন্ন বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান এগিয়ে চলে অতি দ্রুতগতিতে। তাই বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগের শুরু নিউটনের আমল থেকে।

পণ্ডিতদের মতে নিউটন বিজ্ঞানকে যা উপহার দিয়ে গেছেন তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কি অঙ্ক, কি জ্যোতির্বিদ্যা, কি পদার্থবিদ্যা সবকিছুই সমৃদ্ধ হয়েছে নিউটনের দ্বারা। তাছাড়া পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যায় গণিতের প্রয়োগ করে তিনি তিনটি শাখার সমন্বয় সাধন করে সহজ ও বোধগম্য করে তুলেছেন। নিউটন বিজ্ঞানে যে সব তথ্যগুলি প্রয়োগ করেছিলেন সেগুলিকে অনুসরণ করেও বহু বিজ্ঞানী যশস্বী হয়েছেন। এমন কি আজও পর্যন্ত নিউটন-প্রদত্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার অন্ত নেই। তাই নিউটন যুগসন্ধিক্ষণের মহাবিজ্ঞানী।

পদার্থ-বিজ্ঞানে নিউটনের অবদান অনেক। বাতাস ও কতকগুলি ঘন মাধ্যমে শব্দের গতিবেগ তিনি প্রথম নির্ণয় করে শব্দ-বিজ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। গতিসূত্র ও মহাকর্ষ সূত্রের আবিষ্কারক তিনিই। জড় পদার্থের গতিবিধির ক্ষেত্রে তিনি প্রথম গণিতকে প্রয়োগ করে বিজ্ঞানের পরিধি অবিশ্বাস্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আলোক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর আছে অসামান্য অবদান। আলোকের বর্ণালীতত্ত্বের জন্মদাতা নিউটন। আলোর ব্যতিচার বা ইনটারফিয়ারেন্স এবং দ্বৈত প্রতিফলন বা "ডাবল রিফ্রাকসান" এর কথা পদার্থ বিজ্ঞান তাঁরই গবেষণা থেকে লাভ করেছে। আলোর কণিকাতত্ত্বের প্রবর্তক নিউটন এবং প্রতিফলক দূরবীনের আবিষ্কর্তা। বিজ্ঞানের এই শাখায় তাঁর আবিষ্কারগুলি এত মূল্যবান যে, পণ্ডিতেরা মনে করেন নিউটন উপরোক্ত আবিষ্কারগুলির যে কোন একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করলেই অমরত্ব লাভ করতে পারতেন। সবাই মনে করে থাকেন, বিজ্ঞানের চিন্তারাজ্যে তিনি যে সুদূর প্রসারী আলোড়ন এনেছিলেন পরবর্তীকালে একমাত্র আইনস্টাইন ছাড়া আর কোন বিজ্ঞানী এতখানি আলোড়ন আনতে সমর্থ হননি।

নিউটনের যুগে আরও কয়েকজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী আবির্ভূত

হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমে বিজ্ঞানী হাইঘেন্‌স এর নাম করতে হয়। নিউটন আলোকের কণিকা তত্ত্বের প্রবর্তক। আর হাইঘেন্‌স তরঙ্গতত্ত্বের প্রবর্তক। তবে হাইঘেন্‌স তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় একশ বছর পরে বিজ্ঞানী ফ্রেনলই আলোকের তরঙ্গ তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেন। হাইঘেন্‌স-এর অন্যান্য অবদানের মধ্যে আছে পেণ্ডুলামের দৈর্ঘ্যের সূত্র এবং ঘড়ির ব্যালেন্স-হুইল নির্মাণ। হাইঘেন্‌স-এর পরে বিজ্ঞানী রোমার-এর নাম করতে হয়। আলোকের গতিবেগ নির্ণয়ের কৃতিত্ব রোমারেরই। তাপমাত্রার একটি স্কেলও তিনি প্রবর্তন করেছেন। ঐ স্কেলটি "রোমার স্কেল" নামে প্রসিদ্ধ।

নিউটনের যুগের পর বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে ইউরোপে কিছুটা ভাটা পড়ে। সেখানে পুনরায় শুরু হয় দর্শনের যুগ। তবে এ-যুগে পদার্থ বিজ্ঞান যে কিছু লাভ করেনি এমন নয়। ঐ দার্শনিক যুগেই বিজ্ঞানী ডুফে প্রমাণ করেন, ঘর্ষণের ফলে বিপরীত আধানের সৃষ্টি হয়। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঐ আধানদ্বয়ের নামকরণ করেন ধনাত্মক আধান ও ঋণাত্মক আধান।

স্বর্ণ যুগের সূত্রপাত—নিউটনের পরে ইউরোপে পুনরায় শুরু হয় দর্শনের যুগ। কিন্তু এবার ইউরোপে দর্শনের যুগ বেশিকাল স্থায়ী হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পুনরায় বিজ্ঞানরাজ্যে আসে জোয়ার। নিউটন যা সূচনা করেছিলেন সেগুলি এবার পরিণত হয় মহামহীরূহে। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার জমা হতে থাকে বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে। বিজ্ঞানরাজ্যে যেন বিপ্লব শুরু হয়। রসায়ন বিজ্ঞানে যেমন বিপ্লব এনেছিলেন বিজ্ঞানী ল্যাভোসিয়ার তেমনই পদার্থবিদ্যা ও কারিগরী বিদ্যায় বিপ্লবের সূচনা করেন জেমস ওয়াট। তাঁর তৈরি বাষ্পীয় ইঞ্জিনই এই বিপ্লবের নায়ক। তাছাড়া তড়িৎ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে আনেন গ্যালভানিও ভোল্টা আর আকাশে ওড়ার কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে বেলুন আবিষ্কার করেন জোসেফ ও মঁগল ফিয়ের। দূরত্বকে বধ করার জন্য বাষ্পীয় শকটেরও আবির্ভাব এই সময়ে। তাই বিজ্ঞানীরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগকে বিজ্ঞানের স্বর্ণ-যুগের সূচনা বলে ধরে থাকেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পদার্থ বিজ্ঞান ও তার শাখা—ঊনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থ বিজ্ঞানের রাজ্যে যে বিরাট প্লাবন এসেছিল তাকে দুচার কথায় প্রকাশ করা যায় না। এই সময়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাশ্চাত্যে বহু বিজ্ঞান গবেষণাগার। সেই গবেষণাগারগুলিই প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানকে দান করে তার অগ্রগতি। নিত্য নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ হতে থাকে বিজ্ঞান। উক্ত

শতাব্দীই বিজ্ঞানকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করে। পুনরায় এক একটি শাখায় এত অধিক সংখ্যক আবিষ্কার জমা হতে আরম্ভ করে যে শাখাগুলির পরিধি অভাবনীয়ভাবে বেড়ে চলে এবং জন্মগ্রহন করে বহু উপশাখা। তাছাড়া শাখাগুলি তার স্বকীয়তাও বজায় রাখতে পারল না। একটি শাখায় জ্ঞান অর্জন করতে অন্য শাখা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ালো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, পদার্থ বিজ্ঞানী দূরবীন আবিষ্কার করলেন—সেই দূরবীন ব্যবহৃত হল গ্রহ-উপগ্রহ পর্যবেক্ষণের কাজে—গ্রহ-উপগ্রহদের গতিবেগ, দূরত্ব প্রভৃতি নির্ণয়ের কাজে দরকার হল গণিতের। মোটকথা—পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন—সব মিশে একাকার হয়ে গেল।

পদার্থ বিজ্ঞানের যে উপশাখাগুলির সৃষ্টি হল সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটির পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হল।

বলবিদ্যা ও গতিবিদ্যা—জড় পদার্থের গুণাগুণ ও ধর্ম যথা—ভর, জাড্য, স্থিতিস্থাপকতা, সান্দ্রতা বা ভিসকোসিটি, আসঞ্জন বা অ্যাঢেশান, সংসক্তি বা কোহেশান—এই বিদ্যার অন্তর্গত। সাধারণভাবে বলবিদ্যা বলতে বোঝায়, বাহির থেকে প্রযুক্ত বলের দ্বারা অথবা কোন ক্রিয়ার ফলে বস্তুর গতির যে পরিবর্তন হয়—তারই আলোচনা। অপরদিকে বস্তুর স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল অবস্থায় আসা এবং গতিশীল অবস্থা থেকে স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া—প্রভৃতিও এই বিদ্যার আলোচ্য বিষয়। বিজ্ঞানের এই শাখাকে গণিতের শাখারূপেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানও উক্ত শাখাটিকে পরিত্যাগ করতে পারে না। তাই বিজ্ঞানের এই শাখাটির গুরুত্ব সর্বত্র অনুভূত হয়।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বলবিদ্যাকে বিবিধ কর্মে প্রয়োগ করে আসছে। সেকালে বলবিদ্যা বলতে কেবলমাত্র যন্ত্রনির্মাণ বিদ্যাকে বুঝাতো এবং "বলবিদ্যা" কথাটিরও উৎপত্তি হয়েছে খুব ভারি জিনিসকে উত্তোলিত করার প্রয়াস থেকে। মিশরের পিরামিড তৈরির জন্য বড় বড় পাথরের চাঁইগুলোকে উপরে তুলতে হতো। অবশ্যই বলবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে নিশ্চয়ই তারা পুলি বা কপিকল জাতীয় কোন যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল। তা না হলে এত উঁচুতে পাথরকে উত্তোলিত করা মানুষের সাধ্যের বাহিরে। তবে সেই অতীতে বলবিদ্যা সম্বন্ধে কোন গবেষণা হয়েছিল কিনা সে তথ্য অজ্ঞাত।

বলবিদ্যা সম্বন্ধে সুসংবদ্ধভাবে আলোচনা শুরু হয় আর্কিমিদিসের কাল থেকে। বহু যন্ত্রপাতির আবিষ্কর্তা এবং বলবিদ্যার অন্যতম শাখা উদস্থিতি-বিদ্যার জনক তিনি। আর্কিমিদিসের পর এই বিদ্যাটা কেবল যান্ত্রিক বিদ্যার

মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তারপর পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের অবলুপ্তির দিনে বলবিদ্যারও অনুশীলন একরকম বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে নিউটনের হাতে ওর পুনর্জন্ম ঘটে।

বলবিদ্যার দুটি বিভাগ—গতিবিদ্যা ও স্থিতিবিদ্যা। গতিবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্র গতিশীল বস্তু। এই গতিবিদ্যারও আছে দুটি শাখা। শাখা দুটির নাম কাইনেমেটিক্স্ ও কাইনেটিক্স্। কাইনেমেটিক্স্-এ গতির ধর্ম বিবেচনা করা হয় এবং কাইনেটিক্স্-এ গতি ও গতির কারণই আলোচনার বিষয়বস্তু। অপরপক্ষে স্থিতিবিদ্যা হচ্ছে, গতিবিদ্যার বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ এবং বলের প্রভাবে বস্তুর স্থিতাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা।

আধুনিক গতিবিদ্যা ও স্থিতিবিদ্যা—দু-বিদ্যার জনক হচ্ছেন বিজ্ঞানী নিউটন। তাঁর দেওয়া তিনটি সূত্র এই শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রথম সূত্র অনুযায়ী, বাহির থেকে কোন বল প্রযুক্ত না হলে গতিশীল বস্তু চিরকাল সমান গতিতে চলতে থাকবে (কারও কারও মতে এই সূত্রটির আবিষ্কর্তা গ্যালিলিও)। দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে, বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক। নিউটনের তৃতীয় সূত্রটি নির্দেশ করে, প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। স্থিতিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ল্যামির দানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

নিউটনের গতিবিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদ দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞান স্বীকার করে এসেছিল। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে দেখা গেল, নিউটনের গতিবিদ্যা সর্বক্ষেত্রে সুফল আনছে না। বিশেষতঃ পরমাণু, পরমাণুর মূল কণিকা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি এবং আলোর মত অতি উচ্চগতি-সম্পন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়। তাই বিংশ শতাব্দীতে নব্যগতিবিদ্যার জন্ম হয়েছে। এই বিভাগের স্রষ্টা মহাত্মা আইনস্টাইন। তাঁর আপেক্ষিকবাদ এবং কণাতম তত্ত্ব বা কোয়ান্টাম থিওরী একদিকে যেমন বহু সমস্যার সমাধান করেছে, অপরদিকে তেমনই বলবিদ্যার ক্ষেত্রে নতুন নতুন গবেষণার পথকেও উন্মুক্ত করেছে।

শব্দ বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার মত শব্দবিজ্ঞানও গ্রীক-আমলে সূচিত হয়েছিল। পিথাগোরাসই সর্বপ্রথম ব্যক্তি—যিনি স্বরসমৃদ্ধ শব্দ তথা মিউজিক্যাল সাউণ্ড সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। তারপর শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে শব্দ-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন বিজ্ঞানী নিউটন। নিউটন ব্যতীত আর যাঁদের অবদানকে অবলম্বন করে শব্দবিজ্ঞান উন্নত হয়েছে তাঁদের মধ্যে টমাস ইয়ং,

ফুরিয়ে, হেল্‌ম্‌হোল্‌টজ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, শব্দ একপ্রকার শক্তি এবং জড় পদার্থের কম্পনেই শব্দের সৃষ্টি হয়। আবার এই শব্দ কোন বাস্তব মাধ্যম ছাড়া অগ্রসর হতে পারে না। গ্যাস, তরল অথবা কঠিন যে-কোন মাধ্যমেই শব্দ গমনাগমন করতে পারে। সূর্যদেহে অহরহ যে প্রচণ্ড পারমাণবিক বিস্ফোরণ চলছে, তার শব্দ পৃথিবীতে এসে না পৌঁছার কারণ সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে বায়ু বা অন্য কোন মাধ্যম নেই। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলটা মাত্র কয়েক শ' মাইল ঊর্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপরে সব ফাঁকা।

যে সমস্ত শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয়, তাদের কম্পাঙ্ক কমবেশি ২০ থেকে ২০০০ এর মধ্যে থাকতে হয়। অর্থাৎ শব্দের উৎস যেন সেকেণ্ডে ২০ এর কম বা ২০০০ এর বেশি কম্পিত না হয়। তেমন হলে আমরা সে শব্দ শুনতে পারবো না। এই জাতীয় শব্দকে ইংরাজীতে বলা হয় আলট্রাসনিক্‌স।

শব্দের বেগ আবার মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল। পাহাড়-পর্বত, গাছের সারি প্রভৃতিতে শব্দ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। তবে পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, প্রতিফলকের দূরত্ব ৫৬ ফুটের কম হলে প্রতিধ্বনি শোনা যায় না।

শব্দ আবার দু-রকমের। যে শব্দ শ্রুতিমুখকর অর্থাৎ কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ইত্যাদিকে বলা হয় সুরসমৃদ্ধ শব্দ। আর যে শব্দ আমাদের কানে অত্যন্ত খারাপ ঠেকে এবং বিরক্তি উৎপাদন করে, তাকে বলা হয় সুরবর্জিত শব্দ। গুলিগোলার আওয়াজ, যন্ত্রের একটানা ঘর্ঘর শব্দ, সুরবর্জিত শব্দের উদাহরণ।

তাপ বিজ্ঞান—তাপ যে একপ্রকার শক্তি—একথা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষও টের পেয়েছিল। অগ্নিকে আয়ত্ত করার পর আরও টের পেয়েছিল আগুনের প্রচণ্ড দাহিকা-শক্তির কথা। তবে সে শক্তিকে তখন তারা ব্যয় করেছিল আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে, রান্নাবান্নায়, ধাতুনিষ্কাশনে এবং মাটির তৈরি ঘর-গৃহস্থালীর জিনিসপত্রকে পুড়িয়ে মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে। তারা জানতো না যে, সূর্যের উত্তাপে পৃথিবীর জল বাষ্পাকারে ধীরে ধীরে আকাশে উঠে যায় এবং সেই বাষ্প মেঘের আকার ধারণ করে। প্রচণ্ড শীতের দিনে গুহামুখে আগুন জ্বালিয়ে হাত-পাগুলোকে ভালভাবে সেঁকে নিত তবু জানতো না তাপ বিকিরণের কথা। কেবল তাই নয়, পরিবহণ, পরিচলন প্রভৃতি তাপের গুণাবলীর কথাও জানতো না। শুধু জানতো, ঘর্ষণের ফলে তাপের উৎপত্তি হয়।

গ্রীক আমলেও তাপকে নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামায়নি। এমনকি

মধ্যযুগেও না। ইউরোপে বিজ্ঞান যখন নবজন্ম লাভ করলো তখনও বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, পদার্থ থেকে তাপ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার আকারে বেরিয়ে আসে এবং শীতল পদার্থকে গরম করে। এই ধারণার পরিবর্তন করেন কাউণ্ট রামফোর্ড। তিনিই প্রমাণ করেন, ঘর্ষণের ফলেই তাপের সৃষ্টি হয়। রামফোর্ডের এই তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন বিজ্ঞানী ডেভি। প্রকৃতপক্ষে সেইদিনই তাপবিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে "জুল" তাপ ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করে তাপবিজ্ঞানে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে আনেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে তাপবিজ্ঞানে যে কোনকিছু আবিষ্কৃত হয়নি এমন নয়। সেই সময় রবার্ট বয়েল তাপমাত্রা সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন এবং আবিষ্কার করেছিলেন "গ্যাসসূত্র", ক্যালরিমিতিতে স্থায়ী অবদান রেখেছিলেন জোসেফ ব্লাক এবং তাপমাত্রা নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছিলেন গ্যালিলিও—এঁদেরও আগে। তবে বিশাল তাপবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঐ গবেষণাগুলি ছিল নিতান্তই গৌণ।

তাপবিজ্ঞানকে যিনি গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করাতে সমর্থ হন—তিনি জেমস ওয়াট। তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে ইনি তাপবিজ্ঞানের বিপুল সম্ভাবনার পথকে উন্মুক্ত করেন। তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কৃত যন্ত্রই শেষপর্যন্ত আলোড়ন আনে উনবিংশ শতাব্দীতে। জেমস ওয়াটের সঙ্গে আরও একজন তাপবিজ্ঞানীর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। তিনি বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার সাদি কার্নট। তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের আবিষ্কর্তা তিনি এবং ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতাও তিনি প্রথম পরিমাপ করেন। এই প্রসঙ্গে ডেমলার ও ডিজেলের অবদানও অনস্বীকার্য। ডেমলারের কৃতিত্বে আবিষ্কৃত হয় পেট্রোল ইঞ্জিন এবং ডিজেল আবিষ্কার করেন ডিজেল ইঞ্জিন। এঁদের আবিষ্কারকে কেন্দ্র করেই মানুষ জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে অপরাজেয় হয়ে উঠেছে।

বর্তমানকালে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তাপ-প্রয়োগে পদার্থের নানা পরিবর্তন ঘটে। ক্রমাগত তাপ প্রদান করতে থাকলে কঠিন পদার্থ তরল, গ্যাসীয় এমনকি প্লাজমা অবস্থাও প্রাপ্ত হতে পারে। তাপ সঞ্চালিত হয় পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ পদ্ধতিতে। উদাহরণ স্বরূপ একটি ধাতব দণ্ডের একপ্রান্ত গরম করলে পরিবহণ প্রণালীতে অন্য প্রান্তও গরম হয়, এক কেটলি জলের তলদেশে তাপ প্রয়োগ করলে পরিচলনের দ্বারা তলার জল গরম হয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে এবং উপরের ঠাণ্ডা ও ভারি জল তলায় নেমে এসে পুনরায় উত্তপ্ত হয়, আর জলন্ত উনান

থেকে বহু দূরে দাঁড়ালেও বিকিরণের দ্বারা তাপ এসে গায়ে লাগে। তাপ বিকিরণের জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাপের উৎস হচ্ছে বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি। দহনের ফলে বস্তুর সেই শক্তি থেকে রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাপ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে পরমাণু চুল্লিতে যে তাপ সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয় তার উৎস হচ্ছে পরমাণু। সেখানে পরমাণুর কেন্দ্রকের অন্তর্নিহিত শক্তির একাংশকে রূপান্তরিত করা হয় তাপশক্তিতে।

শীতলীকরণও তাপবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। পদার্থের শীতলীকরণ সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত বহু গবেষণা হয়েছে। দেখা গেছে, অতি শীতল করার ফলে বস্তুর বিভিন্ন প্রকার গুণ প্রকাশ পায়। যেমন অনেক ধাতবপাতকে অতি শীতল করলে তার বিদ্যুৎ পরিবাহিতা অনেকগুণে বেড়ে যায়। হিলিয়াম নামক গ্যাসটিকে ঠাণ্ডার দ্বারা তরলে পরিণত করার পর যদি তাপমাত্রাকে আরও কমাতে কমাতে—২৮০° তে আনা যায় তাহলে তারমধ্যে এক আশ্চর্য গুণ প্রকাশ পায়। সে গুণটি হল, যে সূক্ষ্মতম ছিদ্র দিয়ে কোন তরল পদার্থ যেতে পারে না সেই ছিদ্র দিয়ে অতি শীতল হিলিয়াম অবাধে যাওয়া-আসা করতে পারে।

অতি শীতল করার পদ্ধতি আগে বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না। বড় জোর ০° ডিগ্রি তাপমাত্রার নিচে ২০° তাপমাত্রা পর্যন্ত নামতে পারতেন। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসগুলো এই ধরণের নিম্নতাপমাত্রায় তরলীভূত হতো না বলে বিজ্ঞানীরা নামকরণ করেছিলেন স্থায়ী গ্যাস বা পার্মানেণ্ট গ্যাস। পরে জুল ও কেলভিন গ্যাসকে হঠাৎ প্রসারণের দ্বারা নিম্ন তাপমাত্রায় আনতে সক্ষম হন। এবার কোন গ্যাসকে যন্ত্রের মাধ্যমে বিশিষ্ট পদ্ধতিতে বার বার প্রসারিত করে ০° ডিগ্রির নীচে ১০০ বা আরও অধিক নিম্ন তাপমাত্রা সৃষ্টি করা সম্ভব হল। ঐ পদ্ধতিকে অবলম্বন করে পিকটেট অক্সিজেনকে, লিণ্ডে বায়ুকে, ডেওয়ার হাইড্রোজেনকে এবং কামারলিং ওনেস হিলিয়ামকে তরলীভূত করেন। তবুও শীতলীকরণ বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত থাকে। অবশেষে ডিবাই আবিষ্কার করেন বিচুম্বকনের সাহায্যে অতি নিম্নতাপমাত্রা সৃষ্টি করার নতুন পদ্ধতি।

এবার তাপবিজ্ঞানে যে যন্ত্রটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় সেই থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র সম্বন্ধেও দু-চার কথা বলতে হয়। বায়ুপূর্ণ। থার্মোমিটার প্রথম গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন—একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই থার্মোমিটার ছিল ত্রুটিপূর্ণ। আধুনিক পারদপূর্ণ

থার্মোমিটারের উদ্ভাবক গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইট। এই থার্মোমিটার ত্রুটিহীন হলেও অতি উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায় না। তাই থার্মোমিটার সম্বন্ধেও দীর্ঘকাল গবেষণা চলেছিল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্সেপ আবিষ্কার করেন উচ্চ তাপমান যন্ত্র বা পাইরোমিটার। এটি একটি গ্যাস থার্মোমিটার। প্রিন্সেপের পর ডেভি, রেনোঁ প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা পাইরোমিটারের আরও উন্নত রূপ প্রদান করেন।

পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হলে আরও উচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই কারণে উদ্ভাবিত হয় বিকিরণ থার্মোমিতি ও বিদ্যুৎশক্তি থার্মোমিতি। এখন আরও অনেক নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে থার্মোকাপল ব্যবহার অন্যতম। উক্ত পদ্ধতিটির আবিষ্কর্তা লা-শ্যাতেলার নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী। তিনি প্রথমে প্লাটিনাম এবং প্লাটিনাম-বেরিয়াম মিশ্র ধাতুর তারকে ব্যবহার করেছিলেন। বর্তমানে তামা ও কন্‌স্ট্যানটান অথবা মলিবডেনাম ও টাংস্টেন তার থার্মোকাপল নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। উক্ত পদ্ধতিতে—২০০° থেকে ১০০০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায়।—২০০° নিচে তাপমাত্রাকে পরিমাপ করতে হলে বিজ্ঞানীরা নানা অর্ধপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করে থাকেন।

তাপবিজ্ঞানের আর একটি শাখার নাম থার্মোডাইনামিকস। এই শাখায় তাপশক্তি ও যান্ত্রিকশক্তির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করা হয়। বর্তমানে আবার তাপশক্তির সঙ্গে অন্য যে-কোন শক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা থার্মোডাইনামিক্‌স-এর অন্তর্গত।

আলোক বিজ্ঞান—আলো আছে বলেই এই পৃথিবীটাকে এত সুন্দর ও রমণীয় মনে হয়। কিন্তু এককালে মানুষের ধারণা ছিল, আলো আমাদের চক্ষু থেকেই নির্গত হয়। দিনের বেলায় আকাশে সূর্য থাকে বলে চক্ষু থেকে আলো নিঃসরণ বেশি হয় আর রাত্রে হয় কম। অনেক পরে মানুষ বুঝতে পারে, সূর্যের আলোতেই পৃথিবী আলোকিত হয়।

বিজ্ঞানের এই শাখাটিতে আলোকতত্ত্ব এবং আলোর ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আলোকের গতি, প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বিচ্ছুরণ, ব্যতিচার বা ইন্টারফিয়ারেন্স, সমবর্তন বা পোলারিজেশন, অপবর্তন বা ডিফ্রাকশন প্রভৃতি আলোচনাই আলোক-বিজ্ঞানের মুখ্য বিষয়।

আলোক সম্বন্ধে গবেষণা বহুকালের। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি আলোক-প্রতিসরণ সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রোজার

বেকন কতকগুলি লেন্স আবিষ্কার করে আলোক সম্বন্ধে গবেষণার পথকে প্রশস্ত করেন। তারপর সুচারুভাবে গবেষণা আরম্ভ হয় বিজ্ঞানী নিউটনের আমলে। তিনিই প্রথম আলোকের প্রতিসরণ, ব্যতিচার, বিচ্ছুরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আহরণ করেন। আলোকের গতির ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে তিনি প্রচার করেন কণিকাবাদ। এই মতে, আলোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেগবান কণার সমষ্টি। নিউটন আলোর গতিবেগ নির্ণয় করেছিলেন ৩×১০^{৮} মিটার প্রতি সেকেণ্ডে। তাঁর কণিকাবাদ কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সুফল প্রদান করতে পারেনি। তাই নিউটনের সমসাময়িক সময়ে আবির্ভূত হল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী হাইঘেন্স তরঙ্গবাদের কল্পনা করেন। পরে ইংরাজ বিজ্ঞানী ইয়ং এবং ফরাসী বিজ্ঞানী ফ্রেনল হাইঘেন্স এর তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁরা শূন্যে ঈথার নামক একটি অদৃশ্য বস্তুর কল্পনা করেন এবং প্রচার করেন, আলোক-রশ্মি ঐ ঈথারের সাহায্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তবে কেউ কেউ মনে করেন, ঈথারের কল্পনা ওঁরা কেউ করেননি। গ্রীক বিজ্ঞানী অ্যানাক্সাগোরাস কল্পনা করেছিলেন, সমগ্র বিশ্বজগৎ এক সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য পদার্থে পরিপূর্ণ। তাঁর কল্পিত ঐ পদার্থের নামকরণ করেছিলেন ঈথার।

যাই হোক না কেন, হাইঘেন্স, ফ্রেনল, ইয়ং প্রভৃতি বিজ্ঞানীর আলোক তরঙ্গবাদ এবং ঈথার দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে এসেছিলেন। পরে একরকম এই বিংশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রমাণ করেন, বিশ্বজগতে ঈথার নামক কোন বস্তু নেই। তিনি প্রচার করেন আলোকের "ফোটন" মতবাদ। এই মতবাদ আলোকের কণিকা মতবাদকে কিছুটা সমর্থন করে।

আলোক-বিজ্ঞানে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদানও বড় কম নয়। অধ্যাপক সি. ভি. রমন এবং ডঃ মেঘনাদ সাহার আবিষ্কার আলোক-বিজ্ঞানে যুগান্তকারী আখ্যা দেওয়া চলে। সূর্যরশ্মিকে বিশ্লেষণ করার কৃতিত্ব বিজ্ঞানী সাহার।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ড্যানিস জ্যোতির্বিদ ও পদার্থ বিজ্ঞানী রোমার আলোকের গতিবেগ নির্ণয় করে আলোক-বিজ্ঞানে স্থায়ী কীর্তি স্থাপন করে গেছেন।

চুম্বক বিজ্ঞান—চুম্বক বিজ্ঞানে প্রকৃত গবেষণা শুরু হয় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ বিজ্ঞানী উইলিয়ম গিলবার্টের হাতে। কিন্তু গিলবার্টের আগেও চুম্বকের ব্যবহার ছিল। কথিত আছে, প্রাচীনকালে নাবিকেরা সমুদ্রে দিক ঠিক করার জন্য চুম্বক দিয়ে একরকম যন্ত্র তৈরি করতো। চীনারাই ঐ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা।

চুম্বকের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওকে ঝুলিয়ে রাখলে ওর একটা মেরু সবসময় উত্তরদিকে থাকে এবং লোহা, নিকেল প্রভৃতি ধাতুকে আকর্ষণ করতে পারে।

চুম্বকের দুটি মেরু—উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু। একমেরু বিশিষ্ট চুম্বক পাওয়া যায় না কিংবা চুম্বককে কেটে দুখানা করলেও মেরু বিচ্ছিন্ন হয় না। আপনা হতেই বিচ্ছিন্ন অংশে নতুন মেরুর উদ্ভব হয়। সমমেরু বিকর্ষণ করে এবং অসমমেরু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

চুম্বক দু প্রকারের। স্বাভাবিক চুম্বক ও কৃত্রিম চুম্বক। স্বাভাবিক চুম্বক খুব শক্তিশালী নয়। এশিয়ামাইনরের কোন কোন জায়গায় ম্যাগনেটাইট নামক ধূসর রঙের এক প্রকার লৌহপ্রস্তর পাওয়া যায়। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, লোহাকে এরা আকর্ষণ করতে পারে। পণ্ডিতেরা তাই এই পাথরের নাম রেখেছেন স্বাভাবিক চুম্বক। একটি বিশিষ্ট নিয়মে চুম্বকের দ্বারা লোহাকে ঘর্ষণ করে অথবা বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারা শক্তিশালী কৃত্রিম চুম্বক তৈরি করা যায়। কাঁচা লোহাকে বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা চুম্বকে পরিণত করলে তার চুম্বকত্ব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। এই ধরণের চুম্বককে তড়িৎচুম্বক বলা হয়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী স্টারজান আবিষ্কার করেছেন উক্ত চুম্বককে। চুম্বক বিজ্ঞানে গাউস ও ওয়েবারের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চুম্বক বিজ্ঞানে ভারতীয় বিজ্ঞানী কৃষ্ণানেরও দান আছে।

তড়িৎ বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের এই বিভাগে আছে দুটি উপবিভাগ। স্থির-তড়িৎ বিজ্ঞান ও প্রবাহী-তড়িৎ বিজ্ঞান। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতগণ ঘর্ষণের ফলে স্থির তড়িতের উৎপন্ন হয়—এই সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানের এই শাখাটিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। এর যে একটা বিরাট সম্ভাবনা আছে—সে-কথা কারও মাথায় আসেনি। সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী কুলম্ব নিউটনের বলবিদ্যা ও গাণিতিক নিয়মকানুনকে তড়িৎ বিজ্ঞানে প্রয়োগ করে সম্ভাবনার পথকে উন্মুক্ত করেন। তাঁর আগে বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিস অবশ্য স্থির-তড়িৎ সম্বন্ধে গবেষণা করে ব্যস্তানুপাতিক বর্গসূত্র রচনা করেছিলেন। স্থির-তড়িতে বিজ্ঞানী ওয়েবারেরও অবদান আছে।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী গ্যালভানি তড়িতের সাহায্যে ব্যাঙের পা'-এর পেশীকুঞ্চন লক্ষ্য করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালভানির পরীক্ষাকে অবলম্বন করে বিজ্ঞানী ভোল্টা আবিষ্কার করেন ভোল্টীয় স্তূপ। সেই থেকে প্রবাহী-তড়িৎ বিজ্ঞানের জন্ম। ভোল্টাই আবিষ্কার করেন ভোল্টীয় কোষ। তারপরেই তড়িৎ বিজ্ঞানে আসে আলোড়ন। একাধিক বিজ্ঞানী নানা ধরণের

কোষ আবিষ্কার করলেন। অবশেষে বিজ্ঞানী ডেভি ও বিজ্ঞানী ফ্যারাডে কতকগুলি সূত্র রচনা করে সমৃদ্ধ করলেন তড়িৎ বিজ্ঞানকে। তারপর এডিসন বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করে তড়িৎকে ক্রীতদাসে পরিণত করেন।

তড়িৎ চৌম্বক বিজ্ঞান—তড়িৎ বিজ্ঞানের এই শাখাটির প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী আঁদ্রে মারি অ্যাম্পেয়ার। অ্যাম্পেয়ারের পরে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী উরস্টেড আবিষ্কার করেন যে, তড়িৎ প্রবাহের ফলে চৌম্বক বলের সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উরস্টেডের আবিষ্কারের পরেই বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি ঐ দিকে ধাবিত হয় এবং ধীরে ধীরে উক্ত শাখাটি সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যায়। সেই সময় আরও অনেকে অবশ্য বিষয়টিকে নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য কেউ সরবরাহ করতে পারেননি।

যাঁর গবেষণাকে অবলম্বন করে তড়িৎ চৌম্বক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—তিনি প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বৈদ্যুতিক আধান বা চার্জকে ত্বরান্বিত করলে তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গের যে সৃষ্টি হয়, এই সত্যটি আবিষ্কার করেন। তিনি আরও জানালেন, ঐ তরঙ্গের গতিবেগ আলোকের গতিবেগের সমান। ম্যাক্সওয়েল তার তত্ত্বটিকে গাণিতিক নিয়মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কিন্তু পরীক্ষাগারে তরঙ্গের সৃষ্টি করতে সমর্থ হননি। তাঁর আবিষ্কারের তেইশ বছর পরে আর এক জার্মান বিজ্ঞানী হার্ৎস তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গকে গবেষণাগারে উৎপাদন করতে সক্ষম হন। সেই থেকে নানা দেশের বিজ্ঞানী আকর্ষণ অনুভব করেন ঐ তরঙ্গের প্রতি। অত্যল্পকালের মধ্যে ধরা পড়লো, হার্ৎস উৎপাদিত তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বেতার তরঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু নয়। গবেষণা থেকে আরও ধরা পড়লো তাপতরঙ্গ, আলোকতরঙ্গ, বেতারতরঙ্গ, এক্সরশ্মি প্রভৃতি সবাই তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। বেতারতরঙ্গের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়লো। সে বৈশিষ্ট্যটি হলো, বেতারতরঙ্গের উপর শব্দ কিংবা ছবির ছাপ ফেলে বহুদূরে পাঠানো যেতে পারে। ঐ আবিষ্কারটির জন্যই সম্ভব হয়েছে বেতারযন্ত্র ও টেলিভিসন। উক্ত পর্যায়ে ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর আছে মহত্তর অবদান।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পরমাণু বিজ্ঞান—উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি জটিল ও সঙ্কটময় সময়। উক্ত সময়টিতে আবিষ্কৃত হয়েছে ক্যাথোডরশ্মি ও এক্সরশ্মি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তৎক্ষণাৎ ঐ রশ্মিদ্বয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারেননি। অবশ্য তার মূলে অন্যান্য কতকগুলি কারণের মধ্যে একটি কারণ

ছিল, ডালটনের দেওয়া পরমাণুবাদের প্রতি গভীর আস্থা। সে সময়টাতে প্রতিটি বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল পরমাণু নিরেট ও অবিভাজ্য কণা।

পরমাণু সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা পরিবর্তনের সূত্রপাত হয় ক্যাথডরশ্মি সংক্রান্ত গবেষণা থেকে। সেদিন গোল্ডস্টাইন, ষ্টোনী, ক্রুকস্ লেনার্ড প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা ক্যাথোড নলের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর চাপকে ধাপে ধাপে কমিয়ে এবং তড়িৎ মোক্ষণ পাঠিয়ে অদ্ভুত সব ঘটনা লক্ষ্য করেন। শেষে চাপ কমিয়ে ·০১ মি. মি. পারদস্তম্ভের সমান করাতে দেখা গেল, নলটির অভ্যন্তরভাগ সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার হয়ে পড়লো অথচ ক্যাথোডের বিপরীত দিকের কাচের দেওয়াল হালকা সবুজ আলোয় দীপ্তিমান হয়ে উঠলো। এর কারণ তাঁরা কেউ নির্ণয় করতে পারলেন না। পরন্তু বহু বিজ্ঞানীকে পরীক্ষাটি উৎসাহিত করলো। অবশেষে ক্যাথোডরশ্মিকে নিয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে উইলিয়ম রয়েন্টজেন আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করলেন এক্সরে। এবার বিজ্ঞানীরা আরও দ্বিধায় পড়লেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত দ্বিধা নিরসন করলেন জে. জে. টমসন নেগেটিভ আধানযুক্ত ইলেকট্রন আবিষ্কার করে। পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সূচিত হল নতুন দিগন্ত। তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক—দুই দিক হল সমৃদ্ধ। প্রথমত লরেঞ্জ নামে হল্যাণ্ডের এক বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বক তত্ত্বের নিয়মাবলীকে কিছু কিছু পরিবর্তিত করে নতুন ইলেকট্রন তত্ত্ব উদ্ভাবন করলেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লরেঞ্জ সংশোধিত ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বকে বিজ্ঞানীরা প্রয়োগ করলেন আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে। কিন্তু ফল বিশেষ সুবিধাজনক হল না। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা দেখলেন তত্ত্বগত ফল ও পরীক্ষালব্ধ ফল হল সম্পূর্ণ বিপরীত। মহা দুশ্চিন্তা পেয়ে বসলো বিজ্ঞানীদের। শেষে ম্যাক্সপ্লাঙ্ক অবতারণা করলেন একটি নতুন তত্ত্বের। তত্ত্বটি কোয়াণ্টাম থিওরি বা কণাতম তত্ত্ব নামে পদার্থ বিজ্ঞানে পরিচিত। অবশ্য এই কণাতম তত্ত্বও সব সমস্যার সমাধান করতে পারল না। তখন আলোকের সমূহ ধর্মকে ব্যাখ্যা করার জন্য কণাতমতত্ত্ব ও তরঙ্গতত্ত্ব উভয় তত্ত্বকে বিজ্ঞানীরা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। তারপর হাইসেনবার্গ, দ্য ব্রগলি, ডিরাক প্রভৃতি বিজ্ঞানী "ওয়েভ অ্যাণ্ড কোয়াণ্টাম মেকানিকস" নামক তত্ত্বে কণা এবং তরঙ্গকে একীভূত করে সব সমস্যার সমাধান করলেন।

দ্বিতীয়ত পরমাণু সম্বন্ধেও প্রবর্তিত হল বৈপ্লবিক মতবাদ। জে. জে. টমসন প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, পরমাণু অবিভাজ্য কণা নয়। তার অভ্যন্তরে পজিটিভ আধান এবং নেগেটিভ আধানযুক্ত দু-রকমের কণিকা

আছে। পরমাণুর গঠনের একটি মডেলও তিনি উপস্থাপিত করেন। তাতে তিনি দেখালেন, পরমাণুর পজিটিভ আধান অতি ক্ষুদ্র একটি গোলকের মত বস্তুতে আছে আর তার গায়ে বিভিন্ন স্থানে ইলেকট্রনগুলো সজ্জিত আছে। টমসনের এই সিদ্ধান্ত পরে ভুল প্রমাণিত হয়।

পরমাণু সম্বন্ধে সঠিক ধারণা গড়ে উঠে বিজ্ঞানী বেকারেলের পরীক্ষা থেকে। তিনিই প্রথমে ইউরানিল পটাসিয়াম সালফেট নামক একটি লবণে তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান লাভ করেন। পরে এ-বিষয়ে ভালভাবে গবেষণা করেন রাদারফোর্ড, পিয়েরে কুরি ও মাদাম কুরি। পিয়েরে কুরি ও মাদামকুরির পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার পরমাণু বিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়ন করে। অতঃপর রাদারফোর্ড তেজস্ক্রিয় ধাতু বা তেজস্ক্রিয় ধাতুর লবণ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গত রশ্মিকে চৌম্বকক্ষেত্রে পরিচালিত করে আলফারশ্মি ও বিটারশ্মি আবিষ্কার করেন। তিনি এবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, পরমাণুর পজিটিভ আধান অতি ক্ষুদ্র একটি জায়গায় অবস্থান করে এবং ইলেকট্রনগুলি দূরে দূরে অবস্থান করে। ডেনমার্কের পদার্থ বিজ্ঞানী নীলস বোর রাদারফোর্ডের তত্ত্বকেও অস্বীকার করেন। তিনি যে নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেন সেটি হল, পরমাণুর কেন্দ্রে আছে কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস। তারমধ্যে পিণ্ডাবদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করে পজিটিভ আধানযুক্ত কণা প্রোটন, নিস্তড়িৎ কণা নিউট্রন এবং আরও কতকগুলি কণিকা। আর ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণা ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট কক্ষপথে কেন্দ্রকের চারদিকে পরিভ্রমণ করে। তিনি আবার পরমাণুকে সৌরজগতের সঙ্গে তুলনা করেন। সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল যেমন সূর্য তেমনই পরমাণুর কেন্দ্রস্থল কেন্দ্রক। অপরপক্ষে সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন গ্রহরা আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে ঠিক তেমনই ইলেকট্রনরা পরিভ্রমণ করে নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে। পরে সোমার ফিল্ড প্রমাণ করেন, ইলেকট্রনদের কক্ষপথ ঠিক বৃত্তাকার নয়—একরকম বৃত্তাভাস পথে পরিভ্রমণ করে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ অনুসারে ইলেকট্রনদের পথের অয়নচলনও আছে।

পরমাণুর কেন্দ্রকে অবস্থান করে প্রোটন, নিউট্রন, ভি-কণা, মেসন, অ্যান্টি-প্রোটন, অ্যান্টি-ইলেকট্রন প্রভৃতি বহু কণিকা। নিউট্রনের আবিষ্কর্তা ইংরাজ বিজ্ঞানী চ্যাড্‌উইক এবং মেসনের আবিষ্কর্তা জাপানী বিজ্ঞানী য়ুকাওয়া। মেসন কণিকা সম্বন্ধে ভারতীয় বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসুও গবেষণা করেছিলেন এবং কতকগুলি মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছিলেন। ইংরাজ বিজ্ঞানী সি. টি. আর উইলসনের আবিষ্কৃত ক্লাউড চেম্বারে প্রোটন ও

ইলেকট্রনের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বাহিরে পরিভ্রমণরত ইলেকট্রনদের সম্পর্কে পরবর্তীকালে বহু গবেষণা হয়েছে এবং "বোর-তত্ত্ব" সম্বন্ধেও হয়েছে অনেক বিতর্ক। অবশেষে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রবর্তিত হওয়ায় বোর-তত্ত্বকেও কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। এই পর্যায়ে হাইসেনবার্গ, জীম্যান, পাউলি প্রভৃতি বিজ্ঞানীর অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পরমাণুর গঠনতত্ত্ব ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়ে গবেষণা দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত ছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী অ্যাসটন আবিষ্কার করেছেন সমস্থানিক মৌল বা আইসোটোপ্। তাঁদের আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানী লরেন্স আবিষ্কার করেন সাইক্লোট্রন যন্ত্র, কক্‌রফট ও ওয়ালটন আবিষ্কার করেন ত্বরণ যন্ত্র ও বিভাট্রন যন্ত্র। এইসব যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণুকে বিভাজন করাও সম্ভব হলো। তারই পরোক্ষ ফল ইরেন জোলিও কুরি এবং ফ্রেডরিক জোলিওর কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার। অপরদিকে অটোহান ও ট্রাসমানের গবেষণা থেকে প্রকাশিত হল পরমাণু বিভাজনের ফলে উৎপন্ন প্রচণ্ড তাপশক্তির কথা। একদিকে চললো পরমাণুর ধ্বংসাত্মক দিক সম্বন্ধে গবেষণা অপরদিকেও শুরু হল পরমাণুর শক্তিকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার প্রচেষ্টা। আবিষ্কৃত হল শক্তিশালী পরমাণু বোমা—যা বর্তমান কালের প্রত্যেকটি শান্তিপ্রিয় মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। পরমাণুর কল্যাণকর দিকও উন্মোচিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থকে নিয়োজিত করেছে দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের কাজে। এনরিকো ফার্মি উদ্ভাবন করেছেন পরমাণু শক্তি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা। পরমাণু শক্তির যে বিপুল সম্ভাবনার দিক আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হয়েছে তার পশ্চাতে আছে উপরোক্ত বিজ্ঞানীদের মহান্ অবদান।

আপেক্ষিকবাদ—আপেক্ষিকবাদের প্রচারক মহামনীষী আইনস্টাইন। ঐ তত্ত্বটির মাধ্যমে তিনি বিজ্ঞানজগৎটাকে যেন চমকে দিয়েছিলেন। এই মতে পদার্থের ভর ও শক্তি—দুটি পৃথক সত্তা নয়—একই সত্তার দুটি ভিন্নরূপ। প্রকৃতপক্ষে আপেক্ষিকবাদই কোয়ান্টাম থিওরি ও তরঙ্গবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে—যা দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হননি। এই আপেক্ষিকবাদ একদিকে যেমন নিউটনের মহাকর্ষসূত্র, গতিবিদ্যা প্রভৃতির সহজ ব্যাখ্যা প্রদান করলো, অপরদিকে তেমনই বহু নতুন তত্ত্বেরও জন্মদান করলো। পরবর্তীকালে ঐ তত্ত্বটি থেকে কোন পদার্থ-বিজ্ঞানী মুক্তিলাভ করতে পারেননি। এইখানেই আইনস্টাইনের বৈশিষ্ট্য।

পরের দিকে পদার্থ-বিজ্ঞানে যে সমস্ত আবিষ্কার হয়েছে তার মূলেও আছে আইনস্টাইন প্রবর্তিত আপেক্ষিকবাদ। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অটোহান ও ট্রাসমান ভারি পরমাণুকে বিভাজন করে যে প্রচণ্ড শক্তির কথা প্রকাশ করেছিলেন, সেই শক্তিকে পরিমাপ করা হয়েছিল আইনস্টাইন প্রবর্তিত জড় ও শক্তির সমতুল্যতাবাচক সূত্রটির দ্বারা। আরও আশ্চর্যের কথা, আপেক্ষিকবাদ থেকে যে বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার অধিকাংশই এখন অনাবিষ্কৃত এবং ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়।

প্লাজমা—"প্লাজমা" অবস্থাকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলা হয়। আমরা সাধারণত জানি, পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয়—এই তিন অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, পদার্থের চতুর্থ অবস্থাও আছে। এই অবস্থাকে বলা হয় বস্তুর "প্লাজমা" অবস্থা।

মৌলিক পদার্থের পরমাণু মাত্রেই ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি দিয়ে গঠিত। প্রোটনরা তড়িৎ ধনাত্মক, ইলেকট্রনরা তড়িৎ ঋণাত্মক এবং নিউট্রনরা নিস্তড়িৎ কণা। কেন্দ্রকে যত সংখ্যক তড়িৎ ধনাত্মক কণা প্রোটন থাকে, বাহিরে থাকে ঠিক ততটি ঋণাত্মক কণা ইলেকট্রন। তাই পরমাণুকে তড়িৎ নিরপেক্ষ বলে মনে হয়। যদি উচ্চ তাপমাত্রায় কোন গ্যাসীয় পদার্থকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিয়োজিত করে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানে বিভক্ত করা যায় এবং গ্যাসের মধ্যে ধনাত্মক আধান ও ঋণাত্মক আধান সমান সমান সংখ্যায় থাকে তাহলে ঐ গ্যাসকেও পরীক্ষা করলে তড়িৎ নিরপেক্ষ বলেই মনে হবে। পদার্থের এই অবস্থাকে তখন বলা হবে প্লাজমা অবস্থা। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আয়ন মণ্ডলের বিরল বায়ুকণা প্লাজমা অবস্থায় আছে।

প্লাজমা অবস্থাও বস্তুর শেষ অবস্থা নয় বলে অনেকের বিশ্বাস। তাঁরা মনে করেন, পদার্থের পঞ্চম অবস্থাই হচ্ছে শেষ অবস্থা। বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিক ভাবে মেনে নিয়েছেন, পদার্থ কঠিন, তরল, গ্যাসীয় ও প্লাজমার স্তর অতিক্রম করে এলে তখন তার পরমাণু থেকে কেবলমাত্র ইলেকট্রনরা বিচ্যুত হবে না কেন্দ্রক থেকে প্রোটন ও নিউট্রনরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান করবে। পদার্থের এই শেষ অবস্থা বিজ্ঞানীরা এখনও প্রমাণ করতে পারেন নি। তাঁদের মতে গ্যাসকে শেষ অবস্থায় আনতে হলে কোটি কোটি ডিগ্রি তাপমাত্রার প্রয়োজন। এত তাপ পৃথিবীর মানুষের পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। তাই পদার্থের শেষ অবস্থার তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত এখন

এইভাবেই থেকে গেছে। এর সত্যতা যাচাই করবেন ভবিষ্যৎকালের বিজ্ঞানীরা।

শক্তির কথা—শক্তি বলতে বিজ্ঞানে বোঝায়—যা কাজ করার ইন্ধন দান করে। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি বস্তুর পেছনে কোন না কোন শক্তি কাজ করছে। অদৃশ্য মহাশক্তি বলে গতিশীল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নক্ষত্রজগৎ সবাইকে পরিক্রমা করতে হচ্ছে সেই মহাশক্তি বলে।

আমাদের পৃথিবীর দিকে তাকালেও শক্তির বিভিন্ন রূপ চোখে পড়ে। আকাশে বিদ্যুতের প্রকাশ, প্রচণ্ড ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা—সবারই মূলে আছে কোন না কোন শক্তি। দৈনন্দিন কাজেও আমরা ব্যবহার করছি নানা ধরণের শক্তিকে। বিজ্ঞানীরা এই সব শক্তিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রধান বিভাগগুলি হল—(১) যান্ত্রিক শক্তি, (২) তাপশক্তি, (৩) আলোক শক্তি, (৪) চৌম্বক শক্তি, (৫) বিদ্যুৎশক্তি, (৬) রাসায়নিক শক্তি, (৭) নিউক্লিয়ার শক্তি।

যান্ত্রিক শক্তির দুটি রূপ, স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি। ছাদের কার্নিশে রাখা ইটের কোন কর্মক্ষমতা নেই বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু যখনই ঐ ইটটা নিচে পড়ে যায়, তখন কারও মাথায় পড়লে রক্ষে নেই। ইটের মধ্যে যে শক্তি ছিল—সেটি স্থিতিশক্তি। আর ইটটা যখনই পড়ে গেল, তখনই স্থিতিশক্তিটা গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হল। অন্যদিকে গতিশীল কোন বস্তুকে থামাতে হলে আমাদের বল প্রয়োগ করতে হয়। বর্তমান গতির যুগে বিজ্ঞানীরা প্রথম থেকে গতিশক্তিকে মাপতে চেষ্টা করেছেন। এই উদ্দেশ্যে যে এককটির তাঁরা প্রচলন করেছিলেন—সেটির নাম অশ্বশক্তি।

তাপশক্তির কথা আজকাল কে না জানে? আমরা রান্না করি তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে। মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাপশক্তিকেই ব্যবহার করা হয়। সূর্যের তাপে পৃথিবীর জলভাগ থেকে জল বাষ্পাকারে উপরে উঠে যায়, পরে সেই বাষ্প থেকে মেঘ জমে এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি আবার জমা হয় খাল, বিল, নদী, সমুদ্রে। পুনরায় ঘটে বাষ্পীভবন, তারপর মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদি। তার ফলেই আমাদের ধরণী এমন শস্যশ্যামলা ও প্রাণচঞ্চলা।

সূর্য হচ্ছে তাপ ও আলোক শক্তির মূল উৎস। পর্যাপ্ত আলো না লাভ করলে পৃথিবী জীববাসের অযোগ্য হয়ে পড়তো। যেমন আলোর অভাবে

সূর্যের সুদূরের গ্রহগুলি কেবল বরফের রাজ্য এবং উন্নত জীবগোষ্ঠীর বাসের অযোগ্য। উদ্ভিদের বেঁচে থাকতে হলেও সূর্যের কিরণ প্রয়োজন। তারা সূর্যালোক ব্যতীত খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। আজকের দিনের মানুষ আবার সূর্যরশ্মিকে সরাসরি গ্রহণ ও সঞ্চয় করে সৌরশক্তি উৎপাদনে বদ্ধ পরিকর। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই শতাব্দীর শেষের দিকে সৌরশক্তির ব্যাপকভাবে ব্যবহার সুরু হয়ে যাবে।

চুম্বক শক্তির দ্বারা লোহা চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয়। চুম্বক শক্তিকে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করার জন্য মানুষ আবিষ্কার করেছে বৈদ্যুতিক মোটর, জেনারেটার প্রভৃতি।

প্রবাহী তড়িৎ আবিষ্কারের পর মানুষ বিদ্যুৎশক্তির বিরাট সম্ভাবনার কথা টের পায়। আবিষ্কারকদের কৃপায় আজ বিদ্যুৎ আমাদের আজ্ঞাবাহী। ট্রাম চলছে, ট্রেন চলছে, কত কলকারখানা চলছে, ঘর-বাড়ি-রাস্তা-ঘাট আলোকিত হচ্ছে। ব্যবহারিক জীবনে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, হিটার, রেডিও, টেলিভিসন প্রভৃতি বিদ্যুতেরই অবদান।

রাসায়নিক শক্তির বড় ভাণ্ডার কয়লা ও পেট্রোলিয়াম। সূর্যতাপ দ্বারা গাছ-গাছড়া ও জীবদেহে সৌরতাপ সঞ্চিত হয়। সেই গাছগাছড়া ও জীবদেহ অতীতে আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মাটি চাপা পড়েছিল। কোটি কোটি বছরের পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ চাপ ও তাপের প্রভাবে সেইগুলি রূপান্তরিত হয়েছে কয়লা ও পেট্রোলিয়ামে। অতএব এগুলিও পরোক্ষ সৌরশক্তি।

নিউক্লিয়ার শক্তির সঙ্গে মানুষের পরিচয় খুব বেশীদিনের নয়। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরমাণুর ভাঙ্গনে যে বিপুল শক্তি উৎপন্ন হয়—এই সত্যটি প্রথম ধরা পড়ে। সেদিন ঐ শক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছিল ধ্বংসাত্মক কাজে। তবে এর ভয়াবহতা এখনও দূর হয়নি, বরং বেড়েই চলেছে।

নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটারের মাধ্যমে নিউট্রন নিয়ন্ত্রক বস্তু বা মডারেটার ব্যবহার করে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে বিভাজিত করা হয়। এর ফলে উৎপন্ন হয় প্রচণ্ড তাপশক্তি এবং এই তাপশক্তিকে রূপান্তরিত করা হয় বিদ্যুৎ শক্তিতে।

অপরদিকে সূর্যের যে এত শক্তি, তার মূলে আছে পারমাণবিক শক্তি। প্রতি সেকেণ্ডে টন টন হাইড্রোজেন পরমাণু প্রচণ্ড তাপেই উৎপন্ন করছে হিলিয়ামকে। তাই তার এত তেজ।

পদার্থ ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানে প্রধান প্রধান আবিষ্কার

সাল	আবিষ্কার	আবিষ্কারক
খ্রীঃ পূঃ ৬০০	ঘর্ষণে তড়িতের উৎপত্তি	থেলস (গ্রীস)
খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতক	লিভার ও তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব	আর্কিমিদিস (গ্রীস)
খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক	আলোক প্রতিফলনের সূত্র	টলেমি (গ্রীস)
খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক	বাষ্পীয় টারবাইন	হিরো (গ্রীস)
খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী	লেন্সের বিবর্ধন	ইবন অল হয়থাম (আরব)
খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী	আলোর তরঙ্গবাদের কল্পনা	দা ভিঞ্চি (ইতালি)
১৪৫০	ছাপার যন্ত্র	গুটেনবার্গ (জার্মানী)
১৬০০	চুম্বকের গুণাবলী	গিলবার্ট (ইংলণ্ড)
১৫৯০	যৌগিক অণুবীক্ষণ	জানসেন (হল্যাণ্ড)
১৬০৪	দূরবীন	লিপারশে (হল্যাণ্ড)
১৬০৯	গ্যালিলিয়ান দূরবীন	গ্যালিলিও (ইতালি)
১৬৪৩	ব্যারোমিটার	টরিসেলি (ইতালি)
১৬৪৬	উদস্থিতি বিদ্যার একটি সূত্র	ব্লেইজ প্যাস্কাল (ফ্রান্স)
১৬৫৬	পেণ্ডুলামযুক্ত ঘড়ি	হাইঘেনস (নেদারল্যাণ্ড)
১৬৬০	এয়ার পাম্প	অটো ভন গেরিক (জার্মানী)
১৬৬৫	মহাকর্ষ সূত্র	নিউটন (ইংলণ্ড)
১৬৭৮	স্থিতিস্থাপকতার সূত্র	হুক (ইংলণ্ড)
১৭১৪	পারদ থার্মোমিটার	ফারেনহাইট (জার্মানী)
১৭৪২	সেন্টিগ্রেড স্কেল	সেলসিয়াস (সুইডেন)
১৭৬১	লীন তাপ	জোসেফ ব্লাক (ফ্রান্স)
১৭৬৫	বাষ্পীয় ইঞ্জিন	জেমস ওয়াট (স্কটল্যাণ্ড)
১৭৬৭	সূতাকাটার কল	জে, হারগ্রীবস (ইংলণ্ড)
১৭৮৬	তড়িতের সাহায্যে ব্যাঙের পেশীকুঞ্চন	গ্যালভ্যানি (ইতালি)
১৭৮৮	বেলুন	মঁগলফিয়ে ভ্রাতৃদ্বয় (ফ্রান্স)

সাল	আবিষ্কার	আবিষ্কারক
১৮০০	ভোলটীয় স্তূপ	ভোল্টা (ইতালি)
১৮০১	স্টীম লকোমটিভ	আর ট্রেভিথিক (ইংলণ্ড)
১৮০৩	স্টীম বোট	রবার্ট ফুলটন (আমেরিকা)
১৮১৬	সেফটিল্যাম্প	হামফ্রে ডেভি (ইংলণ্ড)
১৮১৯	স্টেথস্কোপ	লেনেক (ফ্রান্স)
১৮২০	চুম্বকের উপর তড়িৎ প্রবাহের ফল	উরস্টেড (ডেনমার্ক)
১৮২২	তাপীয় ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী	মাদিকার্নট (ফ্রান্স)
১৮২৫	তড়িৎ চুম্বক	ডাব্লু স্টারজন (ইংলণ্ড)
১৮২৬	ওহম সূত্র	জর্জ সাইমস ওহম (ইংলণ্ড)
১৮৩১	তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের সূত্র	ফ্যারাডে (ইংলণ্ড)
১৮৩২	টেলিগ্রাফ	স্যামুয়েলমোর্স (আমেরিকা)
১৮৩৩	তড়িৎ বিশ্লেষণের সূত্র	ফ্যারাডে (ইংলণ্ড)
১৮৩৫	পিস্তল	কোল্ট (আমেরিকা)
১৮৩৬	ড্যানিয়েলকোচ	জন ড্যানিয়েল (ইংলণ্ড)
১৮৩৭	ফটোগ্রাফী	ডাগোরে (ফ্রান্স)
১৮৪০	হাইগ্রোমিটার	রেনোঁ (ফ্রান্স)
১৮৪১	তড়িৎ প্রবাহের তাপীয়ফল	জুল (ইংলণ্ড)
১৮৪২	বাইসাইকেল	ম্যাকমিলান (স্কটল্যাণ্ড)
১৮৪৬	সেলাইকল	ইলিয়াস হাউই (আমেরিকা)
১৮৫৯	স্পেকট্রোস্কোপ	কিরসফ বুকমার (জার্মানী)
১৮৫৯	সঞ্চয়ক কোষ	প্ল্যান্টি
১৮৬০	ডায়নামো	পিকিপটটি (ইতালি)
১৮৬১	মেশিনগান	আর, জে, গ্যাটলিং (আমেরিকা)
১৮৬৫	তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত	ম্যাক্সওয়েল (জার্মানী)
১৮৬৫	ল্যাকল্যান্সি কোষ	ল্যাকল্যান্সি (ইংলণ্ড)
১৮৬৬	টর্পেডো	ওয়াইট হেড (ইংলণ্ড)
১৮৬৮	টাইপরাইটার	সি, সোলস (আমেরিকা)
১৮৭৬	টেলিফোন	গ্রেহামবেল (আমেরিকা)
১৮৭৯	ক্যাথড রে সংক্রান্ত গবেষণা	ক্রুকস (ইংলণ্ড)

সাল	আবিষ্কার	আবিষ্কারক
১৮৭৯	ইলেকট্রিক বাল্ব	এডিসন (ইংলণ্ড)
৮৮৩	বাষ্পীয় টারবাইন	ডি, লাভেল (সুইডেন)
১৮৮৫	ইনটারন্যাল কম্বাসন ইঞ্জিন	জি, ডেমলার (জার্মানী)
১৮৮৫	লাইনো টাইপ	ও, মার্গেনথেলার (আমেরিকা)
১৮৮৭	গ্রামোফোন	বারলাইনার (আমেরিকা)
১৮৮৮	বেতার তরঙ্গ	হার্ৎস (জার্মানী)
১৮৮৮	কোডাক	জর্জ ইস্টম্যান (আমেরিকা)
১৮৮৮	বায়ুভরা টায়ার	ডানলপ (আয়ার্ল্যাণ্ড)
১৮৯১	সাবমেরিন	জোহন, পি, হল্যাণ্ড (আমেরিকা)
১৮৯২	ইলেকট্রিক মোটর	সিকোলা তেসলা (আমেরিকা)
১৮৯৫	ডিজেল ইঞ্জিন	রুডলফ ডিজেল (জার্মানী)
১৮৯৫	রেডিও	মার্কনি (ইতালি)
১৮৯৫	ক্যাথড্‌রের স্বরূপ	জিন, পেরিন (ফ্রান্স)
১৮৯৫	এক্সরে	রয়েন্ট-জেন (জার্মানী)
১৮৯৫	সেফটিরেজার	জিলেট (আমেরিকা)
১৮৯৭	আলফারশ্মি ও বিটারশ্মি	রাদারফোর্ড (ইংলণ্ড)
১৯০০	নামারশ্মি	ভিলার্ড
১৯০০	ট্রাকটার	বি, হোল্ড (আমেরিকা)
১৯০০	কোয়ালটাম থিওরি	ম্যাকস্প্লাঙ্ক (জার্মানী)
১৯০৩	উড়োজাহাজ	রাইট ভ্রাতৃদ্বয় (আমেরিকা)
১৯০৬	তেজস্ক্রিয়তা	হেনরি বেকারেল (ফ্রান্স)
১৯০৬	পরমাণুর মডেল	রাদারফোর্ড (ইংলণ্ড)
১৯০৭	বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার	মাইকেলসন (আমেরিকা)
১৯০৮	রঙিন ফটোগ্রাফীর জন্য নোবেল পুরস্কার	লিপম্যান (ফ্রান্স)
১৯১০	ভ্যাণ্ডার ওয়ালস সমীকরণের জন্য নোবেল পুরস্কার	ডি, ভ্যাণ্ডারওয়াল (ইংলণ্ড)
১৯১০	মহাজাগতিক রশ্মি	হেস ও কোহলস্টার (অস্ট্রিয়া)
১৯১১	গ্যাসীয় অণুপরমাণুর ভরনির্ণয়	জে, জে, টমসন (ইংলণ্ড)
১৯১১	মেঘ প্রকোষ্ঠ	সি, টি, আর উইলসন (ইংলণ্ড)

সাল	আবিষ্কার	আবিষ্কারক
১৯১১	শীততাপ নিয়ন্ত্রণ	ডাব্লু, এইচ, ক্যারিয়ার (আমেরিকা)
১৯১৩	পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে তথ্য	নীলস্ বোর (ডেনমার্ক)
১৯১৩	হিলিয়ামের তরলীকরণের জন্য নোবেল পুরস্কার	ক্যামার লিঙ ওননেম (হল্যাণ্ড)
১৯১৪	মৌলের অ্যাটমিক নাম্বার নির্ণয়	মোসলে (ইংলণ্ড)
১৯ ৪	ট্যাঙ্ক	ই, সুইনটন (ইংলণ্ড)
১৯১৫	বোরের পরমাণুমডেল সংশোধন	সোমারফিল্ড (জার্মানী)
১৯১৫	আপেক্ষিকতাবাদ	আইনস্টাইন (জার্মানী)
১৯:৯	আইসোটোপ	অ্যাসটন (ইংলণ্ড)
১৯১৯	কৃত্রিম উপায়ে মৌলান্তর	রাদারফোর্ড (ইংলণ্ড)
১৯২১	ফটো ইলেকট্রিক সূত্রের জন্য নোবেল পুরস্কার	আইনস্টাইন (জার্মানী)
১৯২২	রেডার	টেলার ও ইয়ং (আমেরিকা)
১৯২৪	লাউড স্পীকার	পিনকেলয় (আমেরিকা)
১৯২৬	টেলিভিসন	জোহন এল, বেয়ার্ড (ইংলণ্ড)
১৯২৬	ব্রাউনীয় গতি আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার	জিন পেরিন (ফ্রান্স)
১৯২৯	তরল জ্বালানীপূর্ণ রকেট	এইচ গর্ডাড (আমেরিকা)
১৯৩০	রমন এফেক্টের জন্য নোবেল পুরস্কার	সি, ভি, রমন (ভারত)
১৯৩২	সাইক্লোট্রন যন্ত্র	লরেন্স ও লিভিংস্টোন (ইংলণ্ড)
১৯৩৩	পারমাণবিক তত্ত্বের জন্য নোবেল পুরস্কার	ডিরাক (ইং), শ্রোডিঙ্গার (অষ্ট্রিয়া)
১৯৩১	সিনেমাস্কোপ	হেনরি ক্রেটিয়াস (ফ্রান্স)
১৯৩২	পজিট্রন	ডিরাক (ইংলণ্ড)
১৯৩৮	নিউট্রনের সাহায্যে নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার	এনরিকো ফার্মি (আমেরিকা)
১৯৩৯	হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের সংযোজন	বেথে (আমেরিকা)
১৯৪২	ইউরেনিয়াম বিভাজনে উৎপন্ন তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর	এনরিকো ফার্মি (ইতালি)

সাল	আবিষ্কার	আবিষ্কারক
১৯৪৩	প্রোটনের ম্যাগনেটিক মোমেন্ট আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার	অটো স্টার্ন (জার্মানী)
১৯৪৪	নিউক্লিয়াসের চৌম্বক ধর্ম আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার	আইজাকরাবি (আমেরিকা)
১৯৪৫	এক্সক্লুশন সূত্রের জন্য নোবেল পুরস্কার	পাউলি (আমেরিকা)
১৯৫১	ফেজ কনডাক্ট মাইক্রোস্কোপ	এফ, জার্নিক (নেদারল্যাণ্ড)
১৯৫১	কৃত্রিমভাবে পরমাণুর নিউক্লিয়াস উৎপাদনের জন্য নোবেল পুরস্কার	ককক্রফট (ইং) ও ওয়ালটন (আয়ার্ল্যাণ্ড)
১৯৫৪	কোয়াণ্টাম মেকানিক্স এর উপর তথ্যের জন্য নোবেল পুরস্কার	জর্জ বোথ (জার্মান)
১৯৫৬	ট্রানজিস্টার আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার	সকলে, বারডিন ও ব্রাটেন
১৯৫৭	চেরেনকভ এফেক্টের জন্য নোবেল পুরস্কার	সুঙ তাও লেক ও চেননি ইয়াং (চীন)
১৯৫৯	অ্যান্টিপ্রোটন—এমিলিও সেনরে ও ওয়েন চেম্বারলেন	(আমেরিকা)
১৯৬১	মোসবাউয়ার এফেক্টের জন্য নোবেল পুরস্কার	আর, এল, মোসবাউ (জার্মানী)
১৯৬৯	পারমাণবিক কণিকার শ্রেণীবিভাগ	এম, গেল মাস (আমেরিকা)
১৯৭১	হলোগ্রাফিক পদ্ধতি	ডেনিস গ্যাবর (ইংলণ্ড)
১৯৭২	অতি পরিবাহিতা তত্ত্বের জন্য নোবেল পুরস্কার	বার্ডিন, কুপার ও স্রিফার (আমেরিকা)
১৯৭৩	সেমিকনডাকটার সম্বন্ধে তথ্য	এসাকি, গিয়াভার ও জোসেফসন্
১৯৭৪	বেতার তরঙ্গের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ	রাইন ও হিউইস (ইংলণ্ড)
১৯৭৭	সৌরকোষ ও যন্ত্রগণক আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার	ফ্যানভেলক, নেভিলসট ও এণ্ডারসন

সাল	আবিষ্কার	আবিষ্কারক
১৯৭৯	পরমাণু কেন্দ্রের উইকফোর্সের চরিত্র উদ্‌ঘাটনের জন্য নোবেল পুরস্কার	আবদাস সালাম (পাকিস্তান) স্টিভেন উইনবার্গ ও গ্ল্যাশো (ইংলণ্ড)
১৯৮০	ল অব্ সিমেট্রি	ভ্যালফিচ ও জেমসক্রনিনের নোবেল পুরস্কার (আমেরিকা)
১৯৮১	লেসার বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য নোবেল পুরস্কার	বারগেন ও সাউলো (মার্কিন)

চিকিৎসাবিজ্ঞান

ক্রমবিকাশ ঃ—বিজ্ঞানের এই শাখাটিও অত্যন্ত প্রাচীন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে মিশরে এক ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন ছিল। মিশরীয়দের ধারণা ছিল, অপদেবতা ভর করলেই অসুখ হয়। সেকালে মিশরের রাজা জোসেরের মন্ত্রী ইমহোতোপ ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ ও চিকিৎসক। অধুনা আবিষ্কৃত মিশরের "প্যাপিরাসে" প্রাচীন মিশরের চিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ আছে। সেই নিদর্শন থেকে জানা যায়, মিশরীয় চিকিৎসকগণ মনে করতেন মানুষের হৃৎপিণ্ডই রক্ত সঞ্চালনের অঙ্গ। তাঁরা আফিম, তামা, পেঁয়াজ, মধু, খেজুর, খমির প্রভৃতি ঘটিত ওষুধ ব্যবহার করতো। শল্য চিকিৎসারও উদ্ভব হয়েছিল সে সময়ে।

ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবি ক্ষোদিত আইন থেকে জানা যায়, প্রাচীন মেসোপটেমিয়া এবং ব্যাবিলনেও চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন ছিল। তবে সুমেরীয়দের চিকিৎসাবিদ্যা ছিল যাদুবিদ্যা নির্ভর। মিশরীয়দের মত তারা বিশেষ কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি। হামুরাবির আইনে শল্য চিকিৎসারও উল্লেখ আছে। কিন্তু মিশরে প্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শনগুলিতে চিকিৎসা পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ নেই। পরবর্তীকালে মিশরে আসিরীয় অধিকার স্থাপিত হলে সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। আসিরীয় যুগের একজন চিকিৎসকেরও নাম পাওয়া যায়। তাঁর নাম আরাদ নিনাই। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি জীবিত ছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস।

বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের মত গ্রীকরাও চিকিৎসা বিজ্ঞানকে নিয়ে

গবেষণা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার সূচনা তাঁদেরই হাতে। প্রাচীন গ্রীসের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলা হয় ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। দার্শনিক পিথাগোরাসই এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। তিনিই প্রথম রোগীর মানসিক অবস্থার ভিত্তিতে রোগ চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন।

রোগের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন হিপ্পোক্রাতেশ। তিনি চিকিৎসকদের অবশ্য অনুসরণীয় দশটি নীতির প্রবর্তন করেন। সেই নীতিগুলির অধিকাংশ আজও চিকিৎসকগণ মেনে চলেন। এই সব কারণে হিপ্পোক্রাতেশকে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার জনক আখ্যা দেওয়া হয়।

দার্শনিক অ্যারিস্তোতলও চিকিৎসা শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। পণ্ডিতদের মতে তুলনামূলক শারীর সংস্থান বা কমপারেটিভ অ্যানাটমির ভিত্তি স্থাপন করেছেন তিনিই। অ্যারিস্তোতলের পর যাঁর অবদানকে স্বীকার করতে হয় তিনি রোমান যুগের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ক্লাউদিয়স গেলেন। আনুমানিক ১৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি কয়েকটি "নার্ভ" আবিষ্কার এবং চেষ্টীয় ও সংবেদী (মোটর ও সেনসরি) নার্ভের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ। শারীর সংস্থান সম্বন্ধে তিনি আরও কতকগুলি তথ্য প্রচার করেছিলেন। সেগুলি "গেলেনের তথ্য" নামে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পরিচিত। প্রায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত চিকিৎসকগণ গেলেনের তথ্যগুলিকে অন্ধের মত অনুসরণ করে এসেছিলেন। পরে আধুনিক উন্নত শারীরবিদ্যা তাঁর তথ্যের মধ্যে কিছু কিছু ভুল লক্ষ্য করে।

সেকালের ভারতবর্ষ ছিল চিকিৎসাবিদ্যায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদে নানাপ্রকার রোগের উল্লেখ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। সেকালে ভারতের চিকিৎসা শাস্ত্র আটটি শাখায় বিভক্ত ছিল। শাখাগুলি হল কায়চিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, শলাক্যচিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ন ও বাজীকরণ। আট শাখায় বিভক্ত চিকিৎসা শাস্ত্রকে বলা হতো, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র। আরও আশ্চর্যের কথা, সেযুগে ভারতে কেবলমাত্র মানুষের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না, পশু-পাখি এমনকি গাছপালারও চিকিৎসা করা হতো।

ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে "চরক সংহিতা" ও "সুশ্রুত সংহিতা"য়। দুটিই সঙ্কলন গ্রন্থ। চরক সংহিতা প্রধানতঃ কায়চিকিৎসা প্রধান এবং আত্রেয়শিষ্য অগ্নিবেশ রচিত "অগ্নিবেশ সংহিতা"র রূপান্তর। আর সুশ্রুত সংহিতা শল্যচিকিৎসার পুস্তক এবং কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরিশিষ্য সুশ্রুত কর্তৃক সংকলিত। পরবর্তীকালে নাগার্জুন

পুস্তকখানি পুনর্লিখিত করেন।

সুশ্রুত সংহিতা প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি বিরাট বিস্ময়। এই পুস্তকে কর্তিত নাসার পুনর্গঠন, ত্বক অধিরোপন এবং শব ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে অঙ্গের সংস্থান নির্ণয়ের উল্লেখ আছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, আধুনিক প্লাষ্টিক সার্জারী ও অধিরোপন পদ্ধতি প্রাচীন ভারতবর্ষে উদ্ভব হয়েছিল। সুশ্রুত সংহিতায় ধাত্রীবিদ্যারও উল্লেখ আছে। চরক ও সুশ্রুত ব্যতীত প্রাচীন ভারতের আরও কয়েকজন চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে জীবক ও নাগার্জুন বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম। জীবক ছিলেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। কথিত আছে, বুদ্ধদেবের পায়ের বিষাক্ত ক্ষত তিনিই নিরাময় করেছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসার এবং তৎপুত্র অজাতশত্রুর আমলে তিনি ছিলেন রাজ চিকিৎসক। তিনি রোগীকে দেখেই রোগ নির্ণয় করতে পারতেন—এমন প্রবাদও আছে। বহু দূরবর্তী স্থান থেকে হাজার হাজার মানুষ আসতো তাঁর কাছে চিকিৎসা হওয়ার জন্য। জীবক ছিলেন ভগবান বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবক। একবার বুদ্ধের কঠিন অসুখ হলে তিনি বুদ্ধের কাছে প্রেরণ করেছিলেন বুদ্ধের প্রিয় একটি পদ্মফুল। বুদ্ধ খুশি হয়ে পদ্মের ঘ্রাণ নিয়েছিলেন। তাতেই বুদ্ধ আরোগ্যলাভ করেছিলেন।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক নাগার্জুন প্রাচীন ভারতের এক বিরাট বিস্ময়। তিনিই প্রথম লৌহ, পারদ প্রভৃতি ধাতুকে ওষুধরূপে প্রয়োগ করেছিলেন। ধাতুঘটিত বহু ওষুধের তিনি আবিষ্কর্তা। চিকিৎসকদের সুবিধার্থে একাধিক শাস্ত্রও তিনি রচনা করেছিলেন। সুশ্রুত সংহিতার সংস্কার তাঁর অন্যতম কীর্তি। নাগার্জুন রসবৈদ্য সম্প্রদায় নামে একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস।

প্রাচীন ভারতের আর এক বিস্ময় মহর্ষি পতঞ্জলি। পতঞ্জলি দার্শনিক, বৈয়াকরণিক ও রসায়ন শাস্ত্রজ্ঞ হিসাবে অধিক পরিচিত। অনেকের মতে পতঞ্জলি অসাধারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানীও ছিলেন। কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন, চরক সংহিতা পতঞ্জলিরই রচনা। অসাধারণ মানবদরদী পতঞ্জলি মানুষের ত্রুটিগুলি দূর করতে চেয়েছিলেন। মনের দোষ নিবারণের জন্য পাতঞ্জল দর্শন, বাক্যের দোষ নিবারণের জন্য ব্যাকরণ এবং শরীরের দোষ নিবারণের জন্য রচনা করেছিলেন চরক সংহিতা। ইনি সুশ্রুত ও জীবকের পরে কিন্তু নাগার্জুনের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারাটি বহুদিন অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন

সময়ে আবির্ভূত কয়েকজন প্রতিভাধর চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ এ বিষয়ে গবেষণাও অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আচার্য বাগভট, মাধবকর ও চক্রপানিদত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রত্যেকেই মৌলিক গবেষণার দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। ভারতবর্ষের সর্বশেষ চিকিৎসা বিজ্ঞানীর নাম পণ্ডিত ভাবমিশ্র। ইনিই শরীরে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার সঠিক তথ্য আহরণ করেছিলেন। বিদেশী বণিকদের আগমনের ফলে এদেশে এক নতুন রোগ দেখা দেয়। ভাবমিশ্র সেই রোগের নাম দিয়েছিলেন ফিরিঙ্গ রোগ (সিফিলিস)। রোগটির সুষ্ঠু চিকিৎসা পদ্ধতিরও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁর মৃত্যুর পর ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্ধকার যুগ নেমে আসে। প্রাচীন কালের সর্বশেষ প্রতিভাধর পণ্ডিত ভাবমিশ্র।

আরবের অভ্যুত্থানের যুগে আরবও চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করেছিল। সম্রাট হারুণ-অল্-রসিদের আমলে কতকগুলি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং গ্রীক ও ভারতীয় চিকিৎসাপুস্তকগুলি আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। সেকালে আরবের কয়েকজন চিকিৎসাবিজ্ঞানীর নামও পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে "ইবন সীনা"র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথম "চিকিৎসাবিদ্যা কোষ" সংকলন করেছিলেন।

গ্রীক বিজ্ঞানের অবনতির পর চিকিৎসা শাস্ত্রটা ইউরোপের ধর্মযাজকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাঁদের চিকিৎসা আদৌ বিজ্ঞানসম্মত ছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অনেক ক্ষেত্রে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে ধর্মযাজকরা চিকিৎসা করতেন না। কখনও বা ওষুধের পরিবর্তে ঈশ্বরের নাম গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হতো। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্ত ধর্মযাজকদের চিকিৎসা বন্ধ করতে নির্দেশ দান করায় চিকিৎসাশাস্ত্র ধর্মযাজকদের কবলমুক্ত হয়।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে প্রথমে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির নাম করতে হয়। চিকিৎসকদের তিনি পরামর্শ দান করেছিলেন যাতে তাঁরা শব-ব্যবচ্ছেদের দ্বারা শারীরসংস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করেন। মনে হয়, ঐ সময় থেকেই ইউরোপে শব-ব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। অবশ্য ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা খ্রীষ্টজন্মের আগে প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপে এই ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আমলে। সে সময় আবার গ্রীক পণ্ডিতদের লেখা পুস্তকগুলি অনুশীলনের কাজ সুরু হলে ইউরোপ ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব

করে এবং গবেষণার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসার ঘটে এবং শিক্ষার্থীদের শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা জ্ঞান লাভে অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় বেলজিয়ামে আবির্ভূত হন বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ এনড্রিয়া ভেসালিয়াস। নরদেহের গঠন সম্বন্ধে বৈপ্লবিক মতবাদ প্রকাশ করেন তাঁর "দে হুমানি কর্পোরিস ফাব্রিকা" নামক গ্রন্থে। ভেসালিয়াস ছিলেন পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক। তাঁরই আগ্রহে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে উন্নতমানের গবেষণা আরম্ভ হয়। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন রিয়ালডাস্ কোলাম্বাস্ এবং হিরোনিমাস্ ফেব্রিকাস। প্রকৃতপক্ষে এঁদেরই গবেষণায় চিকিৎসাবিজ্ঞান নতুন রূপ গ্রহণ করে।

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত শল্যচিকিৎসা কেবলমাত্র নাপিতদের একচেটিয়া ছিল। কিন্তু ঐ শতাব্দীতেই ফরাসী নাপিতরা শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁদের মধ্যে আঁব্রোয়াজ পিয়েরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথম উদ্ভাবন করেন মাতার জননালীতে আবদ্ধ শিশুর প্রসব পদ্ধতি। এই সময় সুইজারল্যাণ্ডে প্যারাসেলসাস নামে এক চিকিৎসকের আবির্ভাব হয়। তিনিই প্রথম ওষুধ হিসাবে প্রয়োগ করেন অ্যান্টিমনিকে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক অতি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন ঘটনা আর ঘটেনি বললেও চলে। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভেসালিয়াস গেলেনের রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কীয় তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করেছিলেন কিন্তু কোন নতুন মতবাদ তিনি রাখেননি। মাইকেল সারভেটাস্ নামে একজন শারীরতত্ত্ববিদ মনুষ্যদেহে রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধে মতবাদ প্রচার করলেন "রক্ত হৃদয়ের ডান প্রকোষ্ঠ থেকে বাম প্রকোষ্ঠে ফুসফুসের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হচ্ছে"। তাঁর এই মতবাদে অসন্তুষ্ট হন ধর্মযাজকরা। বিশেষ করে সারভেটাস যখন বললেন "আত্মা রক্তের মধ্যেই নিহিত থাকে", তখন প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন বলে তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। কথিত আছে, সারভেটাসের লেখা বইটিকেও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

উপরোক্ত হত্যাকাণ্ডের ছ'বছর পরে পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক এবং ভেসালিয়াসের সহযোগী রিয়ালডাস্ কোলাম্বাস রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে পুনরায় তুলে ধরেন সারভেটাসের মতবাদকে। পুনরায় সুরু হয় বিতর্ক। "সিজালপিনো", "গিয়োর্ভানো ব্রুনো" প্রভৃতি শারীরতত্ত্ববিদরাও

সারভেটাসের মতকে প্রাধান্য দান করেন। কিন্তু তাঁদের কেউই উক্ত মতবাদকে সাহস করে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেননি। শেষ পর্যন্ত ইংরাজ শারীরতত্ত্ববিদ স্যার উইলিয়ম হার্ভে রক্ত সঞ্চালনের সঠিক তথ্য আবিষ্কার করে সমস্ত বিবাদ বিসংবাদের অবসান ঘটান। প্রকৃতপক্ষে ঐ দিনই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বারোদ্ঘাটন হয়।

হার্ভের আবিষ্কারের পর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত রক্ত সঞ্চালন সম্বন্ধে গবেষণা বিজ্ঞানীরা অব্যাহত রেখেছিলেন। সেই সব গবেষণা একদিকে যেমন হার্ভের মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল অপরদিকে তেমনই কিছু কিছু নতুন তথ্যও চিকিৎসাবিজ্ঞানে সংযোজিত হয়েছিল। হার্ভের পরীক্ষা করতে গিয়েই রবার্টবয়েল আবিষ্কার করেন ধমনী ও শিরার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সূক্ষ্ম ছিদ্র। লিউয়েনহোয়েক নামক এক চশমা বিক্রেতা অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর ব্যাপারটা আরও সহজ হলো। লিউয়েনহোয়েক নিজেই ব্যাঙকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, ব্যাঙের পায়ে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে। প্রাণীদেহ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ইতালির প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মাল্‌পিগি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করলেন এবং তিনিও ব্যাঙকে নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে ব্যাঙের ফুসফুসের মধ্যেকার সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ আবিষ্কার করলেন। অপরদিকে ঐ সপ্তদশ শতাব্দীতেই ইংরাজ চিকিৎসাবিজ্ঞানী সিডেনহাম এবং ইতালীয় বিজ্ঞানী মোরগাঞ্জি বিজ্ঞানসম্মত রোগ নির্ণয়পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন ও শবব্যবচ্ছেদের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর কতকগুলি আবিষ্কারও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করে। সেই আবিষ্কারগুলির মধ্যে প্রথম নাম করতে হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের। তারপর চিকিৎসাবিদ "লেনেক" আবিষ্কৃত স্টেথোস্কোপ ও শল্যচিকিৎসক চেম্বারলেন আবিষ্কৃত প্রসব সাঁড়াশি চিকিৎসাবিজ্ঞানকে দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিপ্লব সূচিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনারের হাতে। তাঁর বসন্তের টিকা আবিষ্কার একদিকে রোধ করল মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি বসন্তকে। অপরদিকে সেই প্রথম জানা গেল, কোন রোগজীবাণুকে সীমিতভাবে সুস্থদেহে প্রবেশ করালে শরীর রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা লাভ করে। এই প্রথম মানুষ একটি দুরারোগ্য ব্যাধিকে বিতাড়িত করার উপায় উদ্ভাবন করলো। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর জেনারের আবিষ্কারের কোন তুলনা হয় না। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ঐ বসন্তের টিকা।

জেনারের পর উনবিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসাবিজ্ঞান লাভ করে অমিত প্রতিভাধর বিজ্ঞানী এবং বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী লুই পাস্তরকে। অথচ পাস্তর চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন না—ছিলেন রসায়নবিজ্ঞানী। কিন্তু সারাজীবন তিনি অতিবাহিত করেছেন জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণায়। তিনিই পৃথিবী থেকে নিবারণ করেছেন ভয়ঙ্কর জলাতঙ্ক রোগের ভীতি আর আবিষ্কার করেছেন গবাদি পশুর এ্যানথ্রাক্স রোগের টিকা। কলেরা রোগের জীবাণু আবিষ্কারও তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি। পাস্তর তাই দেশকাল-পাত্রের বাহিরে। বিশ্বের সর্বকালের সব মানুষের একান্ত আপনজন।

পাস্তরের গবেষণা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে যেন বিরাট রকমের একটা সাড়া এনে দেয়। পৃথিবীর দুরারোগ্য ব্যাধিগুলিকে বিতাড়িত করার জন্য এবার সচেষ্ট হলেন বিজ্ঞানীরা। তারই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি পাস্তরের সম-সাময়িক জার্মান জীবাণুতত্ত্ববিদ রবার্ট কোখের অ্যানথ্রাক্স ও যক্ষা রোগের জীবাণু আবিষ্কার, ইংরাজ চিকিৎসাবিদ স্যার রোনাল্ড রসের ম্যালেরিয়ার পরজীবী ও তার জীবাণু আবিষ্কার এবং স্কটিশ জীবাণুতত্ত্ববিদ লিশম্যানের কালাজ্বরের পরজীবী আবিষ্কার। এঁদেরই গবেষণাকে কেন্দ্র করে আবিষ্কৃত হল কলেরার টিকা এবং মশক ধ্বংসের দ্বারা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ। কালাজ্বরের প্রতিষেধক ইউরিয়া ষ্টিবামাইন আবিষ্কার করলেন প্রখ্যাত ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

উনবিংশ শতাব্দীতে কেবল দুরারোগ্য ব্যাধিগুলির উচ্ছেদ সাধন হল না, চিকিৎসা-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হল বহু মূল্যবান তথ্যের দ্বারা। জার্মান-বিজ্ঞানী ফিরখভ ভিত্তিস্থাপন করলেন প্যাথলজি বা নিদান তত্ত্বের, চিকিৎসায় রাসায়নিকঘটিত ওষুধ প্রয়োগের সূচনা করলেন আর এক জার্মান চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এহর লিখ, শল্য-চিকিৎসার সময় জীবাণু সংক্রমণ রোধের জন্য রাসায়নিক বীজবারক পদার্থের ব্যবহার আরম্ভ করলেন ইংরাজ শল্য-চিকিৎসক লিস্টার।

শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করেন স্কটিশ স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ সিম্পসন। ক্লোরোফর্মের চেতনানাশক গুণ আবিষ্কার এবং রোগীকে সংজ্ঞাহীন করিয়ে অস্ত্রোপচার করার পদ্ধতি তাঁরই অবদান। সিম্পসনই প্রকৃতপক্ষে দূর করেছেন রোগীর মন থেকে অস্ত্রোপচারের ভয়াবহতা।

বিংশ শতাব্দীতে পেনিসিলিন আবিষ্কার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং এক-ধরণের ছত্রাকের মধ্যে আশ্চর্য রোগ নিরাময় ক্ষমতা লক্ষ্য করেছিলেন।

কিন্তু ওষুধ হিসাবে পেনিসিলিনকে তিনি নিষ্কাশন করতে পারেননি। ওষুধ হিসাবে মানুষ পেনিসিলিনকে লাভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে। তার আগে আর দুটি আবিষ্কারের কথা চিকিৎসা-বিজ্ঞান ভুলবে না। সেদুটি আবিষ্কার হল, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এফ, জি, বান্টিং আবিষ্কৃত মধুমেহের ওষুধ ইনসুলিন এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জি, ডোমাগ কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রন্টোসিল নামক ওষুধ। উক্ত আবিষ্কারের মাধ্যমে ডোমাগই প্রকৃতপক্ষে সালফাবর্গীয় ওষুধের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

ডাঃ ফ্লোরি এবং বিশিষ্ট জার্মান রসায়নবিদ চেইনের প্রচেষ্টায় পেনিসিলিন সুলভ হওয়ার পর চিকিৎসা ক্ষেত্রে নবযুগের সূত্রপাত হয়। পেনিসিলিনের অদ্ভুত রোগ নিরাময় ক্ষমতা মুগ্ধ করে বিশ্ববাসীকে। কিন্তু কিছুদিন পরে পেনিসিলিনের ব্যর্থতাও প্রকাশ পায়। তার ব্যর্থতা ঢাকতে পুনরায় সুরু হয় গবেষণা। এই পর্যায়ে আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ ইয়েল্লোপ্রাভদা সুব্বারাও-এর অবদান চিরকাল বিশ্ববাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। অরিও মাইসিন, সুবা-মাইসিন প্রভৃতি বহু অ্যান্টিবায়োটিকের তিনি আবিষ্কারক। তাছাড়াও তিনি স্প্রু এবং পেলেগ্রা নামক দুটি গ্রীষ্ম প্রধান দেশের দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন।

নানাবিধ যন্ত্রপাতি এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নতুন রূপ গ্রহণ করে। একদিকে যেমন চিকিৎসা ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার সুরু হয় অপরদিকে তেমনই নানাবিধ যন্ত্রপাতি শল্যচিকিৎসাও দুরারোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করে। ডাঃ ওয়াক্সম্যানের যক্ষা রোগের প্রতিষেধক এবং জোনাস সালক এর পোলিওর টিকা আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের দুটি বড় অবদান।

বিভিন্ন বিজ্ঞানীর আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সেই শাখাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১। অঙ্গাদির গঠন, বিন্যাস ও সংস্থান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান অ্যানাটমি বা শারীর সংস্থান

২। অঙ্গাদির স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ফিজিওলজি বা শারীরবিদ্যা

৩। ওষুধের শ্রেণীবিভাগ ও ক্রিয়া সম্বন্ধীয় শাস্ত্র ফার্মোকোলজি বা ভেষজবিদ্যা

৪। অঙ্গাদির রোগজনিত বিদ্যা প্যাথলজি বা নিদানতত্ত্ব

৫। রোগ জীবাণু ও তাদের ক্রিয়া সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান জীবাণুবিজ্ঞান বা ব্যাকটিরিওলজি

৬। অস্ত্রোপচার এবং অঙ্গাদি অধিরোপন সম্বন্ধীয় শাস্ত্র শল্যশাস্ত্র বা সার্জারি

৭। দেহের রাসায়নিক উপাদান ও তাদের বিপাক সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান প্রাণ রসায়ন বা বায়োকেমিস্ট্রি

৮। বিভিন্ন রোগে প্রযোজ্য ওষুধ সম্বন্ধীয় শাস্ত্র মেডিসিন বা চিকিৎসা-শাস্ত্র

৯। স্ত্রীজননতন্ত্রের রোগ ও সন্তান জন্ম-বিষয়ক বিদ্যা গাইনেকোলজি অ্যাণ্ড অব্‌স্টেট্রিকস বা স্ত্রীরোগ বিদ্যা

এবং ১০। মহামারী প্রতিরোধ, পৌরশাস্ত্র সম্বন্ধীয় শাস্ত্র হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেল্‌থ বা জনস্বাস্থ্য।

নিম্নে কয়েকটি শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা গেল।

শারীর বিদ্যা ও শারীর সংস্থান—

জীবিত প্রাণীর অঙ্গ, দেহকলা বা টিস্যু, কোষ, কঙ্কাল, শরীরের নানাবিধ যন্ত্রপাতি, রক্ত সঞ্চালনক্রিয়া, শিরা, ধমনী প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা এই দুই শাখার মুখ্য বিষয়। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র চরক সংহিতায় এই দুই শাখার বেশ কিছু কিছু আলোচনা আছে। তাই মনে হয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক এই শাখাগুলির উৎপত্তি এককালে ভারতবর্ষেই হয়েছিল। শব-ব্যবচ্ছেদের দ্বারা ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাই উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন বহু প্রয়োজনীয় তথ্য। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রথম খণ্ডে মনুষ্যদেহের হাড়, মাংস-পেশী, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মস্তিষ্ক প্রভৃতির পরিচয়, গঠন-প্রণালী ও কার্যপ্রণালীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আজকের দৃষ্টিতে যা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। তাছাড়া রক্ত সংবহন তন্ত্র, পরিপাকক্রিয়া, মল-মূত্রাদির বিবরণ, গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শ প্রভৃতি মস্তিষ্কে কেমন অনুভূতি জাগায় সেই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। অথচ আজকের উন্নত শারীর বিদ্যা ও শারীর সংস্থানের মধ্যে এগুলি অন্তর্ভুক্ত।

ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দিলে গ্রীসের কথা এসে পড়ে। গ্রীসের এই দুই শাখা সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন হিপ্পোক্রাতেশ, অ্যারিস্তোতল ও গেলেন। মধ্যযুগে ইউরোপের রেনাসাঁসের আমলে এই শাখাগুলিকে সুদৃঢ় করেন উইলিয়ম হার্ভে। বর্তমানে উন্নত যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হওয়ায় মনুষ্যদেহের বিভিন্ন অংশ ও তাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে সঠিকভাবে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে, পরিপাক তন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, সংবহনতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, পেশীতন্ত্র কঙ্কালতন্ত্র, প্রজননতন্ত্র প্রভৃতি নানাতন্ত্রের সুসংহত ক্রিয়ার দ্বারাই প্রাণিদেহের

স্বাভাবিক কাজ সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। ২০৬ খানি হাড় দিয়ে গঠিত অস্থির কাঠামো, উর্ধ্বাঙ্গের ও নিম্নাঙ্গের হাড় ও পেশীগুলোর সাহায্যেই সম্ভব হয় চলাফেরা, ওঠা-বসা, কাজ-কর্ম সবকিছু। এইগুলির পরিপূর্ণ বিবরণই শারীর বিদ্যা ও শারীর সংস্থানের আলোচ্য বিষয়।

জীবাণু বিদ্যা—বিজ্ঞানের এই শাখাটির জন্ম প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী জীবাণুতত্ত্ববিদ লুই পাস্তুরের হাতে। তবে প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে, রোগের মূলে আছে এক প্রকার অদৃশ্য জীবের ক্রিয়া। মনে হয় অদৃশ্য জীব বলতে তাঁরা জীবাণুদের কথাই বলেছেন। পৃথিবীর প্রাচীন অন্য কোন চিকিৎসাগ্রন্থে জীবাণুর উল্লেখ নেই। বর্তমানের উন্নত বিজ্ঞান বুঝতে পেরেছে ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে জীবদেহে নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হয়।

আধুনিক কালের উন্নতমানের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, জীবজন্তুর নানা ব্যাধির সঙ্গে ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়ায় আছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ভাইরাসরা ক্ষুদ্রাতিতম ক্ষুদ্রজীব। ওদের খালি চোখে তো দূরের কথা, সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা যায় না। বর্তমানে অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের দ্বারা ভাইরাসের চিত্রগ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে, ওরা জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ এমনকি জীবাণুর দেহেও আশ্রয় গ্রহণ করে। জীবাণুর দেহে যে সব ভাইরাস বাসা বাঁধে তাদের বলা হয় ব্যাকটিরিওফাজ। হাম, বসন্ত, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, জলাতঙ্ক, পোলিও, মস্তিষ্কের এবং যকৃতের প্রদাহজনিত নানাপ্রকার রোগের পশ্চাতে আছে ভাইরাসের আক্রমণ।

ব্যাকটিরিয়ারা ভাইরাসের মত এত ক্ষুদ্র নয়। এর মধ্যে অতি নিম্নস্তরের উদ্ভিদের লক্ষণই প্রকট। নানাপ্রকার জৈব পদার্থে, খাদ্য বস্তুতে, মৃত অথবা জীবিত প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ দেহে পরজীবীরূপে বাস করে এবং যেখানে বাস করে সেইখান থেকেই খাদ্য আহরণ করে।

ব্যাকটিরিয়ারা নানা জাতের। কোন কোন জাতের ব্যাকটিরিয়া জীব-দেহে নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি করে আবার এমন কিছু কিছু ব্যাকটিরিয়া আছে—যারা উপকারও করে। উদ্ভিদ ভোজী প্রাণীর পৌষ্টিকনালীতে এক জাতীয় ব্যাকটিরিয়া বসবাস করে। ওরা খাদ্যের দুষ্পাচ্য সেলুলোজকে পরিপাক করতে যথেষ্ট সাহায্য করে বলে প্রাণীদের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। রোমন্থক প্রাণীর পাকস্থলীতে যে জাতীয় ব্যাকটিরিয়ারা বাস করে তারা ইউরিয়া ও অন্যান্য নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ থেকে প্রোটিনের সংশ্লেষণ ঘটায়। আরও কয়েক ধরণের ব্যাকটিরিয়া নানাদিক থেকে জীবের উপকার সাধন

করে। তবে ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যাও কিছু কম নেই।

ব্যাকটিরিয়ারা ক্ষুদ্র হলেও অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে। ওরা উদ্ভিদজগতের অন্তর্ভুক্ত এককোষী অথবা বহুকোষী জীব। ওদের আকৃতি মোটামুটি তিন প্রকারের—গোলাকৃতি, দণ্ডাকৃতি ও কুণ্ডলাকৃতি। গোলাকৃতিগুলিকে বলা হয় কক্কাস, দণ্ডাকৃতিদের বলা হয় ব্যাসিলাস এবং কুণ্ডলাকৃতিদের বলা হয় স্পাইর‍্যাল।

কক্কাস আবার নানা প্রকারের। তাদের মধ্যে স্টেপটো কক্কাসরা কণ্ঠের প্রদাহজনিত ব্যাধি এবং নিউমোনিয়ার সৃষ্টি করে। স্ট্যাফাইলো কক্কাসরা বিশেষ ক্ষতিকারক নয়। নাইসেরিয়া জাতীয় কক্কাস থেকে মস্তিষ্কে ঝিল্লীর প্রদাহজনিত রোগ ও গনোরিয়া রোগ হয়।

যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ডিফ্থেরিয়া, ধনুষ্টংকার, টাইফয়েড, রক্ত আমাশায় প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিরা দণ্ডাকৃতি বা ব্যাসিলাস জাতীয় কক্কাসের সংক্রমণে হয়ে থাকে। কলেরার জীবাণু দেখতে "কমার" মত ঈষৎ বক্র। ঐ জীবাণুকে "কমা ব্যাসিলাস" বলা হলেও ওরা কুণ্ডলাকৃতি বা স্পাইর‍্যাল ব্যাকটিরিয়ার পর্যায়ে পড়ে। সিফিলিস রোগের কারণ "ত্রেপোনেমা পাল্লিদা" নামক ব্যাকটিরিয়ারাই যথার্থ স্পাইর‍্যাল ব্যাকটিরিয়া।

যে-সব বিজ্ঞানীর অক্লান্ত সাধনার ফলে জীবাণুবিদ্যা সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ফ্রাকাসতোরোর নাম করতে হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন, রোগের মূলে আছে অদৃশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা। কিন্তু ঐ "কণা"গুলির প্রকৃত পরিচয় তিনি প্রদান করতে পারেননি। ডাচ চশমা বিক্রেতা অর্বোন্নাদ লিউয়েন হোয়েক অণুবীক্ষণ যন্ত্র স্বহস্তে নির্মাণ করে প্রথমে জীবাণুদের দেখতে পান। পচা জলকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখলেন, অজস্র অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু সেই জলের মধ্যে কিলবিল করছে। তিনি এই দৃশ্য নিজে দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেননি বহু জনকে দেখিয়েছিলেন। সেইদিনই মানুষ বিশ্বাস করেছিল, আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে বহু জীব বাস করে। লিউয়েন হোয়েক সারা-জীবন ধরে কেবল জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা করে গেছেন। তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন মানুষের দাঁতের গোড়ায়, পাকস্থলীতে নানাজাতীয় জীবাণু বাস করে। তাই বৃদ্ধ বয়সে মাঝে মাঝে খুব গরম কফি মুখে ঢেলে দিয়ে অদৃশ্য জীবাণুদের মেরে ফেলতে চেষ্টা করতেন। তাতে ফল হতো এই যে, মুখটা পুড়ে যাওয়ার জন্য কয়েকদিন খেতে পারতেন না। ব্যাকটিরিয়ার আকৃতিগত বর্ণনা প্রথম লিউয়েন হোয়েকই প্রদান করেন।

লিউয়েন হোয়েকের পরে ল্যাজারো স্পালানজেনির নাম করতে হয়। স্পালানজেনিও একরকম সারাজীবন ধরে জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে জীবাণুবিদ্যার ভিত্তিস্থাপন করে গেছেন ঐ স্পালানজেনিই। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জীবাণুদের কৃত্রিমভাবে বংশবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হন। তার পরই আসে জেনারের কাল। বসন্তরোগকে পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করার জন্য তিনি যে কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন তার তুলনা বিরল। অবশেষে তিনি গোবসন্তের বীজকে টিকা হিসাবে ব্যবহার করে জীবাণুবিদ্যার ইতিহাস এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন।

জেনারের পর আবির্ভূত হন লুই পাস্তুর। বিজ্ঞানভিত্তিক জীবাণুবিদ্যার চর্চা তাঁরই হাতে সুরু হয়। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন, মদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পেছনে, দুধকে দইতে পরিণত করায়, গুটিপোকার মড়কের ক্ষেত্রে, অ্যানথ্রাক্স ও জলাতঙ্ক রোগের মূলে, সর্বত্রই সেই অদৃশ্য জীবাণুর হাত। লুই পাস্তুরের জীবাণুবিদ্যার এমন অবদান আছে যে, তাঁকে "জীবাণুবিদ্যার জনক"—এই আখ্যা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন রোগে টিকার ব্যবহারও তাঁরই আবিষ্কার।

পাস্তুর ব্যতীত আর যারা জীবাণুবিদ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, তাঁরা হলেন রবার্ট কোখ, ক্লেবস, লোফলার, বেহরিং কিটাসাটো ইয়েরসিন ও ফেবার।

শল্য চিকিৎসা—শল্যচিকিৎসার প্রথম উদ্ভব হয় ভারতবর্ষে। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সুশ্রুত সংহিতা মূলতঃ শল্যচিকিৎসার পুস্তক। কথিত আছে, প্রাচীনকালে যোদ্ধাদের দেহ থেকে শল্য বা তার উৎপাটনের প্রক্রিয়াকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শল্যতন্ত্র নামে পরিচিত ছিল। শল্যতন্ত্র থেকেই "শল্যচিকিৎসা" কথাটির উদ্ভব হয়েছে।

সুশ্রুত শল্যতন্ত্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। সেই বিভাগগুলির মধ্যে প্রধান হল ছেদন, ভেদন, লেখন, এষ্যন, আহরণ, বিস্রবণ ও সীবন প্রধান। তাছাড়া পুনর্গাঠনিক শল্যচিকিৎসা বা প্লাষ্টিক সার্জারীর কথাও সুশ্রুত সংহিতায় উল্লেখ আছে। সুশ্রুতের আমলেও মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হতো এবং শরীরের কোন স্থান থেকে চামড়াকে স্থানান্তর অথবা একস্থানের চামড়াকে অন্যস্থানে সংযোজিত করা হতো। বর্তমানে এই প্রণালীকে পুনর্গাঠনিক শল্যচিকিৎসা বলা হয়।

পণ্ডিতদের মতে ভারতের উন্নত শল্যচিকিৎসা প্রণালীকে প্রাচীনকালে রুমের ব্যাবিলন, মিশর এবং আরবরা সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং ওদের মাধ্যমে এই বিদ্যা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তাই কর্তিত নাসার পুনর্গঠন পদ্ধতিকে

আজও পাশ্চাত্যে বলা হয় "ইণ্ডিয়ান রাইনো প্লাসটি"। এমনও শোনা যায়, ভারতে বৃটিশ অধিকার স্থাপনের সময় পর্যন্ত ভারতের কোন কোন চিকিৎসক নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতিকে পুনর্গঠিত করতে পারতেন। প্রাচীন ভারতে চক্ষু অধিরোপন পদ্ধতিও জানা ছিল।

মধ্যযুগ থেকে ভারতে শল্যচিকিৎসার অবনতি ঘটে। অপরাপর দেশও যারা এই পদ্ধতিকে আয়ত্ত করেছিল তারাও এর প্রতি আর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তাই শল্যচিকিৎসাটা প্রত্যেক দেশে নাপিতদের এক-চেটিয়া হয়ে উঠে। ফলে "ক্ষৌরকার শল্যচিকিৎসক" বা "বারবার সার্জন" শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তাদের যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল ক্ষুর এবং নরুন। এক-রকম অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত শল্যচিকিৎসাটা ক্ষৌরকারদের বিদ্যা-রূপে পরিচিত ছিল।

আধুনিক শল্যচিকিৎসার গোড়াপত্তন হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন হাণ্টার ও উইলিয়ম হাণ্টার নামে দুই ইংরাজ চিকিৎসকের হাতে। এরা ছিলেন দু'ভাই। অস্ত্রোপচারের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার জন্য তাঁরা সারাজীবন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে গেছেন। সে সময় জীবাণুরোধক কোন ওষুধ আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাঁরা তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। পরে লিউয়েন হোয়েক, স্প্যালানজেনি এবং লুই পাস্তরের গবেষণা থেকে মানুষ জীবাণুর প্রকৃত পরিচয় লাভ করলো। সেই সঙ্গে উদ্ভূত হল কিছু কিছু বীজবারক ওষুধ। তারপর সিম্পসনের চেতনা নাশক দ্রব্যের ব্যবহার শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্তও শল্যচিকিৎসা তেমন অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। তার একমাত্র কারণ, জীবাণু নিধনের কোন উপায় শল্য-চিকিৎসকদের জানা ছিল না। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান-বিজ্ঞানী ডোমাগ "প্রনটোসিল" আবিষ্কার করার পর কিছুটা উন্নত হয়েছিল। অবশেষে সালফা-বর্গীয় ওষুধ ও পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর শল্যচিকিৎসার উন্নতি দ্রুততর হয়ে ওঠে।

বর্তমানে শল্যচিকিৎসা উন্নতির চরমশীর্ষে আরোহণ করেছে। চিকিৎসকগণ এখন অবলীলাক্রমে চক্ষু, হৃৎপিণ্ড, কিডনি প্রভৃতিকে অধিরোপন করতে পারছেন, পুনর্গঠন করছেন শরীরের যে-কোন অঙ্গকে। অধুনা শল্যচিকিৎসা আবার কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত। বিভাগগুলির মধ্যে প্রধান হল সাধারণ শল্যচিকিৎসা বা জেনারেল সার্জারি, হৃৎপিণ্ড ও শিরাধমনীর শল্যচিকিৎসা বা কার্ডিও ভ্যাসকিউলার সার্জারি, পুনর্গাঠনিক শল্যচিকিৎসা বা প্ল্যাষ্টিক

সার্জারি, স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের শল্যচিকিৎসা বা গাইনিকলজিক্যাল সার্জারি, চক্ষু শল্যচিকিৎসা বা অফথ্যালমোলজিক্যাল সার্জারি, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের শল্য-চিকিৎসা বা নিউরো সার্জারি প্রধান।

ভেষজ বিদ্যা—"ফার্মাকোলজি" শব্দটির বাংলা রূপান্তর ভেষজবিদ্যা। ফার্মাকোলজি আবার একটি শব্দ নয়। Pharmakon এবং logos নামক দুটি গ্রীক শব্দের সমষ্টি। Pharmakon শব্দের অর্থ ড্রাগ বা ওষুধ এবং logos শব্দের অর্থ কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান। অপরদিকে "ড্রাগ" শব্দটি এসেছে ফরাসী Drouge শব্দ থেকে এবং যার অর্থ হচ্ছে লতাপাতা। তাই ফার্মা-কোলজি কথাটির মধ্যেই "বনৌষধি" কথাটি নিহিত আছে। অতএব ফার্মাকোলজিকে আমরা ভেষজবিদ্যা নামে অভিহিত করতে পারি।

ভেষজবিদ্যাও ভারতের প্রাচীন বিদ্যা। অথর্ববেদে এই বিদ্যাকে প্রধান বিদ্যারূপে গণ্য করা হয়েছে। তবে এই বিদ্যা পূর্ণাঙ্গরূপ প্রাপ্ত হয় চরক সংহিতা রচনার সময়ে। উক্ত গ্রন্থটিতে কয়েকশ' উদ্ভিদের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে চক্রপাণি দত্ত ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যত উদ্ভিজ্জ ওষুধ প্রচলিত ছিল সবগুলিকে সংগ্রহ করে "মেটেরিয়া মেডিকা" জাতীয় একটি মহাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি এ বিষয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করে-ছিলেন। ভেষজ সম্বন্ধে এত উচ্চাঙ্গের গবেষণা তাঁর পূর্বে পৃথিবীর কোন দেশে হয়নি।

ভারত ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশেও ভেষজ বিজ্ঞানের চর্চা হতো। চর্চা না করে উপায়ও ছিল না। জন্ম থেকেই মানুষকে ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। যেদিন মানুষ রোগব্যাধির কারণ সমূহ আদৌ অবগত হয়নি সেদিনও ব্যাধির কবল থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাদের নানা উপায় চিন্তা করতে হয়েছিল। তখন তারা ছিল উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাই বোধ হয় অসুখের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্যও শরণাপন্ন হয়েছিল উদ্ভিদের। বনে বাদাড়ে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতো, লতাগুল্মের ফল-পাতা চিবিয়ে খেতো, শেকড়-বাকড়ও পরীক্ষা করে দেখতো। দস্তুর মত সে ছিল গবেষণা। হয়ত বিষাক্ত ফল খেয়ে কত মানুষকে প্রাণ হারাতেও হয়েছিল।

এই সভ্যতা বিকাশের পূর্বে গাছগাছড়াকে নিয়ে পরীক্ষা করেছিল মানুষ। হাজার হাজার বছরের প্রচেষ্টায় আয়ত্ত করেছিল কতকগুলি উদ্ভিদের গুণ। পরবর্তীকালে সুস্থ ও সুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পৃথিবীর সব দেশেই রীতি হয়েছিল ধর্মশাস্ত্র। সেই সমস্ত ধর্মশাস্ত্রে যেমন নীতিজ্ঞানের কথা আছে তেমনই রোগব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ জীবনযাপনের জন্য ভেষজের

গুণাগুণও বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতের অথর্ববেদে, মিশরের প্যাপিরাসে, আসিরীয়দের লেখমালায়, চীনাদের ঐতিহাসিক গ্রন্থে, খ্রীষ্টানদের বাইবেলে, সর্বত্রই উল্লেখ আছে ভেষজের কথা। এমনকি প্রাচীন আমেরিকার অধিবাসীরা সভ্যজগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি উদ্ভিদের ভেষজগুণ সম্বন্ধে অবহিত ছিল—এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বর্তমানকালে চিকিৎসাশাস্ত্রের যে শাখাটি ভেষজবিদ্যা নামে পরিচিত, সেটি ইউরোপেরই অবদান। অবশ্য মাত্র একশ বছর আগে ভেষজবিদ্যা নামে কোন শাখার উদ্ভব হয়নি। এটি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ইউরোপের রেনাসাঁসের যুগে প্যারাসেল্‌সাস আগ্রহী হয়ে ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় একদল গবেষকের উদ্ভব হয়। আবিষ্কৃতও হয়েছিল বহু তথ্য। অবশেষে প্যারাসেলসাসেরই প্রচেষ্টায় রাসায়ণবিদরাও এ-বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেন। দেখতে দেখতে চিকিৎসাবিজ্ঞান লাভ করে প্রচুর ওষুধ। তাই আধুনিক ভেষজবিদ্যার ভিত্তিস্থাপন করেছেন প্যারাসেলসাসই।

প্যারাসেলসাসের পরেও ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণা অব্যাহত থাকে। শত শত বছরের ব্যবধানে হাজার হাজার ওষুধ আবিষ্কৃত হয়। সমূহ ওষুধের খবর সমস্ত চিকিৎসকের পক্ষে রাখা সম্ভব ছিল না এবং প্রত্যেকটি ওষুধের গুণাগুণ তারা আয়ত্ত করতে পারতেন না। অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ প্রস্তুতকারক ওষুধ তৈরি করতেন আর অন্ধের মত ব্যবহার করতেন চিকিৎসকরা। অসুবিধা দূর করার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে ফার্মাকোলজি নামক শাস্ত্রটির উদ্ভব।

ওষুধের সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য, তার দোষগুণ, প্রস্তুতির উপায়, শরীরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, শরীরে প্রবেশ করার পর কোথায় কোথায় এবং কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে, ভবিষ্যতে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া শরীরে দেখা দেয় কিনা, কি মাত্রায় ওষুধ গ্রহণ করলে ফলপ্রসূ হয় ইত্যাদি সর্ববিধ বিষয়ই এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থে দ্রব্যগুণ, ভেষজপ্রস্তুতকরণ বিধি, ওষুধ পরিচিতি, বিষপ্রকরণ, মাত্রা বিজ্ঞান, ওষুধ প্রয়োগবিধি এবং রসায়ন চিকিৎসা উক্ত শাস্ত্রটির আলোচ্য বিষয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার

সাল	আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ
খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী	ইউনানি চিকিৎসা	পিথা গোরাস	গ্রীস
খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী	বিজ্ঞানসম্মতভাবে রোগ বিশ্লেষণ	হিপ্পোক্রাতেশ	গ্রীস
খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী	কম্পারেটিভ অ্যানাটমি	অ্যারিস্তোতল	গ্রীস
খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দী	শারীর সংস্থান	গেলেন	গ্রীস
১৫শ শতাব্দী	শারীর সংস্থান বিষয়ে জ্ঞানের প্রসার	লিওনার্দো দা ভিঞ্চি	ইতালি
ষোড়শ শতাব্দী	নরদেহের গঠন	ভেসালিয়াস	বেলজিয়াম
ষোড়শ শতাব্দী	ভেষজবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা	প্যারাসেলসাস	সুইজারল্যাণ্ড
১৭শ শতাব্দী	রক্ত সঞ্চালন তথ্য	হার্ভে	ইংলণ্ড
১৭শ শতাব্দী	বিজ্ঞানসম্মতভাবে রোগ নির্ণয় পদ্ধতি	সিডেনহাম	ইংলণ্ড
১৮শ শতাব্দী	শরীরে রোগকেন্দ্র নির্ণয়	মোরগাগ্নি	ইতালি
১৭৯৬	বসন্তের টিকা	এডওয়ার্ড জেনার	ইংলণ্ড
১৮১৯	স্টেথোস্কোপ	লেনেক	ফ্রান্স
ঊনবিংশ শতাব্দী	প্রসব সাঁড়াশি	চেম্বারলেন	ইংলণ্ড
ঊনবিংশ শতাব্দী	কোষভিত্তিক নিদানতত্ত্ব	ফিরখভ	জার্মানী
ঊনবিংশ শতাব্দী	জীবাণু সংক্রমণ রোধের উপায়	লিস্টার	ইংলণ্ড
ঊনবিংশ শতাব্দী	চেতনা নাশক দ্রব্যের ব্যবহার	সিম্পসন	স্কটল্যাণ্ড
১৮৭৭	ফাইলেরিয়া রোগ সংক্রমণের কারণ	প্যাট্রিক ম্যানসন	ইংলণ্ড
১৮৮১	মানবরক্তে ম্যালেরিয়া জীবাণু	চার্লস লাভেরণ	ফ্রান্স

সাল	আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ
১৮৮১	অ্যানথ্রাক্স রোগ প্রতিষেধক	পাস্তুর	ফ্রান্স
—	জলাতঙ্ক রোগ প্রতিষেধক	পাস্তুর	ফ্রান্স
১৮৮২	যক্ষ্মা রোগের জীবাণু	রবার্টকোথ	জার্মানী
১৮৮৩	কলেরা রোগের জীবাণু	রবার্ট কোথ	জার্মানী
১৮৮৪	ডিপথেরিয়ার জীবাণু ক্লেবস	লোফলার	—
১৮৮৮	প্লেগের জীবাণু	বেহরিং কিটসাটো	—
		ইয়েরসিন	—
১৮৮৯	ধনুস্টঙ্কারের জীবাণু	বেহরিং কিটাসাটো	—
১৮৯৪	ম্যালেরিয়া সংক্রমণের কারণ	ম্যানসন প্যাট্রিক	ইংলণ্ড
১৮৯৮	এ্যানোফেলিস মশা ম্যালেরিয়ার বাহক	রোনাল্ড রস	ইংলণ্ড
১৯০৭	রাসায়নিক ওষুধের ব্যবহার	এহরলিচ	জার্মানী
১৯২৩	কালাজ্বরের ওষুধ	উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী	ভারত
১৯২৩	মধুমেহের ওষুধ	বান্টিং	কানাডা
১৯২৮	পেনিসিলিন	আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং	ইংলণ্ড
১৯৩২	প্রন্টোসিল	ডোমাগ	জার্মানী
১৯৪২	ওষুধরূপে পেনিসিলিন	হাওয়ার্ড ফ্লোরি	ইংলণ্ড
		আর্নেস্ট বোরিস চেইন	জার্মানী
—	স্প্রু রোগের ওষুধ	সুব্বারাও	আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয়
—	অরিও মাইসিন	সুব্বারাও	”
১৯৫২	যক্ষ্মার প্রতিষেধক	ওয়াক্সম্যান	আমেরিকা
—	পোলিওর টিকা	জোনাস সাল্ক	রাশিয়া

জ্যোতির্বিজ্ঞান

ক্রমবিকাশ ঃ—সভ্যতার প্রারম্ভে মাথার উপর অনন্ত আকাশটা মানুষের কাছে অত্যন্ত কৌতুহলের বিষয় ছিল। দিনের বেলায় আকাশে থাকে সূর্য আর রাত্রিতে উদিত হয় চাঁদ এবং অসংখ্য নক্ষত্র। কতকাল যে মানুষ আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছিল তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। অবশেষে তারা একদিন আবিষ্কার করেছিল সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রের গতিবিধি। সেই থেকেই সুরু হয় দিন, মাস ও বছর গণনা। পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই উদ্ভব হয় বর্ষপঞ্জীর।

আদিতে মানুষ অনেকগুলি গ্রহকে আবিষ্কার করেছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের আকর্ষণ পৃথিবীর উপর যেমন পড়ছে তেমনই পড়ছে মানুষের উপর। তারা সে সময় আকাশের রাশিচক্র ও সাতাশটি নক্ষত্রের গতিবিধি আবিষ্কার করেছিল। এই সবগুলির সঙ্গে ব্যক্তিগত ও দেশগত ভাগ্যের সম্বন্ধ আছে—এমন ধারণাও গড়ে উঠেছিল। তাই উদ্ভব হয়েছিল ফলিত জ্যোতিষের। তবে গণিত জ্যোতিষ এবং ফলিত জ্যোতিষ—উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না সেদিন। অন্য পক্ষে ভাগ্যলিপি গণনার জন্যই সেদিন জ্যোতিষটা আলোচনা করা হতো। পরে গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনাগুলি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং গণনায় প্রবৃত্ত হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মিশর, সুমের, ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত সভ্যদেশগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করতো। এই বিদ্যায় ভারত ছিল সমৃদ্ধ। তবে মৌলিক আবিষ্কারগুলিকে ভারতীয় অবদান বলে স্বীকার করতে অনেকে রাজি নন। তাঁরা মনে করেন, ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাটা অপরের কাছে ধার করা।

আর্যরা অবশ্য সঙ্গে করে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে নিয়ে এসেছিলেন। ওঁরা নির্দিষ্ট ঋতুতে যাগযজ্ঞ সম্পন্ন করতেন বলে সৌরবছর ও চান্দ্রবছরের হিসাবটা সঠিকভাবে জেনেছিলেন। হয়ত এগুলি তাঁদের মাতৃভূমির আবিষ্কার। পরবর্তীকালে গ্রহণ গণনাও হয়ত ভারত লাভ করেছিল বিদেশের কাছ থেকে। কিন্তু নক্ষত্র গণনা এবং রাশিচক্র গণনা ভারতের নিজস্ব বলেই মনে হয়।

মূল উপাদান ভারত যেখান থেকে লাভ করুক না কেন মধ্যযুগে গাণিতিক

জ্যোতিষে ভারতবর্ষের জুড়ি কেউ ছিল না। এই শাখায় ভারতে কয়েকজন অসামান্য প্রতিভাধরের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ভাস্করাচার্যের প্রতিভার মত প্রতিভা মধ্যযুগে পৃথিবীর কোন দেশেই আবির্ভূত হয়নি। আর্যভট্ট পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভাস্করাচার্য আবিষ্কার করেছিলেন পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি। কলনবিদ্যার প্রয়োগ করে ভাস্করাচার্য চন্দ্রের গ্রাবিমাও নির্ণয় করেছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে নিকোলাস কোপার নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ থেকেই নব্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের যুগ আরম্ভ হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের এই শাখার ভিত্তি স্থাপিত করেন কেপলার। তিনিই প্রথম গ্রহদের কক্ষপথ সম্বন্ধে আভাস প্রদান করেন।

দূরবীন আবিষ্কার এই শাখার উন্নতির মূলে দ্বিতীয় পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। মহামতি গ্যালিলিও স্বহস্তে উচ্চশক্তি সম্পন্ন দূরবীন প্রস্তুত করে চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শনি সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। বৃহস্পতি ও শনির কয়েকটি উপগ্রহকেও পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করেছিলেন।

গ্যালিলিওর পর নিউটন জ্যোতির্বিজ্ঞানকে স্থাপন করেন দৃঢ়ভিত্তির উপর। তাঁর অভিকর্ষ আবিষ্কার এবং কলমবিদ্যার সাহায্যে গণনা জ্যোতির্বিজ্ঞানকে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাঁরই সময় আবিভূর্ত এডমণ্ড হ্যালি ধূমকেতু সমন্ধে সঠিক তথ্য প্রদান করে আকাশের অন্যান্য জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে গবেষণার পথও উন্মুক্ত করেন।

বর্তমান শতাব্দীতে বর্ণালী বিশ্লেষণ পদ্ধতি উন্নত হওয়ায় বিজ্ঞানীরা আকাশের বহু রহস্য ভেদ করতে পেরেছেন। তাঁরা অনুমান করেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এবং নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহের সৃষ্টি রহস্য। জ্যোতিষ্কগণের উপাদান, তাপমাত্রা, বয়স, গতিপথ, পৃথিবী এবং সূর্য থেকে দূরত্ব প্রভৃতি অনেক কিছু। আবিষ্কার করেছেন, কয়েকটি নক্ষত্রজগৎ, কোয়াসার, পলসার। ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপও উদ্‌ঘাটিত করেছেন বিজ্ঞানীরা।

পূর্বের মত জ্যোতির্বিজ্ঞান এখন আর স্বনির্ভর নয়। অঙ্ক ও পদার্থবিজ্ঞান তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে। একটির অনুপস্থিতি অপরটির কাছে সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন। তদুপরি রসায়ন বিজ্ঞানকেও জ্যোতির্বিজ্ঞান দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। গ্রহ-নক্ষত্রের উপাদান, নক্ষত্রপৃষ্ঠে তাপের উৎস, এমনকি বয়স গণনার ক্ষেত্রেও রসায়নবিজ্ঞান অপরিহার্য।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার পৃথিবীর আহ্নিকগতি—খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ভারতীয় গণিতজ্ঞ আর্যভট্ট (১ম)

পৃথিবীর আহ্নিকগতির কথা প্রথমে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু সে আমলে তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করেননি। আর্যভট্টের প্রায় হাজার বছর পরে কোপার্নিকাস যখন মৃত্যু শয্যায় তখন তার লেখা বইতে উক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। ফলে একটা বিরাট রকমের সাড়া পড়ে যায় এবং কোপার্নিকাসের তথ্যকে অবহেলা করা হয়। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী-গ্যালিলিও পুনরায় ঐ একই তথ্যকে প্রকাশ করেন। তবু সেদিনও উক্ত তথ্যস্বীকৃত হয়নি। পরিশেষে সমূহ বিরোধের মীমাংসা করেন বিজ্ঞানী নিউটন।

চন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য—চন্দ্র সম্বন্ধে সঠিক তথ্য প্রথম প্রকাশ করেন বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। চন্দ্রের ব্যাস, তার উপাদান, চন্দ্রের কলঙ্ক প্রভৃতি প্রায় সবই গ্যালিলিওর আবিষ্কার। তিনি ভেবেছিলেন, চন্দ্রে পাহাড় পর্বত, আগ্নেয়গিরি, এমনকি সমূদ্রও আছে। গ্যালিলিও আরও মনে করেছিলেন, চাঁদে জীব আছে।

বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে, চাঁদে আবহমণ্ডল নেই, জল নেই এবং জীবও নেই। পাহাড়-পর্বত, মৃত আগ্নেয়গিরি এবং গহ্বরে পরিপূর্ণ।

অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ—আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী নিউটন। অবশ্য অভিকর্ষের কথা প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্য ঘোষণা করেছিলেন। নিউটনই প্রথম ব্যাখ্যা করেন, পৃথিবী তার উপরের প্রতিটি বস্তু কণাকে নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে। ঐ কারণে কোন বস্তু পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারছে না।

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটি হল, বিশ্বের প্রতিটি পদার্থকণা অপর কোন কণাকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণবল কণাদুটোর ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের সমানুপাতিক। এই মহাকর্ষ নিয়ম অনুযায়ী সূর্যের চারদিকে গ্রহরা এবং গ্রহের চারদিকে উপগ্রহরা পরিক্রমা করছে। দূরত্ব বেশি হওয়ার জন্য একে অপরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে না। কেবল তাই নয়, সূর্যকেও এই নিয়মে পরিভ্রমণ করতে হচ্ছে বিশাল নক্ষত্র জগতের চারদিকে এবং নক্ষত্রজগৎও স্থির নয়।

নবতারা—১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে ডেনিশ গণিতজ্ঞ টাইকোব্রাহে আবিষ্কার করেন। তাঁরই গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়, নক্ষত্রেরও মৃত্যু আছে। মৃত্যুকালে নক্ষত্রের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে এবং পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত হয়ে পড়ে। তখন নক্ষত্রটিকে বেশ উজ্জ্বল দেখায়। এই অবস্থায় নক্ষত্রটিকে বলা হয় নবতারা বা "নোভা"। প্রতি বছর আকাশে নবতারা দেখা যায়।

গ্রহদের দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র—সূত্রটি ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে গণিতজ্ঞ "বোড"

এবং তাঁর সহকর্মী টিসিয়াস আবিষ্কার করেন। সূত্রটিতে মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে, যে কোন দুটি গ্রহের মধ্যে দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বের পরবর্তী গ্রহের অবস্থান। সূর্যের নিকটতম গ্রহগুলির ক্ষেত্রে সূত্রটি কিছুটা প্রযোজ্য হলেও সুদূরতম গ্রহগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ইউরেনাস—ইংরাজ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়ম হার্শেল ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইউরেনাসকে আবিষ্কার করেন। কথিত আছে, একদা মিথুন রাশি পর্যবেক্ষণ কালে একটি আলোর চাকতি দেখতে পান হার্শেল। প্রথমে তাঁর ধূমকেতু বলে ভ্রম হয়েছিল। পরে বোড ও টিসিয়াসের সূত্র প্রয়োগ করে বুঝতে পারেন, ঠিক এমনই জায়গায় কোন নতুন গ্রহ থাকলেও থাকতে পারে। অবশেষে অনুসন্ধানের পর হার্শেল আবিষ্কার করেন ইউরেনাসকে।

সিরিস নামক গ্রহাণু—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সিসিলির জ্যোতির্বিজ্ঞানী পিয়াজী আবিষ্কার করেন। গ্রহদের ক্ষেত্রে বোড টিসিয়াসের সূত্র প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখেন, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা। তখনই তাঁর সন্দেহ জাগে, এই দুই গ্রহের মধ্যে অবশ্যই একটি গ্রহ থাকতে পারে। উক্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে আবিষ্কার করেন গ্রহাণুপুঞ্জের সবচেয়ে বড় গ্রহাণু সিরিসকে। তারপরে আরও অনেক গ্রহাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। জানা গেছে, হাজার হাজার ছোট বড় বস্তুপিণ্ড এই অঞ্চলে আছে। গ্রহদের মত ওরাও সূর্য পরিক্রমা করছে অথচ আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ঐ কারণে ওদের বলা হয় গ্রহাণু। তবে গ্রহদের চেয়ে ওদের পথ অনেক বেশি উপবৃত্তাকার। গ্রহাণুদের মধ্যে একমাত্র সিরিসই আকারে বড়। তথাপি ওর ব্যাস মাত্র ৪৮০ মাইল। রোমক দেবতার নামানুসারে পিয়াজী গ্রহাণুটির নামকরণ করেছিলেন সিরিস।

নেপচুন—আডামস এবং লেভেরিয়ার নামক দুজন অঙ্কবিজ্ঞানী ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপচুন গ্রহটিকে আবিষ্কার করেন। ইউরেনাস আবিষ্কৃত হলে বৃহস্পতি, শনি ও অন্যান্য গ্রহদের মহাকর্ষীয় টান হিসাব করে ইউরেনাসের গতিবিধি ঠিক করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট বৈষম্য লক্ষ্য করেন। তখনই তাঁদের ধারণা হয়, ইউরেনাসের পরেও গ্রহ আছে। ইংরাজ বিজ্ঞানী আডামসই প্রথম গণনা করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু আবিষ্কার তিনি করতে পারেননি। আবিষ্কার করেছেন ফরাসী বিজ্ঞানী লেভেরিয়ার। অন্ধকার মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে উক্ত গ্রহটির নাম রোমক সমুদ্র দেবতা ইউরেনাসের নামানুসারেই রাখা হয়েছিল। সূর্য থেকে ২৭৯ কোটি মাইল দূরে ওর অবস্থান এবং সূর্যের

চারদিকে একবার ঘুরে আসতে তার সময় লাগে পৃথিবীর হিসাবে ১৬৪½ বছর।

শনি গ্রহের বলয়—১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী রচি শনি গ্রহের বলয়ের কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, গ্রহের চতুর্দিকে পরিক্রমারত উপগ্রহ যদি সেই গ্রহের ব্যাসার্ধের ২.৪৫ গুণের মধ্যে এসে পড়ে তাহলে উপগ্রহটি গৃহপৃষ্ঠে আছাড় খেয়ে পড়বে। শনির আগে ছিল দশটি উপগ্রহ। তাদের একটি কালক্রমে "রচির সীমানার" মধ্যে এসে পড়ায় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং সেই টুকরোগুলো শনির চারদিকে পরিভ্রমণ করতে থাকে। এই টুকরোগুলো তিনটি স্তরে শনির চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্তর তিনটি দূরবীনের চোখে তিনটি মনোহর বলয় বলে মনে হয়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, বৃহস্পতির একটি উপগ্রহ এবং শনির আরও একটি উপগ্রহের ধ্বংসের সময় আসন্ন। গ্রহের চারদিকে গ্রহের ব্যাসার্ধের ২.৪৫ গুণ দূরত্বকে বলা হয় "রচির সীমানা"।

সেফাইড নক্ষত্র—দূরবীনের সাহায্যে আকাশে এমন অনেক নক্ষত্র দেখা যায়—যাদের একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা যায় আবার পরক্ষণে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। উজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ার মধ্যবর্ত্তী সময়কে বলা হয় স্পন্দন কাল। সেফাইডদের স্পন্দনকাল কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ। আকাশে আরও এক ধরণের তারার ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি আসলে যুগল নক্ষত্র। দূর থেকে ওদের একক নক্ষত্র বলে ভ্রম হয়। ওরাও একে অপরের চারদিকে পরিক্রম করছে। পরিক্রমা করতে করতে কখন এরা পাশাপাশি হয় আবার কখনও একটি অপরটির আড়াল হয়ে যায়। যখন পাশাপাশি হয় তখন উজ্জ্বল দেখায় আর আড়াল হলে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কিন্তু সেফাইড তারারা একক নক্ষত্র। ওদের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটার কারণ, ওদের দেহটা আপনা হতেই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। সঙ্কুচিত হলে উজ্জ্বল হয় এবং প্রসারিত হলে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। আমেরিকার হার্ভার্ড মানমন্দিরের বিখ্যাত মহিলা জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেনরিয়েটা লিয়াভিট ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সেফাইড তারা সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করেছেন। তাঁর এই মূল্যবান আবিষ্কার থেকে সেফাইড তারা সমন্বিত সুদূর নীহারিকা লোকের দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

নক্ষত্রের আবর্তন—আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রকে আমরা সাধারণত একক অবস্থায় আছে বলে মনে করি। কিন্তু ওরা সবাই একক নয়। একক নক্ষত্র কিছু আছে সত্য, তবে বেশিরভাগই সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে। গ্রহদের মত ওরাও আবর্তন করে এবং আপন আপন কক্ষপথ অবলম্বনে পরিভ্রমণও

করে। অর্থাৎ নক্ষত্রতাও স্থির নয়। এই সত্যটি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সি. টি. এলভি এবং অটো স্টুভ ইয়ের্কস মানমন্দিরে গবেষণাকালে উদ্ঘাটিত করেন।

প্লুটো—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ তরুণ গবেষক টমবাউ প্লুটো গ্রহটিকে আবিষ্কার করেন। তবে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পার্সিভ্যাল লাওয়েল নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী গবেষণা করে ঠিক করেছিলেন, নেপচুনের পরে আরও গ্রহ আছে। তখন তিনি নতুন গ্রহটি অনুসন্ধানে যত্নবান হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর। দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের পর যখন তিনি কৃতকার্য হতে যাচ্ছেন—ঠিক সেই সময় পরলোক গমন করলেন। তাঁরই গবেষণাগারে গবেষণা করে টমবাউ তাঁর আরব্ধ কাজকে সুসম্পন্ন করেন। 'প্লুটো'-এই নামের পেছনেও আছে এই দুই বিজ্ঞানীর নাম। পারসিভ্যাল লাওরেল এর দুটি অক্ষর পি এবং এল আর টমবাউর টি। অন্যদিকে গ্রীক পুরাণে বর্ণিত অন্ধকার পাতাল-পুরীর দেবতার নামও প্লুটো। সৌরজগতের শেষ সীমায় অবস্থিত প্লুটোর অঞ্চল তমসাবৃত অঞ্চল ছাড়া আর কি। সূর্য থেকে ৩৬৭ কোটি মাইল দূরে থেকে ২৪৮ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সেখান থেকে সূর্যকে দেখা যায় আকাশের যে কোন একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মত।

ডপলার তত্ত্ব—পদার্থ বিজ্ঞানে ডপলার তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দূরাগত ট্রেনের বাঁশীর শব্দকে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করা হয়। কোন ট্রেন যদি বাঁশী বাজাতে বাজাতে ছুটে চলে যায় তাহলে ট্রেনের আসার সময় বাঁশীর শব্দ অত্যন্ত চড়া মনে হয়। স্টেশনে দাঁড়ালে স্বাভাবিক এবং স্টেশন ছেড়ে চলে গেলে বাঁশীর শব্দের তীব্রতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। ট্রেনের বাঁশী অবশ্য স্থির ও চলন্ত উভয় অবস্থাতেই প্রতি সেকেণ্ডে একক সংখ্যক তরঙ্গ সৃষ্টি করছে। আর আমরা জানি, শব্দ মাত্রই বায়ুতে তরঙ্গ সৃষ্টি করছে। তাই ট্রেন যখন আমাদের দিকে ছুটে আসে তখন আমাদের কানে প্রতি সেকেণ্ডে বাঁশী কর্তৃক সৃষ্ট তরঙ্গ অপেক্ষা আরও বেশি তরঙ্গ আঘাত করে। তাই শব্দকে জোরাল মনে হয়। কিন্তু দূরে চলে গেলে কম সংখ্যক তরঙ্গ কানে আসে বলে তীব্রতা হ্রাস পায়। উক্ত তত্ত্বটির আবিষ্কারক ডপলার। তাই তাঁর তত্ত্বকে বলা হয় ডপলার তত্ত্ব।

ডপলার তত্ত্বকে আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অসাধ্যকে সাধন করেছেন। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, কোন নক্ষত্র আমাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তার বর্ণালী বেগুনী আলোর দিকে সরে আসে এবং দূরে চলে গেলে লাল আলোর দিকে সরে যায়। তাই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, কোন নক্ষত্র কত বেগে কোনদিকে এগিয়ে চলেছে।

উক্ত আবিষ্কারটির মাধ্যমে পরবর্তীকালে ব্রহ্মাণ্ডের গতিশীল রূপটি বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়েছে। তাছাড়া এক একটি নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সীর দূরত্বও নির্ণয় করা হয়েছে বর্ণালীতে লাল আলোর অবসরণ বেগ হিসেব করে। এ বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন বিজ্ঞানী "হাবল" ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকৃতপক্ষে মহাকাশের বহু তথ্য হস্তগত হয়েছে আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে ডপলার তত্ত্বকে প্রয়োগ করে।

নক্ষত্র পৃষ্ঠে তাপের উৎস—১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার প্রসিদ্ধ পদার্থ বিজ্ঞানী বেথে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস সংযোজনের ফলে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয়—এই সত্যটি আবিষ্কার করেন।

নক্ষত্র জন্ম মুহূর্তে লাভ করে বিশাল হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার। কারণ, যে ঘন মেঘের স্তূপ থেকে নক্ষত্রের জন্ম হয় সেই মেঘের প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন অণু ও পরমাণু। নক্ষত্র জন্মগ্রহণ করার পর প্রচণ্ড তাপে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস সংযোজিত হয়ে উৎপন্ন করে হিলিয়াম। যতদিন তার হাইড্রোজেন ভাণ্ডার শেষ না হচ্ছে ততদিন একই হারে তাপ বিলিয়ে যাচ্ছে। সে ভাণ্ডার এত বিশাল যে, কয়েকশ কোটি বছর ধরে চলে এই বিক্রিয়া। তারপর ভাণ্ডার শেষ হলেই চিরতরে নিভে যায় নক্ষত্র। অর্থাৎ তখনই নক্ষত্রের মৃত্যু ঘটে। বেথের আবিষ্কারের ফলে আমাদের সূর্যদেবের এত অফুরন্ত তাপ শক্তির কথা পৃথিবীর মানুষের কাছে ধরা পড়েছে।

ফ্রাউনহোফার রেখা—সূর্য পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পরিমাণ প্রায় ৬০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। আবার অভ্যন্তরের দিকে এই তাপমাত্রা আরও অনেক বেশি। তাই সেখানকার কোন বস্তুই কঠিন বা তরল অবস্থায় নেই। সমস্তই অবস্থান করছে গ্যাসীয় অবস্থায়।

সূর্যের আবহমণ্ডল তিন অংশে বিভক্ত। আলোকমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল। আলোক মণ্ডলের বহিরাবরণকে আবার বলা হয় বিশোষণ মণ্ডল। এখানকার তাপমাত্রা আলোকমণ্ডল থেকে অনেক কম। যখন সূর্যরশ্মি আলোকমণ্ডল থেকে বিশোষণ মণ্ডল ভেদ করে বেরিয়ে আসে তখন সেখানকার গ্যাস রাশি নিজ নিজ বর্ণালীর আলোক সূর্যরশ্মি থেকে শোষণ করে নেয়। ঐ কারণে সূর্যরশ্মিকে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে যে সাত রঙের বর্ণালী পাওয়া যায় তাতে অসংখ্য কালো কালো রেখা দেখা যায়। ঐ রেখা প্রথম বিজ্ঞানী ফ্রাউনহোফার আবিষ্কার করেছিলেন বলে রেখাগুলিকে বলা হয় "ফ্রাউনহোফার রেখা"। কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। তাঁর পরীক্ষা থেকে সূর্যের গঠন উপাদান এবং তার পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা নির্ণয়

করা সম্ভব হয়েছে।

নক্ষত্রের বর্ণালী—নক্ষত্রপৃষ্ঠে পদার্থ মাত্রই গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে এবং নক্ষত্রের আলোকরশ্মি মাত্রই গ্যাস থেকে উৎসারিত হয়। তাই বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্রের রশ্মিকে বিশ্লেষণ করলে নক্ষত্রের গঠন উপাদান নির্ণয় করা যায়। এই পর্যায়ে ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহার অবদানই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রথম সূর্যরশ্মিকে বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে পার্থিব বস্তুকণার সন্ধান লাভ করেন। সেই থেকে প্রমাণিত হয়, সূর্য থেকেই পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছে। কেবল সূর্য নয়, নক্ষত্র থেকে বিকীর্ণ রশ্মির বর্ণালী তাঁরই পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করে জানা যায়, ঐ নক্ষত্র কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থ নিয়ে গঠিত। তিনি আরও প্রমাণ করেন, সব নক্ষত্রের বর্ণালী একই ধরণের নয়। সূর্যরশ্মিকে বিশ্লেষণ করে তিনি প্রমাণ করেছেন, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কারবন, সোনা, রূপা, লোহা, নিকেল, সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি সবকিছুই আছে।

ফ্রাউন হোফার লাইনের কথা একটু বিশ্লেষণ করলে সাহার আবিষ্কারের গুরুত্ব আরও প্রকাশ পাবে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নক্ষত্রপৃষ্ঠের হাজার হাজার মাইল উপর পর্যন্ত তার আবহমণ্ডল বিস্তৃত। নক্ষত্রপৃষ্ঠের যে তাপমাত্রা, তার আবহমণ্ডলে সে তাপমাত্রা থাকে না। উপরের দিকে ক্রমশ শীতল। নক্ষত্রপৃষ্ঠে উত্তপ্ত কোন গ্যাসীয় আলো যখন উপরের দিকে সেই গ্যাসের অপেক্ষাকৃত শীতল স্তর ভেদ করে আসে তখন শীতল স্তর তাকে শোষণ করে নেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সোডিয়ামের আলোকরশ্মি যখন শীতল সোডিয়াম গ্যাসের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয় তখন শোষিত হয়ে যায়। তাই বর্ণালীতে সোডিয়ামের হলদে জায়গার বদলে দেখা যায় কালো রেখা। তাই বোঝা যায়, তার আবহমণ্ডলেও সোডিয়াম আছে। অন্যান্য মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। বর্ণালীতে কালো রেখার অবস্থান ও প্রগাঢ়তার পার্থক্য থেকে ডঃ মেঘনাদ সাহা যে-কোন নক্ষত্র-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আদিম কণিকা মতবাদ—প্রবক্তা বেলজিয়ামের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জি. ই. লেমেটার। তাঁর মতে, আদিতে মহাবিশ্ব আজকের মত এত বিশাল ছিল না এবং নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ কিছু ছিল না। একেবারেই ছিল শূন্য। কোটি কোটি বছর পরে মহাশূন্যের এক কোণে একরকম আদিম কণিকার সৃষ্টি হয়। কালক্রমে সেই আদিম কণিকা থেকে প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন প্রভৃতির সৃষ্টি। তারপর শত শত কোটি বছরের ব্যবধানে প্রোটন, নিউট্রন,

ইলেকট্রন ইত্যাদি থেকে গ্যাসীয় পরমাণুর সৃষ্টি হয়েছে। সেই আদিম কণিকার নামকরণ করা হয়েছে "ইলেম"। লেমেটার উক্ত মতবাদটি প্রকাশ করেন ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর এই মতবাদকে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির "কণিকা মতবাদ" নামে আখ্যা প্রদান করা হয়। জর্জ গ্যামো নামে এক ইংরাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী লেমেটারের মতবাদকে সমর্থন করে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ মতবাদ প্রবর্তন করেন। গ্যামোর মতবাদ অনুসারে, আদিম কণিকা একসময় জমাট বাঁধা একটি বিশাল পিণ্ডের রূপ নেয়। তারপর সেই পিণ্ডের ঘনত্ব বাড়তে থাকে প্রচণ্ডভাবে। তার ফলে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড তাপ। অবশেষে সেই প্রচণ্ড ঘনত্ব ও তাপে আদিম জমাট-বাঁধা পিণ্ডটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে না পেরে তারমধ্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণের ফলেই আদিম কণিকা ভেঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি।

ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ ও নক্ষত্রলোক—১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ ই. পি. হাবল মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরে গবেষণা-কালে "২০০ ইঞ্চি" দূরবীনের সাহায্যে প্রমাণ করেন, কোটি কোটি নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সী নিয়ে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গড়ে উঠেছে। আমাদের পৃথিবীর চার-পাশে যে অজস্র ছোট বড় নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ দেখতে পাই তারা পৃথিবী যে নক্ষত্রজগতে অবস্থান করছে—তারই বাসিন্দা। এক একটি নক্ষত্রজগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব কয়েকশ আলোকবর্ষ। তারপরে আবার কয়েকশ আলোকবর্ষ ফাঁকা—তারপর আর একটি নক্ষত্রজগৎ। এই-ভাবে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রজগৎ নিয়ে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গঠিত।

বিজ্ঞানী হাবলই এই তত্ত্বের প্রচারক। তাঁর মতে আদিতে সমস্ত নক্ষত্র-জগৎ বা গ্যালাক্সীগুলি পাশাপাশি অবস্থান করতো। ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে বলেই আজকে গ্যালাক্সীগুলি ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে পড়েছে এবং এক গ্যালাক্সী থেকে অপর গ্যালাক্সীর দূরত্ব ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। তাঁর মতে ব্রহ্মাণ্ডের কোন প্রান্ত সীমা নেই।

হাবল এবং তাঁর সহকারী হুমাসন একটি বিশেষ সূত্রও প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের মতে এক গ্যালাক্সী থেকে আর এক গ্যালাক্সীর দূরত্ব এবং উভয়ের অপসরণ বেগ সমানুপাতিক। বর্ণালীতে লালের অপসরণ হিসাব করে উক্ত সূত্রটিকে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সূত্রটিকে তাই বলা হয় 'লাল অপসরণ' সূত্র। এই সূত্র আরও প্রমাণ করে, আমাদের পৃথিবী থেকে ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের কোন গ্যালাক্সীর সন্ধান মানুষ কোনকালেই লাভ করতে পারবে না। কারণ, সূত্রানুযায়ী দেখা যায়, অতিদূরের গ্যালাক্সীগুলির

অপসরণ বেগ ক্রমান্বয়ে বেশি। ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দুরে অবস্থিত গ্যালাক্সীর অপসরণ বেগ আলোকের গতিবেগের সমান। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী কোনকিছুর গতিবেগ আলোকের গতিবেগের চেয়ে বেশি হতে পারে না। হাবল মনে করেন, ব্রহ্মাণ্ড অসীম। ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবশ্যই গ্যালাক্সী আছে। তাই গাণিতিক তত্ত্ব অনুযায়ী এতদূরের গ্যালাক্সীর খবর বিজ্ঞান যত উন্নত হোক না কেন কোনদিন লাভ করতে পারবে না। অতএব বলা যেতে পারে, আমাদের দৃষ্টিসীমা ঐ ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ পর্যন্ত।

গ্রহ সৃষ্টির উল্কা মতবাদ—এই মতবাদটি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ফন উইৎসেকার প্রচার করেন। কথিত আছে একই সময়ে ঐ একই মতবাদ রুশবিজ্ঞানী অটোস্মিথও রেখেছিলেন। কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় তাঁর মতবাদটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

এই মতবাদ অনুযায়ী, আদিতে অর্থাৎ জন্মলগ্নে সূর্য ধূলিমিশ্রিত গ্যাস সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। মহাকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী বাহিরের ধূলিকণাগুলি আপন আপন বৃত্তাভাস পথে পরিক্রমা করছিল সূর্যকে। ধূলিকণার সংখ্যা আবার ছিল অগণিত এবং তাদের সূর্য পরিক্রমার পথও ছিল অসংখ্য। বিভিন্ন সমতলে ভ্রাম্যমাণ ধূলিকণার মধ্যে অনিবার্যভাবে বেধে চলে সংঘাত। ফলে কণাগুলোর আকৃতিগুলি একটু একটু করে বাড়তে থাকে। অবশেষে যখন আরও বড় হলো, তখন নিজেরাই লাভ করলো আকর্ষণ শক্তি। বড়-গুলো ক্রমশ ছোট ছোট বস্তুপিণ্ডকে আত্মসাৎ করে বিরাট আকার ধারণ করলো। এইভাবে সৃষ্টি হল গ্রহ। আর যে সব বড় পিণ্ড দূরত্বহেতু গ্রহে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারল না তারা গ্রহের আকর্ষণের আওতায় থেকে গ্রহকেই অবলম্বন করে ঘুরতে লাগল। এরা হল উপগ্রহ। উইৎসেকারের এই মতকে কুইপার প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা সমর্থন করেন।

গ্রহ সৃষ্টির বলয় মতবাদ—এই মতবাদের প্রবর্তক ফ্রেড হয়েল। তাঁর মতে সূর্য জন্ম নিয়েছিল বিশাল আয়তনের গ্যাসীয় স্তূপ থেকে। স্তূপটির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব ছিল প্রায় দশ লক্ষ কোটি মাইলের মত। তার মধ্যে অস্থিরভাবে অবস্থান করছিল বিরল গ্যাসকণিকা। পরে গ্যাসীয় স্তূপটি আবর্তন ও সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ করে। সঙ্কোচনের মাত্রা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকলে তার আবর্তনবেগ এবং তাপমাত্রা দুইই বেড়ে চলে। পরিশেষে দপ করে জ্বলে উঠে রূপ নিল সূর্যের।

আদিম সূর্যের আবর্তন বেগও ছিল প্রচণ্ড। তার ফলে সূর্যদেহ সঙ্কুচিত

হয়ে বতুলাকার প্রাপ্ত হয়। আরও আবর্তন বেগ বাড়লে মেরুদ্বয় ভেতরের দিকে একটু একটু করে ঢুকে পড়ে এবং বিষুববৃত্ত স্ফীত হয়ে ওঠে। তারপরে সেই স্ফীত অংশ সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রূপ নেয় বলয়ের। বলয় সৃষ্টি হওয়ার পর সেই বলয়টি একদিকে যেমন সূর্যকে প্রচণ্ডভাবে আবর্তন করতে বাধা দিল অপরদিকে তেমনই বলয়টা একটু একটু করে দূরে সরে যেতে আরম্ভ করলো। সূর্যের আকর্ষণ বল অবশ্য তার উপরেও কাজ করছিল। তবুও বিরাট বলয়কে একটু একটু করে দূরে সরে যেতে অসুবিধা হয়নি।

বলয়টি দূরে গেলে শীতল হতে আরম্ভ করে এবং গ্যাসের ভেতর থেকে উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের পদার্থ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। তারপর আরও যখন দূরে সরে যায় তখন ধীরে ধীরে নিম্নতর স্ফুটনাঙ্কের পদার্থও বিচ্ছিন্ন হয়। পরে উল্কা মতবাদের মতই ছোট ছোট কণা থেকে বৃহৎ বৃহৎ বস্তুপিণ্ড তথা গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

গণিত

গণিত শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো, যা গণনা বা হিসেব করে পাওয়া যায়। আবার গণিতের ইংরাজী প্রতিশব্দ "ম্যাথমেটিকস" এসেছে গ্রীকভাষা থেকে। "ম্যাথমেটিকস" কথাটির প্রকৃত অর্থ "শিক্ষা"। প্রথমে হয়ত উক্ত অর্থেই ব্যবহার করা হতো। পরে শব্দটি ব্যাপক অর্থে—অর্থাৎ আমরা "গণিত" কথাটির দ্বারা যা বুঝি সেই অর্থেই ব্যবহৃত হতে থাকে।

বাংলা "গণিত" শব্দটি এসেছে গণ্ ধাতুতে ত প্রত্যয় যোগ করে। গণ্ শব্দের অর্থ দুটি। এক অর্থে গণনা বা হিসাব এবং অপর অর্থে সমষ্টি। গণশক্তি, গণতন্ত্র প্রভৃতি শব্দ দ্বিতীয় অর্থকে বহন করে।

পণ্ডিতেরা গণিতের ইতিহাসকে প্রধান চারটি যুগে ভাগ করেছেন। প্রথম যুগ—প্রাগৈতিহাসিক যুগ। এই যুগের সীমারেখা নির্দেশ করা বড় কষ্টকর। তবুও ধরা যেতে পারে, এর স্থায়িত্বকাল প্রস্তরযুগ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার অব্দ পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে গণিতের জন্ম ঐ প্রাগৈতিহাসিক যুগেই। তবে তখন গণিতটা কেবলমাত্র হিসাব-নিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনে কিছুটা জ্যামিতি চর্চা হয়েছিল। তাদের সে জ্যামিতি আবার ছিল পরিমিতির নামান্তর। কেউ কেউ মনে করেন, এই যুগের শেষের দিকে ভগ্নাংশ ও দশমিকের প্রচলন হয়েছিল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরবর্তী যুগকে বলা হয় প্রাচীন যুগ। এই যুগে গণিতের অনেকগুলি শাখার উদ্ভব হয়েছিল গ্রীক ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা। বিশেষ করে পাটীগণিত ও জ্যামিতি চূড়ান্তরূপ গ্রহণ করেছিল এবং জন্ম হয়েছিল বীজগণিতের।

প্রাচীন যুগে গণিতের যে শাখাটি সর্বাগ্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি জ্যামিতি। মিশর, ব্যাবিলন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে উদ্ভূত জ্যামিতিকে সংগ্রহ করে গ্রীকরাই প্রথম প্রণালীবদ্ধ জ্যামিতির সূত্রপাত করেন। এ বিষয়ে যাঁর দানকে সবার আগে স্বীকার করতে হয়, তিনি হচ্ছেন ইউক্লিড। থেলস্, পিথাগোরাস প্রভৃতি গণিতজ্ঞদের অবদানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গ্রীক-দের দ্বারা আবিষ্কৃত প্রধান প্রধান জ্যামিতিক তথ্যগুলি হলো, বৃত্তকে সমদ্বি-খণ্ডিত করণ এবং বৃত্তের পরিধির সঙ্গে ব্যাসের সম্পর্ক নির্ণয়, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ সম্পর্কিত উপপাদ্য, সদৃশচিত্র বা "সিমিলার ফিগারস" এর কয়েকটি সূত্র।

বীজগণিতের দ্বিঘাত সমীকরণের উদ্ভব এই প্রাচীন যুগে। এ যুগের আর একটি মূল্যবান অবদান, বীজগণিতের সাধারণ নিয়মের সাহায্যে জ্যামিতিক সমস্যাগুলির সমাধান। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন ভারতবর্ষের আর্যভট্ট (১ম) ও ব্রহ্মগুপ্ত। অন্যদিকে পাটীগণিতের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। ন'টি সংখ্যা এবং ০ দ্বারা সংখ্যা প্রকাশ করার পদ্ধতি ভারত আবিষ্কার করে যে মহদুপকার সাধন করেছে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। রোমান আমল পর্যন্ত কতকগুলি চিহ্ন বা সঙ্কেতের দ্বারা বড় বড় সংখ্যাগুলি প্রকাশ করা হতো। তবে সে সংখ্যা হাজার-দু হাজারের বেশি নয়। তাদের সে সংখ্যা গণনা শিক্ষা করতেও যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হতো। যখন ভারত ০ ব্যবহার করে কোটি কোটি সংখ্যা প্রকাশ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করলো তখনই সারা বিশ্ব সেই পদ্ধতিকে একেবারে লুফে নিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই পদ্ধতিটির আবিষ্কারকের নাম পাওয়া যায় না।

সভূর সমুত্থান, সুদকষা, বিন্যাস, ত্রৈরাশিক, গুণোত্তর ও সমান্তর শ্রেণীর উদ্ভব ঐ প্রাচীন যুগে। গণিতের অন্যান্য শাখাগুলির মধ্যে গতিবিদ্যার জন্ম হয় গ্রীকবিজ্ঞানী আর্কিমিদিসের হাতে এবং কনিক সেকসান ও স্থানাঙ্ক জ্যামিতির ভিত্তি স্থাপন করেন অ্যাপোলোনিয়াস নামে আর একজন গ্রীক গণিতজ্ঞ। মোটকথা গণিতের প্রধান প্রধান শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছিল প্রাচীন যুগেই।

গণিতের তৃতীয় যুগ বা মধ্যযুগ সুরু হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে এবং এর ব্যাপ্তিকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এইযুগে গণিত চর্চা ভারত অব্যাহত রেখেছিল। আরবে নবজাগরণ সুরু হলে বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার মত গণিতের অনুশীলনেও তারা যত্নবান হয়। গণিতের অন্যান্য শাখায় তাদের বিশেষ মৌলিক অবদান না থাকলেও প্রণালীবদ্ধ বীজগণিতের আলোচনা করেছিল আরবই। ভারতের মহাবীরাচার্য, শ্রীধরাচার্য ও ভাস্করাচার্যই মধ্যযুগের গণিতের আকাশে তিনটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ। এদের মধ্যে ভাস্করাচার্যের রচনায় আবার ক্যালকুলাস বা কলনবিদ্যার উল্লেখ আছে। তবে সার্বিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, মধ্যযুগে গণিতের ভাণ্ডারে যেটুকু যুক্ত হয়েছিল তার পরিমাণ অতি নগণ্য।

গণিতের চতুর্থযুগ তথা আধুনিক যুগের সূত্রপাত ষোড়শ শতাব্দীতে মহাগণিতজ্ঞ ও দার্শনিক রেনে দেকার্ত এবং পিয়ের দ্য ফেরমার কাছে। অনেকে এই দুই মনীষীকে যুগসন্ধিক্ষণের গণিতজ্ঞ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। এঁদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান হলো, এঁরা বীজগণিত ও জ্যামিতি—গণিতের এই দুটি ধারার সমন্বয় করে বৈশ্লেষিক জ্যামিতি নামে এক নতুন শাখার জন্মদান করেন। সে সময় আরও একজন দার্শনিক ও গণিতজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছিল। নাম তাঁর ব্লেইজ পাস্কাল। কথিত আছে, এক জুয়াড়ীর প্রশ্নকে অবলম্বন করে ফেরমা ও পাস্কালের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল, তা থেকে জন্মলাভ করেছে "সম্ভাব্যবাদ" নামে গণিতের একটি শাখা।

দেকার্ত, ফেরমা ও পাস্কালের পর গণিত লাভ করে মহামতি নিউটনকে। নিউটন আবিষ্কৃত কলনবিদ্যা গণিতকে এক নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দান করে। অবশ্য একই সময়ে লাইবনিট্জ্ নামে অপর এক গণিতজ্ঞও কলনবিদ্যা আবিষ্কার করেছিলেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই বিজ্ঞানীরা কলনবিদ্যা বা ক্যালকুলাসকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। তার ফলে গণিতের বিভিন্ন শাখার পরিধি অভাবনীয়ভাবে বেড়ে চলে। নিউটনের দ্বারা গতিবিদ্যা নামক গণিতের শাখাটিও দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত গণিতের শাখাগুলির কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা ছিল না। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই গণিত বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই শতাব্দীতেই জন্মলাভ করে বিশ্লেষণবিদ্যা বা অ্যানালিসিস, সেট তত্ত্ব বা থিওরি অফ সেট্স, নিত্যবাদ বা থিওরি অফ ইনভেরিয়েন্স, ভেদ কলনবিদ্যা বা ক্যালকুলাস অফ ভেরিয়েশনস্, বিমূর্ত বীজগণিত, টপলজি এবং বিভিন্ন ধরণের জ্যামিতি।

বিংশ শতাব্দীতে বিমূর্ত গণিতের উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি ও প্রসার লাভ ঘটে। আপেক্ষিকবাদ ও কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা আবার গণিতের ক্ষেত্রে এই শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাছাড়া জ্যামিতির পরিধিও বেড়ে উঠেছে আশ্চর্যজনকভাবে।

অনেকে বর্তমান যুগের গণিতকে বিশুদ্ধ ও ফলিত—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করতে চান। সংখ্যাতত্ত্ব, জ্যামিতি, বিমূর্ত বীজগণিত ও তার বিভিন্ন শাখা, বিশ্লেষণবিদ্যা প্রভৃতি যেগুলি আলোচনার ক্ষেত্রে গাণিতিকরূপ প্রাধান্য লাভ করে সেইগুলিকে তাঁরা নির্দেশ করেন বিশুদ্ধ গণিত আর বলবিদ্যা, পরিসংখ্যান প্রভৃতিকে গণিতের উপরোক্ত শাখা সমূহে প্রয়োগ করা হয় বলে নির্দেশ করেন ফলিত গণিত। তবে বহু গণিতজ্ঞের এইভাবে শ্রেণী-বিভাগ মনঃপূত নয়। তাঁরা মনে করেন, এই দুভাগের কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা সম্ভব নয়।

আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত গণিতকে মাত্রিক ও বৈশেষিক অপর দুভাগে ভাগ করে থাকেন। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, বলবিদ্যা ও ফলিত গণিতকে মাত্রিক এবং বিমূর্ত বীজগণিত, সেটতত্ত্ব, টপলজি প্রভৃতিকে বৈশেষিক শ্রেণীভুক্ত করেছেন। তবে অসঙ্গতি এখানেও কিছু কম নেই।

বর্তমানে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় গণিতকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কেবলমাত্র বিজ্ঞানের একটি শাখারূপে সে আর পরিচিত হচ্ছে না। চিত্রকলা, সমাজ বিদ্যা, এমন কি ভাষাতত্ত্বেও গণিতকে ব্যাপক-ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই গণিতকে একটি কলা হিসাবে এখন অভিহিত করা হয়।

গণিতের কয়েকটি শাখা

জ্যামিতি—ব্যবহারিক প্রয়োজনে অর্থাৎ জমিকে মাপতে গিয়ে একদিন জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছিল। "জ্যামিতি" শব্দটিও সেই অর্থ নির্দেশ করে। "জ্যা" অর্থে জমি এবং "মিতি" অর্থে পরিমাপকে বুঝায়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, জ্যামিতির ক্ষেত্রে প্রাচীন মিশরের দানই সর্বাধিক। তাছাড়া ব্যাবিলন এবং ভারতের কাছেও জ্যামিতি ঋণী। আরও উল্লেখ করা হয়েছে, প্রণালীবদ্ধ জ্যামিতির সূত্রপাত করেন গ্রীকরাই। গ্রীসে জ্যামিতি চর্চা অন্যতম শ্রেষ্ঠবিদ্যা বলে পরিচিত ছিল। মহামতি

পিথাগোরাস তাঁর দ্বারদেশে লিখে রেখেছিলেন "যে ব্যক্তির জ্যামিতি জানা নেই তার প্রবেশের অধিকার নেই।"

ইউক্লিডের কথাও পূর্বে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যে জ্যামিতির গ্রন্থটি সঙ্কলন করেছিলেন সেই গ্রন্থটির নাম "এলেমেন্টস"। ২৩টি সংজ্ঞা, ৫টি প্রতিজ্ঞা, ৫টি সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করে তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর মহাগ্রন্থকে। মধ্যযুগে একমাত্র ভারতবর্ষই জ্যামিতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। আরব সে-যুগে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত জ্যামিতির চর্চা করলেও তেমন কোন অবদান রাখতে পারেনি।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রথম জ্যামিতি চর্চার সূত্রপাত করেন কেপলার। তারপর প্রায় একশ বছর ধরে ইউক্লিডের জ্যামিতিকে নিয়েই গবেষণা হয়। আধুনিক বৈশ্লেষিক জ্যামিতির সৃষ্টি করেন দেকার্ত ও ফেরমা। এই জ্যামিতির বৈশিষ্ট্য হলো, কোন জ্যামিতিক সমস্যাকে অনুরূপ কোন বীজগণিতের সমস্যায় রূপান্তরিত করা। ওঁদের দুজনের প্রচেষ্টায় জ্যামিতি ও বীজগণিতের সমন্বয় সাধন হয়।

নিউটন ও লাইবনিট্স-এর ক্যালকুলাস আবিষ্কারের পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্যামিতির ক্ষেত্রেও অন্তরকলন ও সমাকলন ব্যবহার হতে থাকে। ফলে জ্যামিতির যে শাখাটি উৎপন্ন হয় তার নাম অন্তরকলক জ্যামিতি। জ্যামিতির এই শাখার ভিত্তি স্থাপন করেন "মঁজ", "জোসেফ আলফ্রেড সেরে" নামক দুজন গণিতজ্ঞ। পরে "রি মান" নামক আর একজন গণিতজ্ঞও জ্যামিতিবিদ উক্ত শাখাটির উন্নতি সাধন করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী গণিতজ্ঞ "দেজার্গ" একটি বিশেষ উপপাদ্য প্রণয়ন করেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেজার্গের সেই উপপাদ্য থেকে জ্যামিতির একটি নতুন শাখার জন্ম হয়। সেই শাখাটির নাম হয় প্রক্ষেপক জ্যামিতি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইউক্লিডের জ্যামিতিকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন পণ্ডিতেরা। বিশেষ করে ইউক্লিডের পঞ্চম প্রতিজ্ঞাটিকে প্রমাণ করার নানা অসফল প্রচেষ্টা হয়েছিল। পঞ্চম প্রতিজ্ঞাটির বক্তব্য বিষয় ছিল, কোন সরলরেখার বহিঃস্থ কোন বিন্দু দিয়ে উক্ত সরলরেখার সমান্তরাল মাত্র একটি রেখাই অঙ্কত করা সম্ভব। হাঙ্গেরীর "বোয়াই" এবং রাশিয়ার লোবা চেভস্কিও দীর্ঘকাল যাবৎ উক্ত প্রতিজ্ঞাটি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন। পরে ইউক্লিডের অন্যান্য প্রতিজ্ঞাকে অপরিবর্তিত রেখে পঞ্চম প্রতিজ্ঞার একটি বিপরীত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে জ্যামিতি রচনা করেন। এই-

ভাবে উৎপন্ন হয় জ্যামিতির একটি নতুন শাখা—যার নামকরণ করা হয় "নন ইউক্লিডীয় জ্যামিতি"। বোয়াই এবং লোবা চেভস্কি উক্ত শাখার উদ্ভাবক। পরে এই শাখাটি হাইপার বোলিক জ্যামিতি নামে খ্যাত হয়। আরও পরে জ্যামিতিবিদ রিমানের দ্বারা সৃষ্টি হয় ইলিপটিক জ্যামিতি নামে আরও এক ধরণের জ্যামিতি এবং এই শাখাটিও নন ইউক্লিডীয় জ্যামিতির অন্তর্ভুক্ত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও এক ধরণের জ্যামিতির প্রবর্তন হয়। প্রবর্তক—ফ্রান্সের মঁজ এবং পঁসলে নামক দুজন জ্যামিতিবিদ। উক্ত শাখাটি "আধুনিক সাংশ্লেষিক জ্যামিতি" নামে খ্যাত। পরে শাখাটির চূড়ান্তরূপ দান করেছেন ফ্রান্সের শাল, জার্মানীর ফনস্টাউট ও ইতালির ক্রেমোনা। ওঁদেরই সমসাময়িক সময়ে "প্লুকার" কর্তৃক উদ্ভাবিত হয় বৈশ্লেষিক জ্যামিতি। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী জ্যামিতিবিদ মঁজের দ্বারা ডেসক্রিপটিভ জিওমেট্রি বা চিত্র জ্যামিতি নামে জ্যামিতির আর এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শাখার জন্ম হয়। উক্ত শাখাটিকে ব্যবহার করা হয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে।

উনবিংশ শতাব্দীতে জ্যামিতির ক্ষেত্রে বিপ্লব সূচনা করেছেন এরলাংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক "ক্লাইন"। একটি ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন, জ্যামিতির যে-কোন শাখা থেকে নতুন নতুন শাখার জন্মলাভ সম্ভব। সে সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি তত্ত্বও প্রচার করেন। সেই তত্ত্বগুলিকে অবলম্বন করে পরের দিকে বহু জ্যামিতিবিদ সৃষ্টি করেছেন জ্যামিতির বহু শাখা। তাঁদের গবেষণা কেবলমাত্র ক্লাইনের মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেনি, এখনও যে জ্যামিতির বহু শাখার জন্মদান করা সম্ভব—এই সত্যেরও প্রতিষ্ঠা করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর গবেষকদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন জার্মানীর হিলবার্ট, ফ্রান্সের আঁরি পোঁয়া কারে, আমেরিকার অসওয়াল্ড ভেবলিন, পেয়ানো এবং তাঁর ছাত্র পিয়েরি।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার মত জ্যামিতির পরিধিও অসম্ভবভাবে বিস্তার লাভ করেছে। গণিতের অপরাপর শাখার কথা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র জ্যামিতির উপরে বুৎপত্তিলাভ করতে হলেও দীর্ঘকালের গবেষণার প্রয়োজন। এই শতাব্দীতে 'মোন্টন' "নন দেজার্গীয় জ্যামিতি" রচনা করে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে এনেছেন। তিনি যে পদ্ধতিতে জ্যামিতি রচনা করেছেন সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে নন আর্কিমিডীয়, নন পাসকালীয় প্রভৃতি নানা ধরণের জ্যামিতির সৃষ্টি করা সম্ভব। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আরও কত নতুন জ্যামিতি সৃষ্টি হবে।

পাটীগণিত—সংখ্যার ব্যবহার সংক্রান্ত বিজ্ঞান পাটীগণিতের জন্ম মানব-সভ্যতার সুরুতে। মিশর, চীন, ব্যাবিলন, ভারত, সর্বদেশের জ্ঞানীগুণীরা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই পাটীগণিতের নানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। তবে একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রাচীনযুগে ভারতবর্ষই পাটী-গণিতকে তার যথার্থ রূপটি প্রদান করে। 'শূন্য'-কে কাজে লাগিয়ে বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা গঠন ভারতেরই দান। ত্রৈরাশিক, সুদকষা, বিন্যাস, সমবায়, সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণীর উদ্ভব এই ভারতবর্ষেই। আর্যভট্ট, শ্রীধরাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য, এঁরা সবাই পাটীগণিতের উন্নতি সাধন করে গেছেন। ভাস্করা-চার্যের লীলাবতী পাটীগণিতের একখানি মূল্যবান গ্রন্থ।

জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই আমাদের পাটীগণিতকে ব্যবহার করতে হয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, গণিতের এই শাখায় একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অবদান নেই।

পরিসংখ্যান—ইংরাজী স্ট্যাটিস্‌টিক্সের বাংলা প্রতিশব্দ পরিসংখ্যান। পাশ্চাত্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে পরিসংখ্যান তত্ত্বের ব্যবহার একেবারে আধুনিক কালের। বিদেশের প্রাচীন কোন গ্রন্থে পরিসংখ্যানের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতের কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থে পরিসংখ্যান তত্ত্বের উল্লেখ আছে। গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যের লেখা "অর্থশাস্ত্র"। এই থেকে মনে করা যেতে পারে, পরিসংখ্যান তত্ত্বের ব্যবহার প্রথমে ভারতবর্ষেই সুরু হয়।

পাশ্চাত্যে পরিসংখ্যানের মূল সূত্র প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত গাউস ও লাপ্লাসের লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিতে। তারপর উক্ত শাখাটির বিকাশ লাভ হয় ইংলণ্ডের কার্ল পিয়ার্সনের দ্বারা। পরবর্তীকালে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হয়েছে ডব্লু এস. গসেট, আর এ. ফিসার, জে. নেম্যান, ই এস. পিয়ার্সন, এ. ওয়াল্ড প্রভৃতির দ্বারা। ভারতের প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশও পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

বর্তমানে অর্থনীতিতে প্রতীকসংখ্যা নির্ধারণ, চাহিদা ও সরবরাহ বিশ্লেষণ, জনস্বাস্থ্য, আবহাওয়ার পূর্বাভাষ, মনোবিদ্যা, জীববিদ্যা, এমনকি পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নেও পরিসংখ্যানের ব্যবহার ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। তাছাড়া বিশ্লেষণ পরিসংখ্যান নামেও পরিসংখ্যানের আর একটি শাখার উদ্ভব হয়েছে।

বীজগণিত—বীজগণিত সম্বন্ধীয় প্রাচীনতম নিদর্শন একমাত্র মিশরে পাওয়া গেছে। তথাপি উক্ত শাস্ত্রের প্রকৃত স্রষ্টা প্রাচীন ভারতবর্ষ। হানকেল প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতেরা একথা স্বীকারও করেছেন। যে সময়

ভারতীয় গণিতজ্ঞদের দ্বারা বীজগণিতের উন্নতি সাধিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে প্রথম আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীরাচার্য, শ্রীধরাচার্য, দ্বিতীয় আর্যভট্ট, প্রথম ভাস্করাচার্য ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিঘাত সমীকরণের দুটি বীজ নির্ণয় করার পদ্ধতিকে আজও শ্রীধরাচার্যের পদ্ধতিরূপে উল্লেখ করা হয়। পাটীগণিতের আলোচনা থেকেই একদিন বীজগণিতের উদ্ভব হয়েছিল। পাটীগণিতের আলোচনা কেবলমাত্র ধন সংখ্যার মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। তাই ঋণসংখ্যা ও জটিলসংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েই উদ্ভব হয়েছিল বীজগণিতের। প্রাচীন গ্রীসও বীজগণিতের ক্ষেত্রে কিছুটা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিল।

আরবের অভ্যুত্থানের যুগে তারা গ্রীক ও ভারতীয় বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে নতুনভাবে আলোচনার সূত্রপাত করে। এই উদ্দেশ্যে মহম্মদ বেন মূসা আলখাওয়ারিজমী আরবীভাষায় রচনা করেন "আলজেবরওয়াল্ মোকা-বালা" নামক একখানি বীজগণিতের গ্রন্থ। বইখানির নাম বাংলায় রূপান্তর করলে অর্থ হয় "সমীকরণের পক্ষান্তর করণ ও পদ অপসারণ"। কালক্রমে "অ্যালজেব্রা" নামটির উদ্ভব হয়েছে তাঁরই লেখা গ্রন্থটি থেকে। যেহেতু পাটী-গণিতের তথ্যসমূহের সামান্যীকরণ ও প্রসারণই বীজগণিতের মূলসূত্র—তাই মহামতি নিউটন গণিতের উক্ত শাখাটিকে "ইউনিভারসাল এরিথমেটিক" আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।

আধুনিককালে বিজ্ঞানের ও গণিতের অন্যান্য শাখার মত এই শাখাটিকে নিয়েও যথেষ্ট গবেষণা হয়। তার ফলে জন্মগ্রহণ করে বিমূর্ত বীজগণিত। প্রাচীনকালে উদ্ভূত বীজগণিতের তত্ত্বসমূহের সামান্যীকরণ এবং ব্যাপকতর অর্থে প্রয়োগই—এই শাখার বিশেষত্ব।

বিমূর্ত বীজগণিত-সম্বন্ধে গবেষণার ফলে সেট, রিং, ফিল্ড, ইনটিগ্রালডোমেন প্রভৃতি গাণিতিক পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছে। হ্যামিলটন, বুল, মোরিয়াস প্রভৃতি গণিতজ্ঞদের গবেষণা থেকে আবার বিমূর্ত বীজগণিতের কয়েকটি শাখারও উদ্ভব হয়েছে। বুলের "নন নিউমারিক্যাল অ্যালজেব্রা" বা অসাংখ্য বীজগণিত, মোরিয়াসের "ব্যারিসেন্টিক ক্যালকুলাস", হ্যামিলটনের "কোয়ার্টার নিয়নস", ভেক্টর বীজগণিত প্রভৃতি পুস্তক বিমূর্ত বীজগণিতের এক একটি শাখা।

বর্তমানে বীজগণিতের একটি বড় অবদান সেটতত্ত্ব। গণিতের বিভিন্ন শাখায়, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে সেটতত্ত্বের প্রয়োগ করায় যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। উক্ত সেটতত্ত্বের আবিষ্কর্তা জর্জ ক্যাণ্টর। পরে উক্ত শাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন ইয়ং, বোরেল, আসকোলি প্রভৃতি গণিতজ্ঞরা।

বুলিয়ান অ্যালজেব্রা বীজগণিতের শাখাটি সেটতত্ত্বেরই সামান্যীকৃত রূপ।

বীজগণিতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন সমষ্টিতত্ত্ব নামক আর একটি গাণিতিক নিয়ম। উক্ত তত্ত্বের জন্মদাতা রুফিনি, গালোয়া এভারিস্ত, লাগ্রাঁজ, কার্ল ফ্রেডরিস গাউস, অয়লার প্রভৃতি গণিতজ্ঞরা। অনেকে অবশ্য বীজগণিতীয় সমষ্টিতত্ত্বের স্রষ্টা হিসাবে রুফিনির নাম করে থাকেন। তবে "সমষ্টি" এই শব্দটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেছেন গালোয়া এভারিস্ত। বিমূর্ত সমষ্টিতত্ত্বের উদ্ভাবক "কেলি" নামে একজন গণিতজ্ঞ। পরে সিলভেস্টার, ক্রনেকার, ফ্রবেনিয়াস প্রভৃতি গণিতজ্ঞরা উক্ত শাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ ক্লাইনও এবিষয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং কৃতিত্বের স্বাক্ষরও রেখে গেছেন।

প্রযুক্তিবিদ্যা

কারিগরি বিদ্যাটা মানুষের জন্মগত। ছোট শিশুর মধ্যেও এর বিকাশ আমরা লক্ষ্য করে থাকি। পণ্ডিতের মতে মানুষের ক্রমবিবর্তনটা শিশুর ভেতর দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাই আমরাও মনে করতে পারি—সেই উষালগ্নেই মানুষ মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করেছিল তার কারিগরি জ্ঞানের ভেতর দিয়ে। সত্য কথা বলতে কি, মানুষ যেদিন বুদ্ধিবলে গাছের ডালকে লাঠির মত বাগিয়ে ধরেছিল এবং পাথর ছুঁড়তে শিখেছিল সেইদিনই প্রকাশ পেয়েছিল তার কারিগরি জ্ঞান। তারপর কেটে গেছে কত সহস্র সহস্র বছর। মানুষ পাথরের অস্ত্রশস্ত্র বানিয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তার উন্নতি সাধন করেছে, পশুচর্মকে সেলাই করে পরিধান করেছে, মৃৎপাত্র নির্মাণ করেছে, গৃহনির্মাণ করেছে, কৃষিকাজের উপযোগী যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে, বস্ত্রবয়ন করেছে, ধাতুকে কাজে লাগিয়েছে, ইত্যাদি নানা কাজের ভেতর দিয়ে অগ্রগতি বজায় রেখেছে তার সভ্যতার। প্রকৃতপক্ষে সে জীবনের সমূহ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আহরণ করেছে ঐ কারিগরি বিদ্যাকে আয়ত্ত করার ফলে। এক কথায় মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস বলতে ঐ কারিগরি বিদ্যায় জ্ঞান অর্জনের ইতিহাস। এবং আরও সত্য যে, মানুষের বিজ্ঞান চেতনার উৎসও ঐ কারিগরিজ্ঞান।

সহস্র সহস্র বছরের ব্যবধানে সহস্র সহস্র কারিগরের কারিগরিজ্ঞানকে অবলম্বন করে আজ কারিগরিবিদ্যা তথা প্রযুক্তিবিদ্যা বা ইঞ্জিনীয়ারিং এমন এক অবস্থায় এসেছে—যার সবকিছুকে আয়ত্ত করা একক মানুষের স্বল্প

জীবনকালে একরকম অসম্ভব ব্যাপার। সুবিধার জন্য তাই প্রযুক্তিবিদ্যাকে আজ নানা বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। মূল বিভাগ হিসাবে পাঁচটি এবং পাঁচটির উপর নির্ভরশীল আরও কয়েকটি বিভাগ আজ প্রযুক্তিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। মূল বিভাগ পাঁচটি যথাক্রমে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, মাইনিং ও মেটালারজিক্যাল এবং কেমিক্যাল। এদের উপর নির্ভরশীল যে-সব প্রযুক্তিবিদ্যার বিভাগ আজকে পল্লবিত হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান হলো জনস্বাস্থ্য, জলনিকাশ, ময়লা অপসারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং। এটি সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর উপর নির্ভরশীল। কৃষির উন্নতির জন্য এগ্রিকালচার ইঞ্জিনীয়ারিং মূলত সিভিল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর উপর নির্ভর করে। জাহাজ শিল্পের জন্য মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং এবং উড়োজাহাজ শিল্পের জন্য এরোনটিক ইঞ্জিনীয়ারিং নির্ভর করছে সেই সিভিল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর উপর। মোটরগাড়ি শিল্পের জন্য অটোমোবাইল ইঞ্জিনীয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর শাখা। সংবাদ প্রেরণ-সংক্রান্ত টেলিকম্যুনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং থেকে উদ্ভূত। ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সমন্বয় থেকে আর যে-সব শাখার সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ারিং প্রধান। কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এরও একাধিক শাখা উৎপন্ন হয়েছে। বর্তমানের আনবিকশক্তি গবেষণা-সংক্রান্ত নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সঙ্গে জড়িত কেমিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং। কেমিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং থেকে উদ্ভূত আজকের বিস্ময় রকেট ইঞ্জিনীয়ারিং। অবশ্য বিজ্ঞানের রাণী গণিত শাস্ত্রটা সবার সঙ্গে জড়িত।

এবার প্রযুক্তিবিদ্যার প্রধান প্রধান বিভাগগুলির পরিচয় লক্ষ করলে বিভাগগুলি কিভাবে পুষ্ট হয়েছে, তা সহজে অনুমান করা যাবে। সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর আওতায় পড়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ, নদীতে বাঁধ দেওয়া, জলসেচ ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, অট্টালিকা-সেতু-নগর-বন্দর যে-কোন কারখানা ইত্যাদির পরিকল্পনা ও নির্মাণ, গ্রাম ও শহর উন্নয়ন ইত্যাদি। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং সাধারণত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র ও যন্ত্রের খুঁটিনাটি বিবরণ, যন্ত্রচালনা, যন্ত্রের নির্মাণ কৌশল প্রভৃতিকে বোঝায়। বলা বাহুল্য, উক্ত শাখাটির উদ্ভব হয়েছে যন্ত্রের যুগ আরম্ভ হওয়ার পর।

বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এর উদ্ভব আরও পরে—অর্থাৎ ইঞ্জিনের পরে বিদ্যুৎকে কাজে লাগানোর সময়। এর পরিধি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। ঘরের মধ্যে বৈদ্যুতিক বাতি

জালানো, পাম্প-পাখা-হিটার-টেলিফোন-রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতি চালানো থেকে রাস্তায় এবং ট্রাম ও ট্রেন লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ, টেলিগ্রাফ, চিকিৎসা-ক্ষেত্রে এক্সরে—লেসার, অসিলোগ্রাফ, এমনকি বিস্ময়কর বেতার যন্ত্র পর্যন্ত ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর আওতায় পড়ে।

মাইনিং ও মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং দুটি পৃথক বিভাগ হলেও একটিতে জ্ঞান ছাড়া অন্যটি চলে না। যদিও ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কোন শাখাটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। একটি শাখায় ভালভাবে জ্ঞান অর্জন করতে গেলে অপরাপর শাখায়ও কিছুটা জ্ঞান থাকার প্রয়োজন হয়। তবে মাইনিং ও মেটালার্জি-ক্যাল দুটোর মধ্যে সম্পূর্ণ অপরাপর শাখা অপেক্ষা বড় বেশী নিবিড়। খনি থেকে খনিজ সংগ্রহ, খনিজকে বিশুদ্ধিকরণ এবং তা থেকে ধাতু নিষ্কাশন, শঙ্করধাতু প্রস্তুতি প্রভৃতি বিষয়তো আছেই, তার উপর আছে ভূগর্ভ থেকে খনিজ উদ্ধারের ক্ষেত্রে নানা সাবধানতা। খনির অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, স্থানে স্থানে সঞ্চিত বিষাক্ত অথবা দাহ্য গ্যাস ও জল, ধস নামা ইত্যাদি থেকে খনি-শ্রমিকদের রক্ষা করাও ঐ শাখার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া ভূগর্ভ থেকে খনিজকে উদ্ধার করে উপরে নির্দিষ্ট কারখানায় প্রেরণ করা, খনিগর্ভে লাইন পাতা, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিশ্রামাগার নির্মাণ, জল ও বিষাক্ত গ্যাসকে অপসারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর আশ্চর্য সমাবেশ ঘটাতে হয়।

কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং নামক প্রযুক্তিবিদ্যার শাখাটি বর্তমান শতাব্দীর অবদান বলা যেতে পারে। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে মাত্র অর্ধশতাব্দী পূর্ব থেকে শাখাটির পরিধি বিস্ময়করভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। যদিও প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষ কতকগুলি রং, অ্যাসিড, ক্ষার, প্রসাধন ইত্যাদি প্রস্তুত করে আসছে এবং বস্ত্র প্রভৃতিকে রঞ্জিত করে আসছে, তবুও এর প্রকৃত প্রসার হয়েছে আজকের দিনে। এর আওতায় পড়ে নানাবিধ অ্যাসিড, ক্ষার, লবন, কাচ, সিমেন্ট, কাগজ, রং, বিস্ফোরক, নানাপ্রকার প্রসাধন দ্রব্য, কৃত্রিম সূতা, নাইলন, পলিথিন, প্লাষ্টিক, রবার, আঠা প্রভৃতি প্রস্তুতি এবং এদের উপর নির্ভরশীল হরেক-রকমের শিল্প। চামড়ার কাজ, নানা প্রকার দাহ্য গ্যাসের ব্যবহার, খনিজ তেল এবং কয়লা থেকে হরেক-রকমের পদার্থ নিষ্কাশনও উক্ত শাখার অন্তর্ভুক্ত।

অতি সাম্প্রতিককালে মহাকাশ গবেষণাকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানের যে শাখাটি গড়ে উঠেছে সেটি বিজ্ঞানের সমূহ শাখা এবং সমস্ত প্রযুক্তিবিদ্যার শাখাকে অবলম্বন করে এক জটিল কর্মকাণ্ড। মহাকাশের খবর সংগ্রহ থেকে

আরম্ভ করে উন্নত রকেট-বিদ্যা, রকেটের জ্বালানী ও রকেট উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা, মহাকাশচারীর পোষাক ও খাদ্য, দুর্ভেদ্য মহাকাশযান নির্মাণ, মহাকাশে মানবশরীরে প্রতিক্রিয়া, নানাবিধ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, মহাকাশযানের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা, মহাকাশযানকে কোন গ্রহে কিংবা উপগ্রহে অবতরণ করানোর ব্যবস্থা ও পুনরায় তাকে পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা—মানুষের আহরিত বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার চূড়ান্ত প্রয়োগ তথা সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপেও গণ্য করা যায়।

প্রযুক্তিবিদ্যার উপরোক্ত শাখাগুলির দিকে তাকালে এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের কথা চিন্তা করলে প্রযুক্তিবিদ্যার দুটি ধারা চোখের সামনে ভেসে উঠে। প্রথম ধারা সেই আদিকাল থেকে আরম্ভ করে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ যন্ত্রযুগ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ধারাটির সুরু মানুষ যেদিন বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে আপন উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে শত শত মানুষের কাজকে একাই সম্পন্ন করলো। প্রকৃতপক্ষে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর গোড়াপত্তন ঐখানে। তারপর এসেছে বিদ্যুৎ ও পরমাণুর যুগ। প্রযুক্তিবিদ্যাও বিভক্ত হয়েছে নানা শাখায় ও উপশাখায়।

প্রথম ধারায় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে মানুষের যা-কিছু আবিষ্কার তার প্রায় অধিকাংশই আজকের ঐ সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর আওতায় পড়ে। মানুষের চিন্তাভাবনার বেশীর ভাগই নিয়োজিত হয়েছিল স্থাপত্যবিদ্যা, জলসেচ ও নদী-পরিকল্পনা, সেতু, নগর ও বন্দর নির্মাণ, যুদ্ধাস্ত্রের উন্নত রূপদান ও জলযান প্রভৃতির ক্ষেত্রে।

স্থাপত্যবিদ্যার সুপ্রাচীন নিদর্শন মিশরের পিরামিড, মহেঞ্জোদড়োর নগর পরিকল্পনা ও তার বিরাট স্নানাগার, ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান ও চীনের প্রাচীর। মিশরের নীলনদীর তীরে ৭৩টি পিরামিড দৃষ্ট হয়। এদের মধ্যে বৃহত্তমটি প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ বর্গফুট এলাকার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ৪৯০ ফুটের মত উচ্চ, পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম খুফুর পিরামিড। কথিত আছে, খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দে এক লক্ষ লোক ২০ বছর ধরে পরিশ্রম করে পিরামিডটি নির্মাণ করেছিল। দূর-দূরান্ত থেকে বিরাট বিরাট চৌকো পাথর জলপথে আনা হতো এখানে। ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান এবং চীনের প্রাচীর কিন্তু এত পুরানো নয়। ঝুলন্ত উদ্যান নির্মিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫০ অব্দের দিকে এবং ১৪০০ মাইল লম্বা ২০ ফুট চওড়া এবং ২২ ফুট উচ্চ চীনের প্রাচীরের কাজ সুরু হয়েছিল ২১৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে।

অট্টালিকা ও মন্দির নির্মাণে সেকালে কাঁচা ও পাকা উভয় ধরণের ইট

ব্যবহার করা হয়েছিল। কড়ি, বরগা ও থাম ছাড়া থিলানের দ্বারা ইটকে আটকে রাথার পদ্ধতি প্রথম সুমেরীয়রা নাকি আবিষ্কার করেছিল। তাদের তৈরি জিগুরাট নামক মন্দিরগুলি স্থাপত্য-শিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন।

পরবর্তীকালে গ্রীক ও রোমান আমলে নগর ও গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা বৈজ্ঞানিকভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। গ্রীকদের নির্মিত মন্দির, সভাগৃহ ও নাট্যশালার নিদর্শনগুলি আজকের দিনেরও বিস্ময়। তবে চরমভাবে বিকাশ লাভ করেছিল রোমান আমলে। শোনা যায়, রোমানরা প্রথম সিমেণ্ট জাতীয় জিনিস আবিষ্কার করেছিল। ফলে পাথর কিংবা ইটকে জোড়া লাগাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তারা বিরাট বিরাট স্নানাগার, হলঘর ইত্যাদি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তৈরি করেছিল। তাছাড়া ছাদের পরিবর্তে ছাদকে গম্বুজাকার করার পরিকল্পনাও রোমানদের। পরবর্তীকালে মন্দির, গীর্জা এবং আরও পরে ইসলাম জগতে মসজিদের ছাদ গম্বুজের রূপ প্রদান করা হয়। তার জের এখনও চলছে।

প্রাচীন সভ্যদেশগুলির প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বিতীয় নিদর্শন নদীর উপর সেতু নির্মাণ। প্রথমে হয়ত মানুষ ছোট ছোট নদীর উপর ভেলার দ্বারা নির্মাণ করেছিল সেতু। কাঠের থিলান দিয়ে বড় বড় নদীর দুই তীরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত সেতু প্রথম সুমেরীয়রা নাকি আবিষ্কার করেছিল। হ্রদের উপর যেমন খুঁটি পুঁতে ঘর তৈরি করতো তেমনই সেতুকে খাড়া রাখতো খুঁটির সাহায্যে। চওড়া সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে খুঁটি বা পাইল এবং কড়ি বা ট্রাসের আবিষ্কার করেছিল। অধিকাংশের মতে ঐ পাইল ও ট্রাস প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় অবদান।

সেকালে সামরিক প্রয়োজনে অনেক সময় অস্থায়ী সেতু নির্মিত হতো। এগুলি প্রায়ই নদীর উপর সারি সারি নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে তার উপর চওড়া কাঠ ফেলে দেওয়া হতো। গ্রীকদের বিরুদ্ধে লড়াইর সময় জার্কসিস ঠিক এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

সিমেণ্ট আবিষ্কারের পর সেতু নির্মাণ অন্যরূপ গ্রহণ করে। কাঠের পরিবর্তে পাথরকে কেটে এবং পরস্পর পরস্পরকে লোহার আংটার দ্বারা দৃঢ়-ভাবে আটকানোর রীতি প্রচলিত হল। সিমেণ্টের তৈরি থাম ব্যবহার করে এবং সেতুর ছাদকে গোলাকার থিলানের মাধ্যমে খাড়া রাখার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন ধারায় সূত্রপাত হয়।

প্রাচীনকালে অর্থাৎ গ্রীক ও রোমান আমলের আগে সেতু নির্মাণে ভার-প্রাপ্ত একজন মাত্র ইঞ্জিনীয়ারের নাম পাওয়া যায়। নাম তাঁর স্যামসের

মান্দ্রোক্লিস। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বসফরাস প্রণালীর উপর ৩০০ ফুট দীর্ঘ একটি কাঠের সেতু তাঁরই তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল।

প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলি তৃতীয় উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রেখেছে জলসেচ ও নদী-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। যেহেতু বৃষ্টির উপর নির্ভর করে প্রাচীন সভ্যতাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই একদিকে যেমন কৃষির যন্ত্রপাতির উদ্ভব হয়েছিল অপরদিকে তেমনই নদী-পরিকল্পনা ও খাল খননও হয়েছিল। অনেকে মনে করে থাকেন কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের জন্য খাল কাটার পরিকল্পনা প্রথম সুমেরীয়দের মাথায় এসেছিল। সে আসলে অপরাপর সভ্য দেশও জমির উপরিভাগের বন্ধুরতা দূর করেছিল এবং খালের মাধ্যমে জল যাতে সমস্ত জমিকে প্লাবিত করতে পারে তারও ব্যবস্থা করেছিল। পাকা নালার দ্বারা জল প্রবেশের ও জল নিষ্কাশনেরও ব্যবস্থা ছিল।

প্রাচীনকালে মানুষের বুদ্ধির বেশীরভাগ নিয়োজিত হতো যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে। প্রথম প্রথম তাদের পাথরের হাতিয়ার ছিল ভোঁতা। পরেরদিকে চেঁচে ছুলে বেশ মসৃণ করেছিল। উক্ত কারণে পরবর্তী প্রস্তরযুগকে মসৃণ প্রস্তরযুগও বলা হয়। নব্যপ্রস্তর যুগে তারা করাত, কুরুনি, বাটালি প্রভৃতিও আবিষ্কার করেছিল। আর আবিষ্কার করেছিল তীর-ধনুক। সে সময় ছুরির ফলার সঙ্গে হাড়ের বাঁটও সংযুক্ত করতো। ধাতুকে কাজে লাগানোর পর তাদের অস্ত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে। পরে লোহাকে কাজে লাগিয়ে একরকম অজেয় হয়ে উঠেছিল।

গ্রীক ও রোমান আমলে যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের একরকম আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। তীর-ধনুক, লোহার উন্নত বর্শা ও তরবারি, বাঁটুল ইত্যাদির ব্যবহার যথেষ্ট ছিল। কথিত আছে, গ্রীকবিজ্ঞানী আর্কিমিদিস বড় বড় আয়নার সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত ও প্রতিফলনের দ্বারা শত্রুপক্ষের বিশাল নৌবহরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সৌরশক্তিকে বোধ হয় এই প্রথম কাজে লাগানো হয়েছিল।

যুদ্ধে রথ ব্যবহারও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। অপরদিকে শত্রুর দুর্গের মধ্যে অগ্নিনিক্ষেপ এবং মৃত এবং গলিত জীবজন্তুর দেহ নিক্ষেপের নজিরও আছে।

বারুদ আবিষ্কার যুদ্ধাস্ত্রের ক্ষেত্রেই আধুনিকতার সূত্রপাত করেছে। প্রথম চীনারা ওকে আবিষ্কার করেছিল এবং হাউইর মাধ্যমে শত্রুপক্ষকে সন্ত্রস্ত করতো। ভারতেও এককালে অগ্নিবানের প্রচলন ছিল। গ্রীসে আবিষ্কৃত হয়েছিল কাষ্ঠ পারাবত। পারাবতটির ভেতরে বারুদ জাতীয় জিনিসকে পুরে

দেওয়া হতো এবং তার একমাত্র ক্ষুদ্র ফুটো পথে অগ্নিসংযুক্ত করলে পারাবতটি ছুটে যেতে পারতো। আধুনিক রকেটের আদি নিদর্শন হিসাবে ওকে গ্রহণ করা যায়। নৌযুদ্ধে বিরাট বিরাট নৌকাকে উল্টে দেওয়ার জন্য ক্রেনও আবিষ্কার করেছিলেন গ্রীক আর্কিমিদিস।

যুদ্ধাস্ত্রের দিকে ঝোঁক বোধ হয় মানুষের সর্বকালের। সেই তীর-ধনুকের আমল থেকে আজকের ক্ষেপণাস্ত্র পারমাণবিক অস্ত্র-সম্ভার প্রভৃতি তারই নিদর্শন।

যুদ্ধাস্ত্রের পরে অপর যে ক্ষেত্রে প্রাচীন সভ্যদেশগুলির প্রতিভা সর্বাধিক নিয়োজিত হয়েছিল সেটি জলযান নির্মাণ। কাঠের গুঁড়ি থেকে ভেলা ও নৌকায় উন্নীত হতে কয়েক হাজার বছর লেগেছিল। এই নৌকা ব্যবহারের নজির প্রথমে মিশরেই লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে ওরা প্যাপিরাসের বাণ্ডিলকে নৌকা রূপে ব্যবহার করতো। পরে পালতোলা নৌকাও তারা আবিষ্কার করে। ঐ পালতোলা নৌকা ও নৌকাকে যেমন খুশি চালানোর ব্যাপারে প্রথম কৃতিত্ব অর্জন করে ফিনিশীয়রা। কথিত আছে, খ্রীষ্ট জন্মের হাজার বছর আগেও তারা পালতোলা নৌকায় আরোহণ করে বহু দূরদেশে পাড়ি জমাতো।

নৌকাকে জাহাজে রূপান্তরিত করে গ্রীকরা। অবশ্য সে সময় জাহাজও কাঠের দ্বারা নির্মাণ করা হতো। তবে সে-সব জাহাজ এত বড় ছিল যে, তাতে চার কিংবা পাঁচশ লোকেরও স্থান হতো। গ্রীকরা বহু জাহাজ নির্মাণ করেছিল এবং জলপথে প্রতিটি সভ্যদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। শোনা যায়, মিশরের রানী ক্লিওপেট্রার আমলেও জাহাজ শিল্পের উন্নতি হয়েছিল।

জাহাজকে আরও উন্নত রূপ প্রদান করেছিল ভাইকিংরা। ওরাও ছিল ফিনিশীয়দের মত দুর্ধর্ষ জলদস্যু। উত্তর মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে ভাইকিংরা একরকম চষে ফেলেছিল বলা যেতে পারে। কারও কারও মতে তারা উত্তর আমেরিকায়ও হানা দিয়েছিল।

যন্ত্রযুগ আরম্ভ হওয়ার পরে প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বক্ষেত্রে সূচিত হয় আলোড়ন। পুরাতন ধারাগুলিকে সহজ করে তুললো যন্ত্র। পরিশ্রমের লাঘব হল মানুষের। অপরদিকে উনবিংশ শতাব্দীর দিকে শিল্পজগতেও সূচিত হলো বিরাট আলোড়ন। উদ্ভাবিত হল নানাপ্রকার যন্ত্র এবং স্থাপিত হল প্রচুর কলকারখানা। সেই থেকে প্রযুক্তিবিদ্যাও নানাভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। অবশেষে বিদ্যুৎকে মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত করায় নব নব আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রযুক্তিবিদ্যার পরিধি ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে আজকের রূপটি গ্রহণ করেছে।

প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের জীবনে কতখানি যে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে তা আজকের যানবাহনের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে।

সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষ হেঁটেই যাতায়াত করতো। তারপর বাহন হিসাবে গ্রহণ করে পশুকে। বৃষ, উট, হাতি ও পরে ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে মানুষ হাঁটার পরিশ্রমকে লাঘব করতে প্রথম সচেষ্ট হয়েছিল।

যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রথম পরিবর্তন সূচিত হয় চাকার আবিষ্কারের মাধ্যমে। সেদিনের চাকা ছিল গোলাকার নিরেট কাঠ। বুদ্ধি করে কেউ একদিন মাঝখানটা ছিদ্র করে অক্ষদণ্ড যুক্ত করেছিল। পাখি তথা স্পোকযুক্ত চাকা আবিষ্কার হয়েছে অনেক পরে। পাখিওয়ালা চাকার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় হোমারের গ্রন্থে। ট্রয়-যুদ্ধের সময় সেনাপতিরা অনুরূপ চাকাযুক্ত রথে আরোহণ করে যুদ্ধ করেছিলেন।

চাকা আবিষ্কারের পর পরিবহনের কাজ যথেষ্ট সহজ হয়ে উঠে। তাছাড়া চাকার দ্বারা রথ প্রস্তুত করে এবং রথকে পশুর দ্বারা টানিয়ে হাঁটার পরিশ্রমও যথেষ্ট লাঘব করলো। তবে রথটা সর্বসাধারণের জন্য ছিল না। যুদ্ধে রাজরাজড়া ও সেনাপতিরা এবং স্থানান্তরে গমন করতে হলে অভিজাতরা ব্যবহার করতেন। বর্তমানকালের ঘোড়ার গাড়ী সেই পূর্বের নিয়মকে অনুসরণ করে আসছে। এমনকি ইংরাজ আমলে ভারতে প্রথম ঘোড়ার-টানা ট্রাম-গাড়িরও প্রচলন ছিল। গরুর গাড়ি, উটের গাড়ি এখনও আদিম সভ্যতার নিদর্শনকে বহন করে চলেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্তও যানবাহনের কাজে সহায় ছিল এক-মাত্র পশুরাই। চাকার অবশ্য উন্নতি হয়েছিল অনেকখানি। কাঠের চাকার উপর লোহার বেড় পরানোর রীতিও আবিষ্কৃত হয়েছিল সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে। চাকায় টায়ার ও টিউব পরানো হয়েছে অনেক পরে এবং দ্রুতগামী যান আবিষ্কার হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে।

বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগানোর পূর্বে মানুষ দ্বারা চালিত প্রথম গাড়ি সাই-কেলকেই বলতে হবে। ওর আসল নাম বাইসাইকেল বা দুচাকার গাড়ি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এক ফরাসী ভদ্রলোকের মাথায় অনুরূপ এক পরিকল্পনা এসেছিল। স্ত্যাভারত্রম নামে আর এক ফরাসী ভদ্রলোক প্রকৃত সাইকেলের রূপকার। তবে সে সাইকেলের ব্রেক, প্যাডেল, সিট প্রভৃতি কিছুই ছিল না। এমনকি চাকার তলায় টায়ার ও টিউব পরানো হতো না। সামনের চাকা পেছনের চাকা অপেক্ষা বড় করা হতো এবং মাটিতে পা ঠুকে ঠুকে চালাতে হতো। পরের দিকে জার্মানীতে সাইকেল তৈরির কাজ সুরু হয়

এবং ডানলপ সাহেব সাইকেলের চাকায় টিউব ও টায়ার পরিয়ে আধুনিক রূপ দান করেন।

বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রথম যে যান বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় সেটি ষ্টিফেনসনের তৈরি রেল ইঞ্জিন। আবিষ্কৃত হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। এটি সম্ভব হয়েছে জেমস ওয়াটের বাষ্পশক্তি আবিষ্কারের পর। বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে গাড়ির পরিকল্পনা জেমস ওয়াটেরই। তাঁর পরে নিকোলাস কুনো, উইলিয়ম মাউক প্রভৃতি প্রযুক্তবিদদের চেষ্টায় বাষ্পচালিত যান প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এর চূড়ান্ত রূপই প্রদান করেছিলেন জর্জ ষ্টিফেনসন।

মোটর গাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে আরও পরে। আজ থেকে মাত্র একশ বছর আগে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দুজন জার্মান প্রযুক্তিবিদ গটলিয়েব ডেমলার এবং কার্ল বেন্ৎস মোটর গাড়ির চূড়ান্ত রূপ দেন। অবশেষে মোটর গাড়ি আধুনিক রূপটি লাভ করে হেনরি ফোর্ডের হাতে। ডানলপ সাহেবের প্রচেষ্টায় গাড়ির চাকায় যেহেতু টায়ার ও টিউব পরানোর রীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল, তাই স্থলযান হিসাবে মোটর গাড়ির জয়-জয়কার সূচিত হল। যাত্রীবহন ও মালবহনের জন্য পৃথক পৃথক গাড়ির ব্যবস্থা হলো। দেখতে দেখতে মোটর সাইকেল, জীপ, মোটর বাস, লরী, টেম্পো, নানা ধরণের গাড়িতে ছেয়ে গেল দুনিয়া।

মোটর গাড়ির জন্য প্রথমে কয়লা, পরে পেট্রোলিয়াম ও বর্তমানে ডিজেলকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে পেট্রোলিয়াম দ্বারা চালিত গাড়ির সংখ্যাও বর্তমানে বড় কম নেই। আজকাল কলকারখানা ও গাড়ি মোটরের সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আগামী কয়েক দশকের মধ্যে ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লা ও পেট্রোলিয়াম প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাবে। উক্ত কারণে কোথাও কোথাও মোটর গাড়ি চালানোর কাজে সৌরশক্তিকে নিয়োগ করা হচ্ছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সৌরশক্তির ব্যবহার ব্যাপক হবে। আর তখনই প্রযুক্তিবিস্তার ক্ষেত্রেও এক নতুন দ্বারোদ্ঘাটন হবে।

অপরপক্ষে রেলগাড়িকেও এখন বিদ্যুৎ দ্বারা চালানো হচ্ছে। এক্ষেত্রেও ডিজেল ও কয়লা চালিত ইঞ্জিন বড় কম নেই। জ্বালানীর ঘাটতির জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। জনবহুল শহরগুলিতে ভিড় এড়াতে এবং যাত্রীদের অসুবিধা দূর করতে মাটির তলায় রেলপথ পেতে আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ে বা পাতাল রেলের ব্যবস্থা হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বেশ কতকগুলি শহরে উক্ত ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে এবং ভারতের

কলিকাতা শহরেও চালু হয়েছে পাতাল রেল। এর পরিকল্পনা প্রথম করেছিলেন স্যার মার্ক ইসামবার্ড ব্রুনেল নামে জনৈক ইংরাজ প্রযুক্তিবিদ। টেমস নদীর তলা দিয়ে তাঁর পরিকল্পনায় প্রথম সুড়ঙ্গ রেলপথ চালু করা হয়েছিল।

জলযানের ক্রমবিকাশের কথা আগেই বলা হয়েছে। ভেলা থেকে নৌকা, তারপর নৌকা জাহাজে রূপান্তরিত হতে খুব বেশী সময় লাগেনি। কিন্তু সেদিনের জাহাজ বলতে ছিল পালতোলা জাহাজ। চলতো সমুদ্রের স্রোতের টানে এবং বাতাসের সাহায্যে। ১৮০২ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলে আসছিল। সেদিনের বীর নাবিক কলম্বস, ভাস্কোডাগামা প্রভৃতি নতুন নতুন দেশ যে আবিষ্কার করেছিলেন—তাঁদের বাহন ছিল ঐ পালতোলা জাহাজই। পৃথিবীর প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ চলেছিল স্কটল্যাণ্ডের ক্লাইড নদীতে ১৮ ২ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরে রবার্ট ফুলটন ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন যুক্ত করে জাহাজ চালিয়েছিলেন হাডসন নদীতে। কথিত আছে, ৩২ ঘণ্টায় তিনি অতিক্রম করেছিলেন ১৫০ মাইল জলপথ।

রবার্ট ফুলটনের বাষ্পচালিত সেই জলযানকে অবশ্য জাহাজ বলা যায় না। কারণ সেটি আকারে ছিল বড় নৌকার মত। এবং সমুদ্র যাত্রারও উপযোগী ছিল না। তবে এও সত্য যে, বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে প্রথম স্থলযানে ব্যবহার না করে জলযানেই ব্যবহার করা হয়েছিল।

ফুলটনের বাষ্পচালিত নৌকা যথেষ্ট উৎসাহ আনে। তারপর সমুদ্রযাত্রার উপযোগী জাহাজেও বাষ্পীয় ইঞ্জিন বসানো হয়। পাছে ইঞ্জিন গোলমাল হয়ে যায় এই ভয়ে পালেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অনুরূপ প্রথম জাহাজের নাম এণ্টারপ্রাইজ। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১৩ দিনের মধ্যে ইংলণ্ড থেকে কলিকাতায় এসে পৌঁছেছিল। উক্ত জাহাজটির আরও বৈশিষ্ট্য ছিল, সে চাকার সাহায্যে জল কেটে এগিয়ে যেতে পারতো।

এণ্টারপ্রাইজ পর্যন্ত সমূহ জাহাজের কাঠামো ছিল কাঠের। পরবর্তীকালে নির্মিত জাহাজ "গ্রেট ওয়েস্টার্ন"কে চালানো হয়েছিল কেবলমাত্র যন্ত্রের সাহায্যে। অর্থাৎ এইটিই প্রথম জাহাজ যাতে পাল ছিল না। ১৮৪০ সালের দিকে ইংলণ্ড প্রথম লোহার জাহাজ তৈরি করে এবং তাতে চাকার পরিবর্তে জল কাটার জন্য স্ক্রু-প্রপেলার ব্যবহার করা হয়। জাহাজটির নাম ছিল গ্রেট-বিটেন।

এর পরেই জাহাজের ক্রমশঃ উন্নতি হতে হতে আজকের বিশাল বিশাল জাহাজগুলি। এখন আবার পরমাণু শক্তিকেও কাজে লাগানো হচ্ছে এবং তৈরি হচ্ছে বিশাল বিশাল নৌবহর। যাতে একই সঙ্গে কয়েকখানা উড়ো-

জাহাজ ওঠানামা করতে পারে।

এবার ডুবোজাহাজের কথাও একটু বলতে হয়। এক্ষেত্রেও মানুষের প্রযুক্তিবিদ্যার চূড়ান্ত প্রকাশ বলতে হবে। ডুবোজাহাজরা ইচ্ছামত জলের উপর ভাসতে পারে আবার সাগরতলায় ডুব দিতেও পারে। সাধারণত যুদ্ধের কাজে ওকে ব্যবহার করা হয়। ওতে বসানো থাকে পেরিস্কোপ। তলায় থাকলেও যাত্রীরা পেরিস্কোপের সাহায্যে সাগরের উপরিভাগ দেখতে পারে।

ডুবোজাহাজে থাকে কতকগুলি ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্ক জলপূর্ণ হলেই ডুব দেয় জাহাজ। আবার ট্যাঙ্ক থেকে জল নিষ্কাশন করে ফেললে ভেসে ওঠে। ইংরাজীতে ডুবোজাহাজকে বলা হয় সাবমেরিন। সাবমেরিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে টরপেডো নামে বোমা। টরপেডো কোন যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেলে বিস্ফোরণ ঘটে এবং যুদ্ধজাহাজটি বিনষ্ট হয়।

ডুবোজাহাজের পরিকল্পনা কিন্তু প্রথমে ফুলটনই করেছিলেন। কিন্তু আবিষ্কার তিনি করতে পারেননি। এটি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৮৭৭ সালে "সাইমন লেক" এর দ্বারা। বর্তমানে ডুবোজাহাজকে পারমাণবিক শক্তির দ্বারাও চালনা করা হচ্ছে।

স্থলযান ও জলযানের পরে আসে আকাশযানের কথা। এটিকেও আবিষ্কার করতে সুদীর্ঘ সময় লেগেছে। পাখীর মত আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা মানুষের দীর্ঘদিনের। কিন্তু যন্ত্রযুগের পূর্বে মানুষ কিছুতেই মনের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেনি। গালগল্প ও পুরাণকাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল অন্তরীক্ষ পরিক্রমা।

মানুষ প্রথম আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা করেছিল বেলুনের মাধ্যমে। বেলুনে চেপে প্রথম আকাশে উঠেন পিলাৎর দ্য রোজী। বেলুনের উন্নতি সাধন করতে করতে একদিন আবিষ্কৃত হলো জেপেলিন। কথিত আছে, জার্মানীর গ্রাফ জেপেলিন ২২ দিনে আকাশমার্গে একবার পৃথিবী পরিক্রমা করেছিল। সর্বশেষে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় এবং দীর্ঘকালের বহুজনের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে আবিষ্কৃত হয় আকাশযান বা এরোপ্লেন।

প্রথম এরোপ্লেন ততখানি উন্নত ছিল না। প্রথম আরোহী উইলবার রাইট মাত্র ৫৯ সেকেণ্ড আকাশে থেকে ৮৫২ ফুট অতিক্রম করেছিলেন। অপর ভাই অরভিলের চেষ্টায় এরোপ্লেন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অরভিল একনাগাড়ে প্রায় ২৪ ঘণ্টা উড়েছিলেন আকাশে। সেই

সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার আর একটা দিক উন্মোচিত হলো।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে এরোপ্লেনের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং বহু প্রযুক্তিবিদের হাতে পড়ে এরোপ্লেন এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। অরভিলের উড়োজাহাজ মাত্র একজনকে বহন করতে পারতো এবং বেগ ছিল ঘণ্টায় ৮০ মাইলের মত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে এর গতিবেগ গিয়ে দাঁড়ালো ঘণ্টায় ১৫০ মাইল এবং একজনের পরিবর্তে বহন করলো চারজন মানুষ সহ তিনটি কামান ও ৩০০০ পাউণ্ড গোলা বারুদ।

এর পর এরোপ্লেনের একটানা উন্নতির ইতিহাস। বর্তমানে পাঁচ-সাতশ যাত্রী বোঝাই এরোপ্লেনও আকাশে উড়ছে। বেগ ঘণ্টায় ৫০০ মাইলের কম নয়। শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী (শব্দের বেগ ঘণ্টায় ৭৫০ মাইল) বিমানও আবিষ্কৃত হয়েছে। আজকের দিনে মাত্র ১৮ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তায় তিন-চারবার বিশ্রাম নিয়েও মানুষ কলিকাতা থেকে লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে।

রকেটবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উড়োজাহাজেরও উন্নতি হয়েছে। আগে জ্বালানী হিসাবে পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করা হতো। এখন রকেটের নীতিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হচ্ছে নানা প্রকার জেট বিমান।

বর্তমানকালের প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময় মহাকাশযান। পৃথিবীর বুক ছেড়ে মানুষ আজ যাত্রা করছে গ্রহান্তরে। এর শেষ পরিণতি কোথায় সেকথা ভবিষ্যতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাই ভাল করে বলতে পারবে।